আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ইতিহাস

[১৯১৯-১৯৬০]

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ.

(সুবর্ণপদক প্রাপ্ত)

অধ্যাপক, চারুচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা ; ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক,

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির হাওড়া।

"A Study of World History" (1763-1949)

এবং

ইউরোপের ইতিহাস (১৭৪০-১৯১৯) গ্রন্থ প্রণেতা।

প্রকাশক

যোগব্রত গুপ্ত

ডিরেক্টার

এস, গুপ্ত ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৫২-এ, কলাবাগান লেন

কলিকাতা-৩৩

প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর ১৯৬০

মুদ্রাকর

শ্রীভোলানাথ হাজরা

রূপবাণী প্রেস

৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান

এস্ গুপ্ত ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

এবং

মৌলিক লাইব্রেরী

৮-ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

বাঁধাই

ইউনিভার্সাল বুক বাইণ্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড

কলিকাতা-১৪

মুখবন্ধ

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শিক্ষাক্রমের ইতিহাসের পাঠ্যতালিকার তৃতীয় অংশ অনুযায়ী বইখানি লেখা হয়েছে। তবে 'রাজনীতি', 'অর্থনীতি' ও 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক'—এই সকল বিষয়ের ছাত্রছাত্রীরাও বইখানা সুবিধামত কাজে লাগাতে পারবেন। তাছাড়া, বাংলাভাষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চমকপ্রদ ও চিন্তনীয় ঘটনা-গুলোর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান বইখানা তাঁদের কাছেও প্রয়োজনীয় মনে হবে বলে আশা করি।

আর্থিক, রাজনৈতিক, সামরিক বা আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত বহু ইংরেজী শব্দের ও ভাবের নূতন তর্জমা আমাকে করতে হয়েছে; সেগুলো সকল ক্ষেত্রেই সার্থক বা সুন্দর হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ফলে, মাঝে মাঝে দু'চারটা বিশেষ প্রয়োগসূচক ইংরেজী শব্দ বইটিতে ব্যবহার করেছি।

বইখানি লিখতে আমি E. H. Carr-এর "International Relations Between The Two World Wars (1919—1939)", Ketelbey-র "A History of Modern Times From 1789" Benns-এর "Europe since 1914 In Its World Setting," Friedmann এর "An Introduction to World Politics", Gathorne-Hardy-র "A Short History of International Affairs (1930—1939)", Hayes, Moon ও Wayland এর "World History", Prof. M G. Gupta-র "International Relations," "The Book of knowledge", বিভিন্ন জার্নাল, ও কতকগুলি Year Book এর সাহায্য নিয়েছি।

বইটির প্রাথমিক প্রস্তুতিতে শ্রুতলিপি লিখে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী, এবং অধ্যাপক সুব্রতগুপ্ত আমাকে নানারূপ মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন; তাই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নিচ্ছি।

বইটির ত্রুটিসংশোধনে বা এর উন্নতিবিধানে পাঠকদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হবে।

ইতি

কলিকাতা,
 ২রা নভেম্বর, ১৯৬০ সন। } শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ : শান্তি স্থাপনের যুগ :

দ্বিতীয় ভাগ : সংকটকাল (আবার শক্তি-দ্বন্দ্ব)

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ইতিহাস

(১৯১৯—১৯৬০)

প্রথম ভাগ

শান্তিস্থাপনের যুগ

প্রথম অধ্যায়

শান্তি চুক্তি

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর তাহার বিরতি ঘটে। ইহার পর আরও পাঁচ বৎসর কাল শান্তিচুক্তি সম্পাদনে ব্যয়িত হইয়াছিল। ১৯১৯ সনের ২৮শে জুন মিত্রশক্তিবর্গ যথাক্রমে জার্ম্মানীর সহিত ভার্সাইর সন্ধি, অষ্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধি (১০ই সেপ্টেম্বর), বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির সন্ধি (২৭শে সেপ্টেম্বর), হাঙ্গেরীর সহিত ত্রিয়াননের সন্ধি (৪ঠা জুন, ১৯২০), এবং তুরস্কের সহিত লুসানের সন্ধি (২৩শে জুলাই, ১৯২৩) স্বাক্ষরিত করে। ইহার ফলে ১৯২৪ সনের মাঝামাঝি সমগ্রবিশ্বে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯২১—২২ সনে প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে আগ্রহশীল শক্তিগুলি দূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক স্থিরতা দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ওয়াশিংটনে কতগুলি চুক্তি সম্পাদন করে। এই সকল সন্ধির উপর ভিত্তি করিয়াই যুদ্ধোত্তর শান্তিব্যবস্থার সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালের প্রায় সকল আন্তর্জাতিক ঘটনাই মুখ্য অথবা গৌণভাবে এই শান্তিব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত।

ইউরোপীয় শান্তিব্যবস্থা :

ভার্সাইর সন্ধিতে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা ইউরোপের ইতিহাসকে উত্তরকালে যথেষ্টরূপে প্রভাবিত করিয়াছে। প্রথমতঃ, জার্মান প্রচারমূলক ভাষায় ইহাকে একটি 'জোর করে লেখান সন্ধি' বা "dictated peace" বলা যায়। ইহা বন্ধুত্বের আদানপ্রদানমূলক পরিবেশে স্বাক্ষরিত হয় নাই, বিজিতের স্কন্ধে বিজয়ী ইহা জোর করিয়া চাপাইয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধোত্তর সন্ধিকেই dictated peace বলা যাইতে পারে, তথাপি ভার্সাইর সন্ধিতে এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভার্সাই-এ উপস্থিত জার্মান প্রতিনিধিদিগকে মিত্রশক্তিবর্গ-প্রণীত খসড়াচুক্তির উপর তাহাদের মন্তব্যগুলি লিখিত ভাবে দাখিল করিবার

অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল মাত্র ; তন্মধ্যে কয়েকটি মন্তব্য বিবেচিত হইবার পর সংশোধিত চুক্তিপত্র ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা পাঁচ দিনের মধ্যে জার্মান প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়া লওয়া হয়। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরকালে জার্মান স্বাক্ষরকারীদ্বয়কে মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে একই টেবিলে বসিবার অধিকার পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই, তাহাদিগকে সাধারণ বন্দীর ন্যায় সশস্ত্র পাহারায় দপ্তরে আনা হয় এবং সেখান হইতে লইয়া যাওয়া হয়। এই সকল অনাবশ্যক অসম্মানের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া জার্মানী ও অন্যান্য স্থানে পরবর্তীকালে ভয়ানক আকারে দেখা দেয়। সমগ্র জার্মানজাতির মনে ভার্সাইর সন্ধি একটি dictated peace রূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং জার্মান ও অন্যান্য জাতির অনেক লোকের নিকটই এই সন্ধি একটি বিরাট অন্যায়রূপে পরিগণিত হয়। তাই তাহাদের মতে জার্মানদের ইহা মানিয়া চলার জন্য কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, ভার্সাই সন্ধি প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্‌-এর 'চতুর্দ্দশ দফা'-র উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং জার্মানী শান্তিস্থাপনের এই শর্ত্তগুলি মানিয়া লইবার ফলেই যুদ্ধ-বিরতি হইয়াছিল। 'চতুর্দ্দশ দফা'-র আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, এই সন্ধি প্রকৃত আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একটি জাতি সংঘ, শ্রমিকদের অবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আন্ত-র্জাতিক শ্রমিক সংস্থা, এবং জার্মানী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত উপনিবেশগুলির শাসনের জন্য একটি ব্যবস্থার সৃষ্টি এই সন্ধির কতগুলি প্রধান কীর্ত্তি। ১৯১৯ সনের পরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি নূতন বিশ্ব-ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় ও অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু, আদর্শবাদের মধ্যে বিজয়ী শক্তিবর্গের সুবিধাবাদের সংমিশ্রণের যে চেষ্টা সন্ধিকারীরা করিয়াছিলেন তাহার ফল বিশেষ শুভ হয় নাই। এই সন্ধির অনেকাংশ চতুর্দ্দশ দফার সহিত তুলনা করিলে সমালোচকরা সহজেই সন্ধিটিকে নিন্দা করিতে পারেন। জার্মানী যে সকল স্থান পোল্যাণ্ডকে ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহা যে কেবলমাত্র পোল-অধ্যুষিতই ছিল, অথবা জার্মান উপনিবেশগুলি জার্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন করার ফলে ঔপনিবেশিক দাবীগুলির পক্ষপাতহীন ভাবেই যে মেটান হইয়া-ছিল, অথবা জাতীয় আত্মনির্ধারণের ভিত্তিতে রাজ্যবণ্টন ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া জার্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়ার একীকরণে বাধা দান করা যে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। কথা ও কাজের

মধ্যে এই এবং আরও কতগুলি ব্যত্যয়ের ফলে ভার্সাইসন্ধিকে একটি অন্যায় চুক্তি ও মিত্রশক্তিদিগকে যুদ্ধবিরতির শর্ত-লঙ্ঘনকারী বলিয়া মনে করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল।

ভার্সাইর সন্ধির ফলে জার্মানীর বিরুদ্ধে যে সকল শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার প্রায় সকলগুলিই উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে, অথবা বিলম্বিত কাল-ক্ষেপের ফলে, অথবা জার্মানী কর্তৃক কার্য্যে পরিণত করিতে অসম্মত হওয়ার জন্য কালক্রমে নাকচ হইয়া গিয়াছিল। (এইগুলি পরে বিশদভাবে আলোচিত হইবে।) এখানে ইউরোপের রাজ্য-বণ্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পশ্চিমে জার্মানী ফ্রান্সকে আলসাক ও লরেইন্‌, বেলজিয়ামকে ইয়োপেন এবং মালমেডির দুইটি ক্ষুদ্র স্থান অর্পণ করিল, এবং লাক্সেমবার্গের সহিত তাহার সম্মিলিত শুল্ক ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিল। ১৫ বৎসরের জন্য 'সার'-এর কয়লা-খনি অঞ্চলগুলির শাসনব্যবস্থা জাতি সংঘের একটি পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইল; ১৫ বৎসর পরে গণভোট দ্বারা ইহার ভাগ্য নির্ধারিত হইবে এই ব্যবস্থাও করা হইল। যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সের কয়লা-খনিগুলি ধ্বংস হওয়ার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই খনিগুলির মালিকানা স্বত্ব ফ্রান্সকে দেওয়া হইল। দক্ষিণে, জার্মানী চেকোশ্লভাকিয়াকে একটি ক্ষুদ্র ভূ-ভাগ অর্পণ করে, এবং জাতি সংঘের কাউন্সিলের সর্ব্ব-সম্মতি ব্যতিরেকে জার্মানীকে অষ্ট্রিয়ার সহিত সম্মিলিত হইতে নিষেধ করা হইল। উত্তরে শ্লেস্‌উইগের একটি অংশে ১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে গণভোট গ্রহণ করা হইল। ইহার ফলে এই অঞ্চলের উত্তর ভাগ ডেনমার্কের সহিত এবং দক্ষিণ ভাগ জার্মানীর সহিত সংযুক্ত করা হইল। পূর্বদিকে জার্মানী মেমেল বন্দর ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চল (ভবিষ্যতে লিথুনিয়াকে অর্পণ করিবার জন্য) সেই সময়ের জন্য প্রধান মিত্রশক্তিবর্গের হস্তে ছাড়িয়া দিল। পোল্যাণ্ডকে পোসেন প্রদেশ এবং ৪০ মাইল দীর্ঘ 'করিডর' সমেত পশ্চিম প্রাশিয়ার বৃহত্তর অংশ দেওয়া হইল। ড্যানজিগ নামক জার্মান শহরটি একটি স্বাধীন নগরীতে পরিগণিত হইল; অবশ্য পোল্যাণ্ডের সহিত ইহার সন্ধি চুক্তি হইল, এবং পোল্যাণ্ডের শুল্ক ব্যবস্থার সহিত এই নগরী সংযুক্ত হইয়া পোল্যাণ্ডের হস্তে ইহার পররাষ্ট্র বিভাগের ভার ন্যস্ত করিল। ইহা ছাড়া, পশ্চিম প্রাশিয়ার 'মেরিয়েনোয়ার্দার'জেলায়, পূর্ব প্রাসিয়ার এ্যালেনষ্টেন্‌ জেলায় এবং সমগ্র উত্তর সাইলেসিয়ায় গণভোট গ্রহণ করা স্থির হইল।

গণভোটের ফলে মাত্র কয়েকটি গ্রাম পোল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করা ছাড়া মেরিয়েনোয়ার্দার এবং এ্যালেনস্টেনের আর সকল স্থানগুলিই জার্মানী লাভ করিয়াছিল। এক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯২১ সনে, তীব্র অসন্তোষ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে উত্তর সাইলেশিয়ায় গণভোট গ্রহণ করা হয়। যদিও জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ জার্মানীর পক্ষে এবং শতকরা ৪০ ভাগ পোল্যাণ্ডের পক্ষে ভোট দিয়াছিল, তথাপি সহজেই এই অঞ্চলের ভাগ-বাটোয়ারা হইল না। বৃটিশ এবং ইটালিয়ান কমিশনারদ্বয় যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেন, ফরাসী কমিশনার তাহা মানিয়া লইলেন না। ইহার ফলে বিষয়টি জাতি সংঘের কাউন্সিলের নিকট পাঠান হইল। যেহেতু এই কাউন্সিল পোল্যাণ্ডের পক্ষ-সমর্থনকারী ফরাসী কমিশনারের পক্ষপাতদুষ্টমত এবং বৃটিশ ও ইটালীয়ান কমিশনারদের নিরপেক্ষ মতের মধ্যে একটি মাঝামাঝি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রায় দিয়াছিল, সেইজন্য জার্মানী ইহা ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং জার্মানদের মন জাতি সংঘের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠে। মোটামুটি ভাবে, এই শান্তি ব্যবস্থায় জার্মানী ইউরোপের ২৫ হাজার বর্গমাইল স্থান এবং প্রায় ৭০ লক্ষ অধিবাসী হারায়।

এইবার অন্যান্য শান্তি চুক্তিগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। ১৯১৮ সনের নভেম্বর মাসে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান রাজতন্ত্রের পতনের ফলে অষ্ট্রিয়া একটি সঙ্গীহীন, অসমঞ্জস অংশে পরিণত হইল। ইহার ৭০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২০ লক্ষেরও অধিক ভিয়েনা নগরীতে একত্রিত ছিল। বোহেমিয়া, মোরাভিয়া এবং অষ্ট্রিয়ান সাইলেসিয়া অস্ট্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন চেকোশ্লভাকিয়া রাজ্যের পত্তন করে। শ্লোভেনিয়া, সার্বিয়া এবং ক্রোশিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া যুগশ্লভ রাজ্যের সৃষ্টি করিল। ইটালী ত্রিয়েস্তে এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ দখল করিয়া লইয়াছিল। সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধি সুসম্পন্ন ঘটনাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়াছে মাত্র। জাতীয় আত্মনির্ধারণ-নীতিকে উপেক্ষা করিয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত জার্মানীকে সংযুক্ত হইতে দেওয়া হইল না, এবং জার্মান ভাষা-ভাষী দক্ষিণ টাইরল ইটালীকে প্রদান করা হইল। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, সন্ধিচুক্তির এই সকল রাজনৈতিক অবমাননা অষ্ট্রিয়ার জনসাধারণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মিত্রশক্তিবর্গ রাজ্য বণ্টন সম্পর্কিত শর্তগুলি ব্যতিরেকে সন্ধির অন্যান্য শর্ত কার্য্যকরী করার চেষ্টা করে নাই, এবং

অষ্ট্রিয়ান ক্ষতিপূরণ কমিশন একটি আর্ত-ত্রাণ সংস্থায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এককোটি সত্তর লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত প্রাচীন হাঙ্গেরীয় রাজ্যও কতগুলি বিভিন্ন জাতিমূলক অংশে বিভক্ত হইল। ত্রিয়াননের সন্ধির দ্বারা শ্লোভাকিয়া চেকোশ্লভাকিয়াকে, ক্রোশিয়া যুগশ্লভিয়াকে এবং ট্রান্সিলভেনিয়া রুমানিয়াকে যুক্তিযুক্তভাবে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের সুবিধা রক্ষা করার জন্য হাঙ্গেরীর সীমান্ত অঞ্চলে কতগুলি অন্যায় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

হাঙ্গেরীর মত বুলগেরিয়ার ক্ষয়-ক্ষতিও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল। ১৯১৩ সনের দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে বুলগেরিয়ার যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল ১৯১৯ সনে নিউলির সন্ধি দ্বারা তাহাকে পুনরায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উপরন্তু, এই সন্ধিতে বুলগেরিয়ার সহিত সার্বিয়া এবং গ্রীসের সীমান্ত বুলগেরিয়ার অসুবিধা সত্বেও পরিবর্ত্তিত করা হয়। বুলগেরিয়ার সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল মেসিডোনিয়ার হস্তান্তর। মেসিডোনিয়ার জাতিতাত্বিক সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ ছিল। শ্লভ-জাতি হইতে উদ্ভূত হইলেও মেসিডোনিয়ানদের ভাষা সার্বিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল সমূহের সার্বিয়ান ভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে বুলগেরিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের বুলগেরিয়ান ভাষার সহিতও মিশ্রিত হইয়াছিল। ১৯১৯ সনের সন্ধি দ্বারা মেসিডোনিয়ার বৃহত্তর অংশ সার্বিয়াকে, এবং বাদবাকী অংশের বেশীর ভাগ গ্রীসকে অর্পণ করা হয়। কিন্তু মেসিডোনিয়ান জাতির মধ্যে দস্যু-বৃত্তিকে সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। ইহার প্রধান প্রধান ব্যক্তি বুলগেরিয়ায় পলায়ন করিয়া একটি সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি করে, এবং যুগশ্লভ ও গ্রীক অঞ্চলে মাঝে মাঝে আক্রমণ চালাইয়া বুলগেরিয়ার সহিত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সম্বন্ধ যুদ্ধের পরবর্ত্তী ১০ বৎসর পর্য্যন্ত তিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ছাড়া নিউলির সন্ধিতে বুলগেরিয়াকে ঈজিয়ান সমুদ্রের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে মিত্রশক্তিবর্গ একটি গ্রীক বন্দরে বুলগেরিয়ার জন্য একটি স্বাধীন অঞ্চলের সৃষ্টি করে।

ইহা ছাড়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লভাকিয়া, যুগশ্লভিয়া, রুমানীয়া এবং গ্রীসকে প্রধান মিত্রশক্তিগুলির সহিত কতগুলি সন্ধি স্থাপন করিয়া এই সকল রাজ্যে অবস্থিত জাতিতাত্বিক, ধর্মীয় এবং ভাষামূলক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে রাজনৈতিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভাষামূলক সুযোগ-সুবিধা দান

করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং তুরস্কের সহিত স্বাক্ষরিত সন্ধিগুলিতেও এই জাতীয় শর্তের উল্লেখ রহিয়াছে। অন্যান্য বৃহৎ শক্তির সহিত সমান বলিয়া জার্মানীকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল কেবলমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে; অর্থাৎ জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধিতে তাহার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি দিতে হয় নাই।

নিকট প্রাচ্য এবং আফ্রিকার ব্যবস্থা ঃ

১৯২৩ সনের লুসানের সন্ধি ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকিবে বলিয়া ইহার স্বাক্ষরকারী শক্তিগুলি মানিয়া লইয়াছিল। এই চুক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরতির প্রায় পাঁচ বৎসর কাল পরে যখন উভয় পক্ষের তিক্ততা ও উত্তেজনা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল, তখন এই সন্ধি তুরস্কের সহিত দীর্ঘ আলোচনার পর একটি নিরপেক্ষ রাজ্যে স্বাক্ষরিত হয়; এই সন্ধি কখনও বিজিতের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই।

১৯১৯ সনের মে মাসে যখন 'শান্তি-সভা' তুরস্কের ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা করিতে ছিল তখন গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী ভেনিজেলোস্ এশিয়া মাইনরে অবস্থিত স্মার্ণা নামক অঞ্চল অধিকার করিতে মিত্র শক্তিদের অনুমতি আদায় করিলেন। ইহার ফলে ক্রুদ্ধ তুর্কীরা মুস্তাফাকামালের নেতৃত্বে সমগ্র তুরস্কে বিপ্লবের সৃষ্টি করিল। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের সাহায্যে তুরস্কের সরকার কোনমতে কন্‌ষ্টেন্টিনোপেলে টিকিয়া রহিল মাত্র। বিপ্লবের এই সঙ্কেত সত্ত্বেও ১৯২০ সনের আগষ্ট মাসে মিত্রশক্তিবর্গ এই মর্মে কনষ্টেণ্টিনোপল সরকারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল যে স্মার্ণা পাঁচ বৎসরের জন্য গ্রীসের অধিকারে থাকিবে, এবং পরে ইহার ভবিষ্যৎ গণভোট দ্বারা নির্ধারিত হইবে। কয়েকটি ঘটনার জন্য সেভ্রেসের এই সন্ধি কার্য্যকরী হইল না। ১৯২০ সনেব অক্টোবর মাসে গ্রীসের রাজা আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর যুদ্ধরত জার্মানীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ভূতপূর্ব রাজা কন্‌ষ্টেণ্টাইনকে পুনরায় রাজপদে অভিষিক্ত করা হয় এবং ভেনিজেলোসে্র মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ইহার ফলে মিত্রশক্তিবর্গের গ্রীক-প্রীতি কমিয়া যায়, এবং তাহারা (ফরাসী এবং ইটালী) আঙ্কারায় প্রতিষ্ঠিত নবগঠিত কামাল সরকারের সহিত 'গোপন' চুক্তি সম্পাদন করে। ইতিমধ্যে গ্রীকদের সহিত কামালের যুদ্ধ

আরম্ভ হয়, এবং ১৯২২ সনের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মুস্তাফা কামাল গ্রীক সৈন্যদের শেষদলকে এশিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। বিজয় লাভে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিপ্লবী তুর্কীরা কনষ্টেণ্টিনোপলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। ফলে বৃটেনের সঙ্গে কামালের যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল তখন হঠাৎ মুস্তাফা কামাল যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। পরে ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে তিনি লুসানের শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন।

১৯১৮ সনের যুদ্ধ-বিরতির সময় বিশাল 'অটোমান' সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, এবং ইহার অধীনস্থ আরব রাজ্যগুলি বৃটেন ও ফরাসী শক্তির অধীনে আসে। সৌভাগ্যের বিষয়, নবগঠিত তুর্কীরাষ্ট্র আরব রাজ্যগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে; ফলে লুসানের শান্তি চুক্তি সহজেই সম্পাদিত হয়। ইউরোপে তুরস্কের সীমারেখা গ্রীসের ক্ষতি সত্ত্বেও আড্রিয়ানোপল অতিক্রম করে; এবং স্মার্ণার গণভোটের কথা ধামাচাপা পড়ে। সেভ্রেস সন্ধির শাস্তি, ক্ষতিপূরণ এবং নিরস্ত্রীকরণ মূলক ধারাগুলি লুপ্ত হয়। থ্রেস এবং Straits (প্রণালী) এলাকায় তুরস্ক দুইটি অসামরিক অঞ্চলের সৃষ্টি মানিয়া লয়। তুরস্কের জাতীয় পরিষদ কামালকে সভাপতি করিয়া তুরস্ককে একটি প্রজাতন্ত্র রূপে গঠন করে, এবং ১৯২৪ সনে মুসলমান ধর্মের প্রধান, অটোমান খলিফার পদটি উঠাইয়া দেয়। এই সব আরব রাজ্যগুলি Mandate ব্যবস্থার অধীনে রাখা হয়, জাতি সংঘের গঠনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বিজিত শক্তিদের দ্বারা যে সকল অর্পিত ভূভাগে স্বায়ত্তশাসনে অক্ষম যে সকল জাতি বাস করে তাহাদিগকে কয়েকটি উন্নত জাতির অধীনে রাখা হইবে, এবং জাতিসংঘের পক্ষে এই শক্তিগুলি তাহাদের উপর শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবে। যেসব মিত্রশক্তি এইরূপে জার্মানী এবং তুরস্কের নিকট হইতে কতগুলি স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহারাই এ-গুলির তত্ত্বাবধানের জন্য ম্যাণ্ডেট শাসকদিগকে নির্বাচিত করিয়াছিল। জাতিসংঘ ম্যাণ্ডেট শক্তিগুলির নিকট হইতে বাৎসরিক রিপোর্ট গ্রহণ করিত, এবং ম্যাণ্ডেট্ শক্তিগুলির শাসনের সমালোচনাও করিতে পারিত। যেহেতু জাতিসংঘ কাহাকেও ম্যাণ্ডেট শাসনের অধিকার দেয় নাই সেইহেতু ইহা এই শাসন-ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিবার অধিকারী ছিল না। ম্যাণ্ডেট শাসনাধীন ভূভাগগুলির সার্বভৌমত্ব কোথায়—এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া দুষ্কর।

ম্যাণ্ডেট শাসনাধীনস্থ ভূভাগগুলি অনগ্রসরতার ভিত্তিতে 'A', 'B', ও

'C', এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। 'A' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট অঞ্চলগুলিতে তুরস্কের প্রাক্তন দেশগুলি ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত এই দেশগুলি স্বায়ত্বশাসনে সক্ষম না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ম্যাণ্ডেট শক্তিগুলি ইহাদিগকে শাসনতান্ত্রিক পরামর্শ ও সাহায্য দিবে, এবং ম্যাণ্ডেট শক্তি নির্ব্বাচনে ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থাধীন জনগণের মতামত বিবেচনা করা হইবে। এই শেষোক্ত নিয়ম সর্বক্ষেত্রেই যে পালিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন আরব রাজ্যগুলির ভাগ্য বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি গোপন চুক্তিদ্বারা পূর্বেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের মতামত পরবর্তীকালে ঠিকঠিকভাবে বিবেচিত হয় নাই। সিরিয়ার ম্যাণ্ডেট ফ্রান্সকে, এবং ইরাক, প্যালেষ্টাইন ও ট্রান্স্‌জোর্ডানিয়ার ম্যাণ্ডেট বৃটেনকে দেওয়া হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৭ সনে বৃটিশ সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল যে, প্যালেষ্টাইনে তাহারা ইহুদী জাতির একটি মাতৃভূমির সৃষ্টি করিবে। অটোমান সাম্রাজ্যের বাকী রাজ্যগুলি স্বাধীনতা লাভ করিল। লোহিত সাগর উপকূলে একটি আরব অঞ্চল হেজাজ নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি করিল, এবং আরবের অন্যান্য অঞ্চল লইয়া শেখ, সুলতান ও ইমামদের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হইল।

জার্মানীর আফ্রিকাস্থ উপনিবেশগুলির বেশীর ভাগই 'B' শ্রেণীর। এই সব উপনিবেশগুলিতে ম্যাণ্ডেট শক্তিকে দাস ব্যবসায় ও অস্ত্র আমদানী বন্ধ করিবার জন্য, পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োজন অথবা ঐ অঞ্চলগুলির আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যতিরেকে আদিম জাতিগুলি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে না বলিয়া, এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সভ্য রাষ্ট্রগুলিকে এই সকল অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমানাধিকার দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে হইল। পূর্ব আফ্রিকায় মাত্র দুইটি পশ্চিমদিকের প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র টাঙ্গানিকার ম্যাণ্ডেট শাসনভার বৃটেনকে, ও ঐ দুইটি পশ্চিমদিকের প্রদেশ বেলজিয়ামকে দেওয়া হয়, এবং দক্ষিণে কিওঙ্গা বন্দর সরাসরিভাবে পর্তুগালকে দান করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকায় ক্যামেরুণ এবং তোগোল্যাণ্ড বৃটিশ ও ফরাসী ম্যাণ্ডেট দিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

'C' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার (দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের অধীনে) এবং জার্মানীর প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপগুলির (অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং জাপানের অধীনে) জন্য করা হয়।

'C' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট অঞ্চলগুলি ম্যাণ্ডেট শাসনকারী শক্তির নিজস্ব আইন অনুযায়ী শাসিত হইবে, এবং এই সকল অঞ্চলে জাতিসংঘের অন্যান্য সভ্যকে ব্যবসা বাণিজ্যের সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা রহিল না।

আমেরিকা এবং দূর প্রাচ্য ঃ

যুদ্ধোত্তর কালে যুক্তরাষ্ট্র চরম আদর্শবাদ ও চরম সাবধানতার মধ্যে তাহার বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করিয়াছিল। যদিও ভার্সাইর সন্ধিতে জাতিসংঘের নিয়মপত্রটি (Covenant) প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ইচ্ছাতেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তথাপি যুক্তরাষ্ট্র নিয়মপত্রের শর্তগুলি মানিয়া চলিবার ভয়ে এই সন্ধি স্বাক্ষর করিল না। আমেরিকার এই অসহযোগের ফল সুদূর প্রসারী হইয়াছিল, যদিও ইউরোপের শান্তিব্যবস্থার উপরে ইহার প্রভাব তখনই উপলব্ধ হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীর সহিত পৃথকভাবে সন্ধি স্থাপন করিল, কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র দূরে সরিয়া থাকার নীতি বজায় রাখিতে পারিল না। যুদ্ধের পরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান প্রধান শক্তিরূপে আবির্ভূত হইল। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জাপান জার্মানীর নিকট হইতে চীনে অবস্থিত কিয়াওচো স্থানটি লাভ করিয়াছিল—এবং ইহার ফলেই চীন এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হয়। ইহা ছাড়া, জাপান উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় জার্মান দ্বীপগুলির ম্যাণ্ডেট শাসনভার লাভ করে। রাশিয়ার পতনের ফলে চীন সীমান্তে জাপান একমাত্র বৃহৎ শক্তিরূপে দেখা দেয়, এবং রাশিয়া ও জার্মানীর নৌবাহিনী যুগপৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে জাপান দূর প্রাচ্যে প্রথম এবং সমগ্র বিশ্বে তৃতীয় নৌশক্তিরূপে পরিগণিত হয়। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ চিন্তিত হয়, এবং ১৯২১ সনের শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী, চীন, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল ও বেলজিয়ামকে ওয়াশিংটনে একটি সভায় মিলিত হইতে আহ্বান করে। এই ওয়াশিংটন সম্মেলনের ফলে তিনটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। (১) বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জাপানের দ্বারা স্বাক্ষরিত "চতুঃশক্তি সন্ধি" অনুযায়ী প্রশান্ত মহাসাগরে প্রত্যেকে অপরের দ্বীপগুলিতে হস্তক্ষেপ না করিতে, এবং অন্য কোন বহিঃশক্তির আক্রমণাত্মক কার্য্যের ফলে অথবা নিজেদের মধ্যে কোনরূপ স্বার্থ-সংঘাত উপস্থিত হইলে তাহারা পারস্পরিক আলোচনার

প্রতিশ্রুতি দিল। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র এই প্রথম অন্যান্য বৃহৎ শক্তির সহিত একযোগে কাজ করিতে সম্মত হইল, এবং জাপানী মিত্রতামূলক সন্ধির সমাপ্তি ঘটিল। (২) "পঞ্চ-শক্তিসন্ধি"র দ্বারা বিস্তৃত নৌ-নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা হয়। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির পরিমাণ সমান করা হয়, জাপানের মুখ্য রণতরীর সংখ্যা বৃটিশ বা যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌশক্তির শতকরা ৬০ ভাগ, এবং ফরাসী ও ইটালীর নৌশক্তি শতকরা ৩৫ ভাগ স্থির করা হয়। ক্ষুদ্র রণতরী সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় নাই। স্বাক্ষরকারীগণ প্রশান্ত মহাসাগরের একটি নির্দিষ্ট এলাকার দুর্গ এবং নৌঘাটি সম্বন্ধে স্থিতাবস্থা রক্ষা করিয়া চলিতে প্রতিশ্রুত হইল। (৩) 'নবশক্তি সন্ধি'র দ্বারা স্বাক্ষরকারীগণ চীনের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে এবং চীনের দুরবস্থার সুযোগ লইয়া চীনের নিকট হইতে বিশেষ সুবিধা বা অধিকার লাভ করিবার জন্য চেষ্টা না করিতে প্রতিশ্রুতি দিল।

এই সন্ধি তিনটি ছাড়া বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের চাপের ফলে জাপান ও চীনের মধ্যে একটি চুক্তি হইল। এই চুক্তির দ্বারা স্থির হইল যে জাপান চীনকে কিয়াওচো নামক স্থানটি প্রত্যর্পণ করিবে। সকলেই ওয়াশিংটন সম্মেলনকে সফল বলিয়া ঘোষণা করিল। মনে হইল, প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধপূর্বের রাজনৈতিক ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা সত্য যে জাপানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ক্রমোন্নতির পথে এই সম্মেলন বিরাট বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। চীনের অখণ্ডতা রক্ষায় এবং ইঙ্গ-আমেরিকান নৌপ্রাধান্যে জাপান আর বাধা স্বরূপ হইল না। যদিও সেই সময়ের মত জাপানকে জোর করিয়া দমিত করিয়া রাখা হইল এবং জাপান অনিচ্ছাসত্ত্বে এই সন্ধিগুলি মানিয়া লইল, তথাপি দূরপ্রাচ্যে জাপান না এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি প্রধান হইবে এই সমস্যার কোন সঠিক মীমাংসা হইল না। তবে ইহা সত্য যে, ১০ বৎসর কাল যাবৎ ওয়াশিংটন সম্মেলন এই সমস্যার সমাধান মুলতুবী রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৈত্রী চুক্তি—১৯২০-১৯২৪—(The Alliances)

ফ্রান্স ও মিত্রবর্গ:

১৯১৯ সনের পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ব্যাপারসমূহের মধ্যে ফ্রান্সের আত্মরক্ষার দাবী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং এমন কি নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পরে ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সের সামরিক প্রাধান্য সর্বজন-স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের এই সামরিক খ্যাতি নবজাগ্রত জার্মানীর নিকট ধ্বংস হইল। ফ্রান্স অপেক্ষা জার্মানীর খনিজসম্পদ অনেক বেশী থাকার জন্য সমরোপকরণ উৎপাদনে জার্মানীর অধিকতর সুবিধা ছিল। জার্মানীর জনসংখ্যা প্রতি দশ বৎসরে ৫০ লক্ষেরও বেশী বৃদ্ধি পাইতেছিল, এবং ১৯০৫ সনের মধ্যে মোট লোকসংখ্যা ৬ কোটীরও বেশী হইল। ইহা ছাড়া সামরিক সংগঠনে জার্মানরা অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। জার্মানীর সমর-যন্ত্র ফ্রান্সের সমর-যন্ত্র অপেক্ষা সকল দিক হইতেই অনেক উন্নত ছিল। ১৯১৪ সনে কেবলমাত্র বৃটেনের হস্তক্ষেপের ফলেই ফ্রান্স জার্মানীর নিকট চরম পরাজয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। সুতরাং ১৯১৮ সনে, বিজয়োল্লাসের মধ্যেও ফ্রান্সের জার্মান-ভীতি নির্মূল হয় নাই। তাই ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য রাইন নদী এবং ইহার সেতুগুলি তাহার অধীনে রাখিবার দাবী জানাইল। কিন্তু, যেহেতু রাইনের বামতীরে ৫০ লক্ষেরও অধিক জার্মানের বাস ছিল, সেইহেতু মিত্রশক্তিবর্গ রাইন সীমান্তের রক্ষা-ব্যবস্থা ফ্রান্সের হাতে দিতে অস্বীকৃত হইল। অনেক বাদানুবাদের পরে ফ্রান্স তাহার দাবী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। বিনিময়ে স্থির হইল যে, রাইন নদীর বাম তীর ১৫ বৎসর যাবৎ মিত্রশক্তির অধিকারে থাকিবে, এই অঞ্চলের নিরস্ত্রীকরণ হইবে, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিশেষ চুক্তি দ্বারা ঠিক হইল যে, বিনাকারণে জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করিলে ঐ দুই শক্তি তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ভার্সাই সন্ধি মানিয়া লইতে রাজী না হওয়ায় বৃটেন ও আমেরিকা কর্তৃক ফ্রান্সকে সাহায্য দেওয়ার এই চুক্তি নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইল। ইহার

ফলে ফ্রান্স নিজেকে বঞ্চিত মনে করিল, এবং ভবিষ্যতে ইঙ্গ-ফরাসী সকল আলোচনার মধ্যেই ফ্রান্সের এই অনুযোগ ও দুঃখ প্রকাশ পায়। এইরূপে ফ্রান্স তাহার প্রাকৃতিক রক্ষা-কবচ হইতে বঞ্চিত হইয়া জার্মান-ভীতি দূর করিবার জন্য (১) সন্ধিমূলক আত্মরক্ষার অঙ্গীকার এবং (২) একটি মৈত্রী ব্যবস্থার স্মরণাপন্ন হইল।

ইঙ্গ-আমেরিকান সাহায্য-চুক্তি নিরর্থক প্রমাণিত হইবার পর ফ্রান্স জাতি-সংঘের নিয়মপত্রের আশ্বাসে আশ্বস্ত থাকিতে পারিল না। নিয়ম পত্রের দশম ধারায় বলা হইয়াছে যে, জাতিসংঘের সভ্যগণ বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে সকল সভ্যকেই রক্ষা করিবে, এবং ১৬ ও ১৭ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন রাষ্ট্র তাহার কর্তব্য অবহেলা করিয়া অন্য কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন বা শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে; কিন্তু, বৃটেন দশম ধারাটি অনিচ্ছাসত্বে গ্রহণ করিয়াছিল, এবং একটি আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনী সৃষ্টির জন্য ফ্রান্সের দাবী বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। ১৬ নং ধারা অনুযায়ী জাতি সংঘের সভ্যগণকে আক্রমণকারীর সহিত অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জাতিসংঘের কাউন্সিলে সকল সভ্যকেই একমত হইতে হইবে, এবং সভ্যরা ইচ্ছামত এই প্রকারের প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া আমেরিকার অসহযোগ অর্থ নৈতিক অবরোধকে অসম্ভব করিয়া তুলিল।

জাতিসংঘের বৈঠকে প্রথম দিকেই নিয়মপত্রের উপকারিতা সম্বন্ধে ফ্রান্সের সংশয়শীলতা প্রকট হইয়াছিল। যখন ১৯২০ সনের ডিসেম্বর মাসে জেনেভা নগরীতে জাতি সংঘের পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় তখনই ১০ নং এবং ১৬ নং ধারার উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। ক্যানাডা ১০ নং ধারা সম্পূর্ণ রূপে নাকচ করিতে চাহিল, এবং স্কেণ্ডিনেভিয়ার প্রতিনিধিগণ ১৬ নং ধারায় বর্ণিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যতিক্রমের জন্য দাবী জানাইল। এই সকল প্রস্তাব লইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা চলিল। পরবৎসর পরিষদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, যখন প্রয়োজন হইবে তখন কাউন্সিল ১৬ নং ধারানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট তারিখ হইতে অর্থ নৈতিক চাপ কার্যকরী করিবে। ১৯২৩ সনে একটি প্রস্তাব আনা হইল যে, ১০ নং ধারা অনুযায়ী কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তাহা প্রত্যেক সভ্যরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কর্তৃবর্গ নির্ধারণ

করিবে। যদিও ১০ নং অথবা ১৬ নং ধারা সরকারীভাবে সংশোধিত করা হয় নাই, তথাপি এই সকল আলোচনার দ্বারা ইহা পরিষ্কার হইয়াছিল যে, প্রয়োজনের সময়ে এই সকল ধারার ব্যবহার হয়তো নিয়মপত্রের লিপি অনুযায়ী করা হইবে না। সুতরাং, জেনেভা-ব্যবস্থা দ্বারা বহিরাক্রমণের হাত হইতে ফ্রান্সের রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হইল। এই অবস্থায় ফ্রান্স স্বভাবতঃই সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃটেনের নিকট অতিরিক্ত সাহায্যের অঙ্গীকার চাহিল। ইহার ফল অবশ্য অদ্ভুত হইয়াছিল। ১৯২২ সনে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সনের সন্ধির ভিত্তিতে ফ্রান্সকে সাহায্য দানের অঙ্গীকার করিল। কিন্তু দূরদৃষ্টিহীন ফরাসী প্রধান মন্ত্রী পয়েনকেয়ার (Poincare) এই প্রস্তাবের মধ্যে একটি সঠিক সামরিক সাহায্যের অঙ্গীকার দাবী করিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার এই শেষোক্ত দাবী মানিতে রাজী হইল না, এবং ফলে ফরাসীদের আত্মরক্ষার আশা ব্যর্থ হইল।

অবশ্য Poincareএর এই অনমনীয় মনোভাবের কারণ ছিল অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা স্থাপনে ফ্রান্সের সফলতা। সামরিক মিত্রতার ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত ফ্রান্স আক্রমণের বিরুদ্ধে মৌখিক সাহায্যের অঙ্গীকার অপেক্ষা সামরিক মৈত্রীকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিল। ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বেলজিয়ামের সহিত সামরিক মৈত্রীর চুক্তি করিয়া পশ্চিমের রক্ষাব্যবস্থা দৃঢ় করা হইল। ইহা ছাড়া নবগঠিত পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া এবং রুমানীয়ার সহিত সামরিক মৈত্রী স্থাপন করিয়া জার্মানীর চারিদিকে বেড়াজালের সৃষ্টি করা হয়।

পোল্যাণ্ডের অবস্থা :

দশম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ড একটি বিশাল, শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কিন্তু, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া একযোগে পোল্যাণ্ডের ধ্বংস সাধন করে এবং রাজ্যটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে পোল্যাণ্ডের নবজন্ম হয়। কিন্তু নবগঠিত পোল্যাণ্ডকে প্রথম হইতেই নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই রাজ্যে বিভিন্ন ঐতিহ্য, প্রথা, আইনকানুন ও আচার ব্যবহার লইয়া রাশিয়ান, জার্মান এবং অষ্ট্রিয়ান পোলগণ বিবাদ না করিয়া একটি নূতন জাতিগঠনের সুকঠিন ব্রত

গ্রহণ করিল। ইহা ছাড়া, একমাত্র দক্ষিণ দিক ব্যতীত অন্য কোন দিকেই পোল্যাণ্ডের কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমান্ত ছিল না। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা পশ্চিমে এবং উত্তরে পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর উত্তর সীমান্ত নির্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু, অন্যান্য দিকে পোল্যাণ্ডের সীমান্ত লইয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমে অষ্ট্রিয়ান সাইলেশিয়া নামক ক্ষুদ্র জেলা লইয়া পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। ১৯১৯ সনের প্রথমভাগে ফরাসী ও ইংরেজ কর্মচারীদের চেষ্টায় পোল এবং চেক্ সৈন্যদের মধ্যে ধূমায়মান যুদ্ধাগ্নি নির্বাপিত হয়, এবং এই অঞ্চলে গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু গণভোট গ্রহণের তারিখের কিছু পূর্ব্বে দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, গণভোট ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ফ্রান্সের চাপে উভয় পক্ষই মীমাংসা করিতে রাজী হয়। এই মীমাংসার দ্বারা চেকোশ্লভাকিয়া অষ্ট্রিয়ান সাইলেশিয়ার কয়লাখনিগুলি লাভ করে, এবং পোল্যাণ্ড রেল ষ্টেশন ব্যতিরেকে টেচেন নামক প্রধান শহরটি পায়। অবশ্য উভয় পক্ষই এই মীমাংসার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিল। এদিকে অষ্ট্রিয়ান পোল্যাণ্ডে একটি ভিন্ন সমস্যা দেখা দিল। এই অঞ্চলের জমিহীন রুথেন কৃষকরা সংখ্যালঘু পোল জমিদারদের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সনের প্রথমভাগে বিদ্রোহ করে। মিত্র শক্তিদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পোল সৈন্যবাহিনী কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করে। তখন মিত্রশক্তিবর্গ প্রস্তাব করে যে, ২৫ বৎসরের জন্য পোল্যাণ্ড পূর্বগেলিসিয়ার উপর Mandate শাসন প্রয়োগ করিবে, এবং ইহার পর এই অঞ্চলের ভাগ্য জাতি-সংঘের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। কিন্তু পোলগণ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং এই অঞ্চল নিজেদের অধিকারে রাখে। ফলে, ১৯২৩ খৃঃ অব্দে মিত্রশক্তিবর্গ পূর্বগেলিসিয়ার উপরে পোল্যাণ্ডের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লয়, তবে ইহা বলা থাকে যে, এই অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা হইবে (অবশ্য পোল্যাণ্ড ইহা কখনই করে নাই)।

পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমান্তে আরও ব্যাপকভাবে এই সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে। পোল্যাণ্ডের গৌরবময় যুগে ইহার অধিকার লিথুনিয়া, শ্বেতরাশিয়া এবং ইউক্রেনের উপর বিস্তৃত ছিল। এই সকল অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জমিদারীগুলির মালিক ছিল পোলগণ। ১৯১৭ সনের রাশিয়ান বিপ্লবের ফলে এই

সকল পোল জমিদার পোল্যাণ্ডে আশ্রয়ে লয়, এবং ঐ অঞ্চলগুলি জয় করিবার জন্ম পোল সরকারকে চাপ দিতে থাকে। ইহার ফলে পোলবাহিনী ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইউক্রেন আক্রমণ করে এবং অগঠিত সোভিয়েট বাহিনীকে পরাজিত করিয়া কিয়েভ দখল করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সোভিয়েট বাহিনী পোলদের পরাজিত করিয়া প্রায় ওয়ারশ পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যায়। পোলবাহিনী এবার শ্বেতরাশিয়া আক্রমণ করে। ইহার ফলে রাশিয়া যুদ্ধ বিরতির জন্ম সম্মত হয়। মিত্রশক্তিবর্গের প্রস্তাবিত 'কার্জন সীমারেখা'র দেড়শত মাইল পূর্বে পোল্যাণ্ডের সীমান্ত নির্ধারিত হইল, এবং ১৯২১ সনে 'রিগা'র সন্ধি-দ্বারা এই চুক্তি বলবৎ করা হইল। পোল্যাণ্ড ইউক্রেনের দাবী ত্যাগ করিল, এবং বিনিময়ে শ্বেতরাশিয়ার এক বিরাট ভূখণ্ড লাভ করিল।

লিথুনিয়াতে ভিলনা নগরী ও জিলা লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হইল। ১৯১৮ সনে স্বাধীন লিথুনিয়ার সৃষ্টি হইলে ভিল্‌নাকে ইহার রাজধানী করা হয়। কিন্তু পোল্যাণ্ডের সহিত এই নগরীর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এখানে একটি বিখ্যাত পোল বিশ্ববিদ্যালয় এবং পোল সংস্কৃতির প্রাচীন পীঠস্থান ছিল। অবশ্য জাতির দিক হইতে বিচার করিতে গেলে নগরবাসীদের বেশীর ভাগই ছিল ইহুদী, এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল শ্বেতরাশিয়ান ও লিথুনিয়ান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অধিবাসীদের ইচ্ছানুযায়ী এই অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারিত হয় নাই। ১৯২০ সনের জুলাই মাসে লিথুনিয়ার সহিত সন্ধিদ্বারা রাশিয়া ভিল্‌নার উপর লিথুনিয়ার দাবী মানিয়া লয়। পোল্যাণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করিলে লিথুনিয়া সাফল্যের সহিত বাধা দান করিয়াছিল, এবং যুদ্ধ বিরতির সময় ভিল্‌না শহর এবং জেলা লিথুনিয়ার অধীনে থাকিয়া যায়। কিন্তু মাত্র তিনদিন পরে একজন পোল সৈন্যাধ্যক্ষ বেসরকারীভাবে আক্রমন চালাইয়া হঠাৎ ভিল্‌না দখল করেন। যদিও পোল সরকার এই আক্রমণের দায়িত্ব অস্বীকার করে, তথাপি এই অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসরণ করিতে তাহারা অস্বীকার করে। জাতিসংঘ দীর্ঘ আলোচনা চালাইয়াও পোলদিগকে এই অঞ্চল হইতে সরাইতে পারিল না। পরে ১৯১৯ সনে লিথুনিয়া যখন মেমেল দখল করে তখন মিত্রশক্তিবর্গ সরকারীভাবে ভিল্‌নার উপর পোল্যাণ্ডের অধিকার মানিয়া লয়। এইরূপে পোল্যাণ্ড তিনকোটীরও বেশী লোকের একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হইল। দক্ষিণ-পশ্চিমে যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা ও লৌহ, পূর্বগেলিসিয়ায় খনিজ তৈল,

পূর্বদিকে বিস্তৃত অরণ্য, এবং প্রায় সর্বত্রই চাষোপযোগী জমি থাকায় পোল্যাণ্ড প্রাকৃতিক সম্পদে যথার্থই ভাগ্যবান ছিল। কিন্তু এই রাষ্ট্রের কতগুলি দুর্বলতাও ছিল। নাগরিকদের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ ছিল পোল ব্যতিরেকে অন্যান্য জাতি এবং ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল শত্রু-ভাবাপন্ন। ইহা ছাড়া এই সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পোল্যাণ্ডের সদ্‌ভাব ছিল না। সংখ্যালঘু জার্মান সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণ ও ডেনজিগ লইয়া পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর অবিরত বিবাদ চলিতে লাগিল। রাশিয়া, লিথুনিয়া, অথবা চেকোশ্লোভাকিয়া কেহই পোল্যাণ্ডের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। পূর্ব ইউরোপে পোল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হইলেও এককভাবে বিশ্বের সম্মুখীন হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই সকল পরিবেশের মধ্যে পোল্যাণ্ড সাগ্রহে ফ্রান্স-প্রস্তাবিত মিত্রতামূলক সন্ধি স্থাপনে রাজী হইল। ১৯২১ সনের এই সন্ধির সহিত একটি গোপন সামরিক চুক্তিও সম্পাদিত হইয়াছিল, যাহার ফলে ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সামরিক সম্ভার সরবরাহ করিতে রাজী হইল। নানারূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এই বন্ধুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রত্যেক ব্যাপারে এই দুই মিত্ররাষ্ট্র যুগ্মভাবে কাজ করিয়াছিল।

ক্ষুদ্র মিত্রত্রয় (The Little Entente)।

চেকোশ্লভাকিয়া, যুগোশ্লভিয়া এবং রুমানীয়া লইয়া এই Little Entente গঠিত। শ্লোভ জাতির দুই শাখা—চেক এবং শ্লোভাক্—লইয়া এই নূতন রাষ্ট্রের পত্তন হয়। চেকরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং সমরকুশলতায় শ্লোভাকদের অপেক্ষা উন্নত ছিল। সুতরাং, যখন এই নবরাষ্ট্রের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী এবং শিক্ষকদিগকে প্রধানতঃ চেকদিগের মধ্য হইতেই নিযুক্ত করা হইল তখন শ্লোভাক্‌গণ অসন্তুষ্ট হইয়া শ্লোভাকিয়ার জন্য স্বায়ত্ব শাসনের দাবী করিল। যদিও চেকোশ্লভাকিয়ার বিরাট অংশ কৃষিপ্রধান ছিল, তথাপি এই রাষ্ট্র শিল্পে এবং যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনে বিশেষ উন্নত ছিল। কিন্তু ইহার ১ কোটি ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৬৫ লক্ষ ছিল চেক্ এবং ৮৫ লক্ষ ছিল শ্লোভাক্। জনসংখ্যার বাকী অংশ ছিল জার্মান, হাঙ্গেরীয়ান, রুথেন এবং পোল। বহিরাক্রমণের সময় শ্লোভাকদিগের উপর এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উপর ভরসা ছিল খুব কম। ইহা ছাড়া, রাজধানী প্রাগ সীমান্তবর্তী হওয়ায় যুদ্ধের সময় জার্মানী কর্তৃক সহজেই অধিকৃত হইবার

সম্ভাবনা ছিল খুব বেশী; উপরন্তু, দীর্ঘ, অপ্রশস্ত স্লোভাকিয়া অঞ্চল হাঙ্গেরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করাও ছিল দুঃসাধ্য। এই সকল কারণে মধ্য-ইউরোপে সামরিক দিক হইতে চেকোস্লোভাকিয়ার অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা সঙ্গীন।

নবগঠিত রুমানীয়া হাঙ্গেরী ও রাশিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী কিছু কিছু স্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও হাঙ্গেরীয়ান, রাশিয়ান, এবং ইহুদী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রুমানীয়ার ক্ষতি সাধনে অক্ষম ছিল, তথাপি রুমানীয়ার শাসক সম্প্রদায় যেমন ছিল অসাধু, তেমনি ইহার সৈন্যবাহিনী ছিল দুর্বল।

চেকোস্লোভাকিয়ার ন্যায় যুগোস্লাভিয়াও আভ্যন্তরীণ সংখ্যালঘু সমস্যার সম্মুখীন হইল। এই রাষ্ট্রে সার্ব, ক্রোট ও স্লভেন নামক জাতি তিনটির মধ্যে কোন প্রকার সহযোগিতা ছিল না, এবং সার্বদের অপরিণত রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্য এই রাষ্ট্রে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রথা চালু করাও অসম্ভব ছিল। ক্রোট নেতারা স্বায়ত্বশাসন দাবী করায় তাহাদের অনেকেই কারাগারে অথবা নির্বাসনে কাল কাটাইল। যুগোস্লাভিয়ার স্বার্থ ছিল বিচিত্র এবং বিস্তৃত। চেকোস্লোভাকিয়া প্রধানতঃ ছিল মধ্য ইউরোপীয়, এবং রুমানিয়া ছিল বলকানে, কিন্তু যুগোস্লাভিয়ার স্বার্থ ছিল উভয় ভূভাগে। প্রধানতঃ হাঙ্গেরীকে বাধা দিবার জন্যই Little Entente গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু যুগোস্লাভিয়ার প্রধান ভয়ের কারণ ছিল ইটালী, হাঙ্গেরী নহে। যুগোস্লাভিয়ার মতে ইটালী অন্যায়ভাবে অনেক স্লভ অঞ্চল দখল করিয়াছিল, এবং হয়ত যুগস্লোভিয়া ধ্বংস করিবার জন্য ষড়যন্ত্রও করিতেছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের ইউরোপীয় বিবাদগুলির মধ্যে ইটালীর সহিত যুগোস্লাভিয়ার শত্রুতা ছিল অন্যতম।

১৯২০ এবং ১৯২১ সনে Little Entente-র শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল, ইহার অনেক পরে ফ্রান্স এই রাষ্ট্রগুলির সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। কিন্তু প্রথম হইতেই ফ্রান্সের সহিত এই সকল রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ বোঝাপড়া হইয়াছিল। ফ্রান্স এই রাষ্ট্রগুলিতে সামরিক মিশন ও সমর সম্ভার প্রেরণ করিয়াছিল, এবং এই ক্ষুদ্র রাজ্যত্রয় তাহাদের বৈদেশিক ব্যাপারে ফ্রান্সের বিশ্বস্ত অনুগামীরূপে কাজ করিয়াছিল। কিন্তু Little Entente-র সহিত ফ্রান্সের সম্বন্ধ ও পোল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সম্বন্ধ ভিন্ন

প্রকারের ছিল। পোল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সম্বন্ধের ভিত্তি ছিল জার্মান-ভীতি, অপর পক্ষে Little Entente-র সহিত সম্পর্কের পশ্চাতে ছিল একটি বিশেষ লাভের প্রশ্ন। Little Entente যেমন ফ্রান্সকে ভার্সাই সন্ধি বলবৎ রাখিতে সাহায্য করে (যদিও ইহাতে তাহাদের স্বার্থ ছিল খুব অল্পই), তেমনি ফ্রান্স Little Entente-কে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে এবং বিশেষতঃ যুগোস্লাভিয়াকে ইটালীর বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এইরূপে ফ্রান্স কেবলমাত্র ভার্সাই সন্ধিটি নহে, সমগ্র ইউরোপের শান্তিব্যবস্থা রক্ষায় অংশীদার হইল।

১৯২০ হইতে ১৯২৪ খৃঃ পর্য্যন্ত এক বিরাট, সুসংবদ্ধ বিজয়ী সেনাবাহিনী এবং বিপুল সমরোপকরণের অধিকারী ফ্রান্সের শক্তি ও সম্মান চরমে উঠিল। স্থিতাবস্থার প্রধান সমর্থনকারী হিসাবে এবং পরিবর্তননীতি (Revisionism)-র প্রধান বিরোধী শক্তি হিসাবে ফ্রান্স কাজ করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়

পরাজিত জার্মানী

(Germany in Defeat)

যুদ্ধোত্তর কালের ফরাসী-গৌরবের যুগকে জার্মানীর অপমানের যুগ বলিয়া গণনা করা যায়। যুদ্ধ-পূর্বকালে জার্মানীতে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র ও সামরিক স্বেচ্ছাতন্ত্রের একটি মিশ্র শাসনতন্ত্রের অধীনে জার্মানী শাসিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইহার ফলে এই সময়ে জার্মানীতে একটি সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়, এবং ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবার্ট। উইমার নামক শহরে ১৯১৯ সনে এই নূতন শাসনতন্ত্র জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া নবগঠিত সরকার উইমার রিপাব্‌লিক (প্রজাতন্ত্র) নামে পরিচিত। প্রথম হইতেই নানারূপ অসুবিধার মধ্যে এই নূতন সরকারকে কার্য্য করিতে হয়। অপমানকর ভার্সাই সন্ধিটি এই সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবার ফলে সমগ্র জার্মান জাতির নিকট সরকার অপ্রিয় ও নিন্দিত হয়। মিত্রশক্তিবর্গের নিকট সর্বদা অপমানকর আচরণ পাওয়ার ফলে উইমার গণতন্ত্র স্বদেশবাসীর প্রীতি ও আনুগত্য কখনই লাভ করিতে পারে নাই।

যুদ্ধাপরাধী

বৃটেন ও ফ্রান্স উভয় শক্তিই উৎসাহের সহিত সন্ধির 'যুদ্ধাপরাধ' এবং 'যুদ্ধাপরাধী' সংক্রান্ত ধারাগুলি মানিয়া লইয়াছিল। যুদ্ধের সময় বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন, অধিকৃত অঞ্চলগুলির যথেচ্ছাধ্বংসসাধন, বোমা বর্ষণ করিয়া বেসামরিক জনসাধারণের হত্যা, এবং বাণিজ্য-জাহাজের বিরুদ্ধে ডুবো-জাহাজের আক্রমণ প্রভৃতি নৈতিক অপরাধের জন্য জার্মানীকে অপরাধী প্রমাণ করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সে যে প্রবল প্রচারকার্য্য চালান হইয়াছিল তাহার ফলে মিত্রদেশগুলির জনসাধারণ জার্মানীর এই সকল অপরাধের জন্য সরকারী ভাবে শাস্তি দাবী করে। সন্ধিপত্রের ক্ষতিপূরণ শীর্ষক অধ্যায়ের প্রথমেই

একটি ধারায় বলা হইয়াছে যে, জার্মানী ও তাহার মিত্র বর্গের আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ফলে মিত্রশক্তিবর্গের যে সকল ক্ষতি হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব জার্মানী গ্রহণ করিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের বাগ্-বিতণ্ডা হয়ত আরও যুগযুগ ধরিয়া চলিতে থাকিবে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, এই যুদ্ধের জন্য জার্মানী ও তাহার মিত্রবর্গের দায়িত্বই ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু, ঐতিহাসিক সত্যকে আন্তর্জাতিক সন্ধি বা বিজিতের উপর জোর করিয়া চাপান সন্ধির দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। বিজয়োল্লাসও উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মিত্রশক্তিবর্গ বুঝিতে পারে নাই যে, জোর করিয়া অপরাধ স্বীকার করাইয়া কোন সত্যই প্রমাণিত হইবে না, বরং জার্মানদের মনে ইহা এক প্রচণ্ড তিক্ততার সৃষ্টি করিবে। অপরপক্ষে, জার্মান পণ্ডিতগণ তাঁহাদের দেশকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মিত্র দেশগুলিতে যুদ্ধাপরাধ আইনের নিরর্থকতা সকলের বোধগম্য হইল। কিন্তু তথাপি ইহা সরকারীভাবে রহিত করা হইল না; কালক্রমে সন্ধিটির সঙ্গে একযোগে ইহারও সমাধি হইল।

'শাস্তি'-শীর্ষক যুদ্ধাপরাধী সংক্রান্ত ধারাগুলি দ্রুত কার্য্যকরী হয়। প্রথমতঃ, মিত্রশক্তিবর্গ জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মকে আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও বিভিন্ন সন্ধি-চুক্তি লঙ্ঘন করিবার জন্য অপরাধী ঘোষণা করিল, এবং স্থির করা হইল যে, আমেরিকান, বৃটিশ, ফরাসী, ইটালীয়ান এবং জাপানী—এই পাঁচজন বিচারকের একটি বিচারালয় তাঁহার শাস্তি নির্ধারণ করিবে। সন্ধিটি কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিতকাল পরেই মিত্রশক্তিবর্গ সরকারীভাবে পলাতক জার্মান সম্রাটকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য হল্যাণ্ডের নিকট সরকারীভাবে অনুরোধ জানাইল। আন্তর্জাতিক নীতির দোহাই দিয়া হল্যাণ্ড এই রাজনৈতিক শরণার্থীকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইল; ইহার ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই এই ধারাটি বিস্মৃতির অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়। ইহা একরূপ ভালই হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব কাইজারের সাধারণভাবে বিচার হইলে তিনি তাঁহার নষ্ট সম্মান ফিরিয়া পাইতেন, এবং জার্মান জাতির নিকট তিনি হয়তো শহীদরূপে অমরত্ব লাভ করিতেন। ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটি ধারানুযায়ী যুদ্ধের নীতি ও আইন ভঙ্গ করার অপরাধে মিত্রশক্তিবর্গ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মিত্রপক্ষীয় সমরাদালত-

গুলির নিকট সমর্পণ করিতে জার্মানী রাজী হইল। যখন দেখা গেল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকায় যুবরাজ, হিণ্ডেনবার্গ, লুডেনডর্ফ এবং যুদ্ধকালীন জার্মানীর প্রায় সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তখন সমগ্র জার্মানীতে অসন্তোষের এমন এক প্রবল ঝড় বহিয়া গেল যে মিত্রশক্তি-বর্গের দাবী মানিয়া লওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইল। জার্মানী এবং মিত্রশক্তিদের মধ্যে দীর্ঘ বাদানুবাদের পর এইরূপ মীমাংসা হইল যে, জার্মান সরকার ১২ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লেপজিগে জার্মান সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে হাজির করিবে। ১৯২১ সনে এই বিচার-কার্য্য হইয়াছিল। মিত্রশক্তিদের সরকার-গুলি আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা চালায়। মাত্র ৬ জন অপরাধী দোষী প্রমাণিত হয় এবং তাহাদিগকে কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয়। ইহার পর এই সকল ধারা সম্বন্ধে আর কোন কথা শোনা যায় নাই। এই সময়ে যদি মিত্রশক্তিগুলি তাহাদের স্বপক্ষীয় অপরাধীদিগেরও বিচারের ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে একটি ভাল নজীরের সৃষ্টি হইত, এবং আন্তর্জাতিক আইনকে একটি কার্য্যকরী সত্যে পরিণত করা সম্ভব হইত।

নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament)।

বিজয়ী মিত্রশক্তিদের যুদ্ধোত্তরকালীন স্বাভাবিক নীতি হইয়াছিল শত্রু-দিগকে যতদূর সম্ভব সামরিকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম করিয়া তোলা। যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি অনুযায়ী জার্মানী তাহার নৌবাহিনী এবং ভারী কামানের অধিকাংশই মিত্রপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। উপরন্তু, তাহার সামরিক শক্তির উপর স্থায়ীভাবে কতগুলি বাধানিষেধ আরোপিত হইল। ইচ্ছা-মূলক যোগদানের ভিত্তিতে সংগৃহীত জার্মান সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষে সীমাবদ্ধ করা হইল; মাত্র ৬টি যুদ্ধ জাহাজ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র যুদ্ধ জাহাজ লইয়া জার্মান নৌবাহিনীর পুনর্গঠন হইল; উপরন্তু, জার্মানীর পক্ষে কোন প্রকার ডুবোজাহাজ, সামরিক উড়োজাহাজ,বা ভারী কামান রাখা, অথবা দুর্গ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ হইল। সর্ব প্রকারের যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ, এবং ইহার উৎপাদনের কারখানার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হইল। এই সকল বিধিনিষেধ কার্য্যকরী হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য জার্মানীতে মিত্রপক্ষীয় নৌ, সেনা, ও বিমান কমিশন পাঠান হইল, এবং এই কমিশনগুলি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জার্মানীতে ছিল। জার্মানরা এই সকল বিধিনিষেধ ফাঁকি দিবার জন্য সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা করিয়াছে। অনেক সমরোপকরণ লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল;

এবং বিধিনিষেধের কড়াকড়ি কমিয়া যাইবার পর জার্মান সামরিক শক্তিকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য সর্বত্র গোপন প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। এক কথায় বলিতে গেলে ১৯২৪ সনের মধ্যে জার্মানীকে এরূপভাবে নিরস্ত্রীকৃত করা হয় যাহার তুলনা আধুনিক যুগের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী রাইন অঞ্চলের বেসামরিক শাসনভার জার্মানীর হস্তে ছিল, তবে ফরাসী, বেলজিয়ান, বৃটিশ ও আমেরিকান প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মিত্রপক্ষীয় একটি হাইকমিশন মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের পালন, রক্ষা, অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারিত, এবং এই অর্ডিন্যান্স আইনরূপে গণ্য হইত। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভার্সাইর সন্ধি গ্রহণ না করিলেও ১৯২৩ সন পর্যন্ত রাইন অঞ্চলে আমেরিকান সৈন্য অবস্থান করে এবং হাই-কমিশনের সকল সভায় আমেরিকান কমিশনার যোগ দিয়াছিলেন (যদিও তাঁহার ভোটাধিকার ছিল না)।

রাইন অঞ্চলের উপর এই যুগ্ম অধিকার সর্বপ্রথম জার্মানীর প্রতি ফরাসী ও বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্য সকলের গোচরীভূত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিকালে প্যারিসের ন্যায় লণ্ডনেও জার্মান-বিরোধী মনোভাব সমভাবে বর্তমান ছিল; এবং ভার্সাই সন্ধির অনেকগুলি ধারাই বৃটিশ সরকার সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু বৃটেনে এই মনোভাব ক্রমেই কমিয়া আসে। অপর পক্ষে, জার্মান নৌবাহিনীর ধ্বংস সাধনের ফলে বৃটেনে যখন আর কোন চিন্তার কারণ রহিল না,তখনও ফ্রান্সে জার্মান-ভীতি সম্পূর্ণ প্রবল ছিল। যেহেতু কোন ইউরোপীয় শক্তিকে এককভাবে ইউরোপীয় মহাদেশে সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য লাভ করিতে দিতে বৃটেন চিরদিনই অনিচ্ছুক ছিল, সেই হেতু সে ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার নীতিও গ্রহণ করিতে পারে নাই। সততা ও বিজিতের প্রতি উদারতা প্রদর্শন নীতিতে আস্থাশীল বৃটিশ জাতি প্রতিশোধপরায়ণ ফরাসী জাতির সহিত জার্মান-নীতি পরিচালনায় একমত হইতে পারে নাই। রাইন অঞ্চলের দক্ষিণাংশের অধিকারী ফরাসী বাহিনী সর্বদাই বিজেতার মত ব্যবহার করিত, কিন্তু ইংরেজবাহিনী অল্পদিনের মধ্যেই রাইন অঞ্চলের জার্মানদিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। অবস্থা এরূপ হইল যে, ইংরেজ সৈন্যেরা ফরাসীদের অপেক্ষা জার্মানদের সহিত অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে মেলামেশা করিতে লাগিল। ইহার ফলে কয়েকটি অবাঞ্ছিত ঘটনার উদ্ভব হয়।

প্রথমতঃ, ফরাসীরা রাইন অঞ্চলে একদল অশ্বেতকায় সৈন্য নিযুক্ত করিলে জার্মানরা ইহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করে। ফরাসীদের কোনরূপ বর্ণ-বৈষম্য ছিল না, এবং হয় তো তাহারা কোন অসদুদ্দেশ্য লইয়া এই অশ্বেতকায় বাহিনী নিয়োগ করে নাই। কিন্তু, জার্মান, ইংরেজ এবং আমেরিকানদের মধ্যে বর্ণবৈষম্যের হীনতা ছিল। সুতরাং, এই ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়া বৃটিশ এবং আমেরিকান জনমত দৃঢ়তার সহিত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানীকে সমর্থন জানাইল। দ্বিতীয়তঃ, ভার্সাই সন্ধির দ্বারা রাইন অঞ্চলকে জার্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় বিফল হইয়া ফ্রান্স স্থানীয় জার্মানদিগকে জার্মানীর শাসকদের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া রাইন অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন করিবার জন্য প্ররোচনা দিতে লাগিল। কিন্তু এই আন্দোলনের কোন ভিত্ত বা যুক্তি ছিল না। ফরাসীরা অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন জার্মান দেশদ্রোহীকে এই অঞ্চলে আমদানী করিল এবং ইহাদের সাহায্যে তিন বৎসর যাবৎ পৃথকীকরণমূলক একটি আন্দোলন জিয়াইয়া রাখিল। ১৯২৩ সনের শরৎকালে প্যালেটিনেট অঞ্চলে স্থানীয় ফরাসী প্রতিনিধি পৃথকীকরণ আন্দোলনকারীদিগকে একটি স্বাধীন সরকার রূপে ঘোষণা করিলেন, ও এই সরকার ফরাসী সামরিক সাহায্য লাভ করিয়া জার্মান শাসকদিগকে বহিষ্কৃত করে এবং এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করে। ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসে ভোটাধিক্যের সাহায্যে মিত্রপক্ষীয় হাইকমিশন প্যালেটিনেটের এই নবগঠিত স্বাধীন সরকারকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেয়। ইহাতে বৃটিশ সরকার এবং বৃটিশ জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়া ফরাসী সরকারকে ভয়ানকভাবে চাপ দিতে থাকে। ফলে, ফ্রান্স এই সরকারকে কোনরূপ সমর্থন না করার জন্য রাইন অঞ্চলস্থিত ফরাসী প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেয়; এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্যালেটি-নেটের প্রধান সহরগুলিতে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়, এবং প্রায় ২৪ জন পৃথককারীকে জনসাধারণ হত্যা করে। ১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এই আন্দোলনের কথা আর শোনা যায় না।

কিন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন লইয়া।

ক্ষতিপূরণ (Reparation)

যুদ্ধের সময় অনেক দেশের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ বিজিতের শাস্তিসূচক

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিল। মিত্র সরকার-গুলি এই প্রকার জনমত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে তাহাদের এবং তাহাদের সহিত যোগদানকারী শক্তিবর্গের কেবলমাত্র বেসামরিক জন-গণের ও তাহাদের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য জার্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী ভার্সাই সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করিল। কিন্তু ইহার কার্যকরী ফল খুব অল্পই ফলিয়াছিল; কারণ ইহা শীঘ্রই সকলের বোধগম্য হইল যে, জার্মানীর সমস্ত সম্পদের সাহায্যেও এই সীমাবদ্ধ ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। ক্ষতি-পূরণ শর্তের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, সন্ধিটিতে ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না। ক্ষতিপূরণ কমিশন নামক একটি মিত্রপক্ষীয় কমিশনকে ক্ষতিপূরণের বিল করিতে এবং কি উপায়ে ইহা দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিতে বলা হইল। অবশ্য, ১৯২১ সনের ১লা মার্চের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে, এবং এই তারিখের পূর্বেই জার্মানী ১০০ কোটি পাউণ্ড এই খাতে দিবে বলিয়া স্থির হয়। ধরিয়া লওয়া হইল যে, পরবর্তীকালের দেয় টাকা কম পক্ষে ৩০ বৎসর কাল ব্যাপিয়া আদায় করা হইবে। ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে মিত্রপক্ষীয় এবং জার্মান প্রতিনিধিদের মধ্যে পত্র বিনিময়ের সময়ে মিত্রপক্ষ স্থির করিয়াছিল যে, ক্ষতিপূরণ কমিশন কর্তৃক ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করিবার বদলে জার্মানী যদি তাহার দেয় দায়ের মীমাংসা কারতে এক কিস্তীতে ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধ করিতে চায় তবে তাহারা উহা বিবেচনা করিয়া দেখিবে। এই শর্ত এবং কিস্তীতে দেয় ১০০ কোটি টাকা পণ্যের সাহায্যে শোধ করার প্রস্তাব ১৯২০ সনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ১৯২০ সনের জুলাই মাসে 'স্পা' (spa) সম্মেলনে মিত্রপক্ষীয় মন্ত্রীদের সহিত সমান মর্যাদায় মিলিত হইয়া জার্মান প্রতিনিধিগণ স্থির করিলেন যে, পরবর্তী ৬ মাস কালের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা জার্মানী মিত্রপক্ষকে দিবে, এবং ইহার শতকরা ৫২ ভাগ ফ্রান্সকে, শতকরা ২২ ভাগ বৃটিশ সাম্রাজ্যকে, শতকরা ১০ ভাগ ইটালীকে, শতকরা ৮ ভাগ বেলজিয়ামকে, এবং অবশিষ্টাংশ ক্ষুদ্র মিত্রশক্তি-বর্গের মধ্যে বিভক্ত হইবে। বেলজিয়ামের শোচনীয় দুরবস্থার জন্য এই ক্ষতিপূরণের খাতে প্রদত্ত প্রথম ১০ কোটি টাকা লাভ করিবে।

এককালীন দেয় টাকার প্রস্তাব লইয়া উভয় পক্ষের কোন মীমাংসা হইল না। ১৯২১ সনের মার্চ মাসে জার্মানী প্রারম্ভিক ক্ষতিপূরণাঙ্ক প্রদান

না করায় এবং নিরস্ত্রীকরণের কতিপয় শর্ত পালন না করায় মিত্র সৈন্যরা রাইন নদীর পূর্বে ডুসেল ডর্ফ, ডুইসবার্গ এবং রুহরোর্ট নামক তিনটি শহর দখল করিয়া লয়। সন্ধি অনুযায়ী ১৯২১ সনের এপ্রিল মাসে ক্ষতিপূরণ কমিশন ৬৬০ কোটি পাউণ্ড জার্মানীর মোট দায়রূপে ধার্য্য করে। কিন্তু, ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির বিচক্ষণ লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নির্ধারিত এই দায়ের একটি সামান্য অংশাপেক্ষা বেশী দেওয়া জার্মানীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য, মিত্রপক্ষীয় সরকারগুলি তাহাদের ক্ষতিপূরণের দাবী হ্রাস করিতে সাহস করিল না; এবং জার্মানীর দায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া A, B, ও C নামক হুণ্ডির দ্বারা পরিচিত হইল। যতদিন পর্য্যন্ত জার্মানী ইহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত ৪ শত কোটি পাউণ্ডের C শ্রেণীর হুণ্ডি ক্ষতিপূরণ কমিশনের হস্তে মজুদ থাকিবে; এইরূপে মোট ঋণের দুই তৃতীয়াংশের পরিশোধ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইল। অবশিষ্ট ঋণের পরিশোধের জন্য মিত্র সরকারগুলি ব্যবস্থা (Schedule of payments) করিল যে প্রতিবৎসর জার্মানী ১০ কোটি পাউণ্ড ও তাহার রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ মিত্রপক্ষকে দিতে থাকিবে। জার্মানীকে ইহা জানান হইল যে, ১২ই মের মধ্যে জার্মানী যদি এই ব্যবস্থা মানিয়া না লয় তাহা হইলে মিত্র সৈন্যরা রূঢ় উপত্যকা দখল করিয়া লইবে। জার্মানী বাধ্য হইয়া ১১ই মে এই প্রস্তাব মানিয়া লইল। আগষ্ট মাসের মধ্যে জার্মানী এই ব্যবস্থাঅনুযায়ী পাঁচকোটি পাউণ্ড প্রথম কিস্তিতে প্রদান করিল, এবং পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য ইহাই ছিল তাহার শেষ নগদ অর্থ-প্রদান। অল্পকালের মধ্যেই জার্মানীতে মুদ্রা সংকটের সৃষ্টি হইল। ইতিপূর্ব্বে, ১৯২০ সনের মাঝামাঝি সময়ে জার্মান মার্কের মূল্য ইহার স্বাভাবিক মূল্য হইতে বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। পূর্ব্বে এক পাউণ্ডের আনুপাতিক মূল্য ছিল ২০ মার্ক, কিন্তু এই সময়ে ইহা ২৫০ মার্কে আসিয়া নামিল। বিদেশী ফট্‌কা-বাজীদের চেষ্টায় এই অবস্থা কিছুদিন চলিল। ১৯২১ সনের গ্রীষ্মকালে যখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে, দায় শোধের জন্য জার্মানীর প্রচুর বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হইবে, তখন মার্কের মূল্য দ্রুতগতিতে হ্রাস হইতে লাগিল। নভেম্বর মাসে এক পাউণ্ডের মূল্য হইল এক হাজার মার্ক, এবং ১৯২২ সনের গ্রীষ্মকালে মার্কের মূল্য আরও ভয়ানক ভাবে হ্রাস পাইল।

এই সময় সকল দেশের অর্থনীতিবিদগণ বুঝিতে পারিলেন যে, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নগদ টাকায় শোধ করার ক্ষমতা জার্মানীর সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে। মিত্রবর্গের নিকট মার্ক মূল্যহীন হইল, এবং জার্মানীর ক্ষতিপূরণ দিবার সদিচ্ছা থাকিলেও বিদেশী মুদ্রা ক্রয় করিবার তাহার কোন সামর্থ্য ছিল না। বৃটিশ সরকার পরবর্তী ২ বৎসরের জন্য জার্মানী কর্তৃক নগদ অর্থ প্রদান স্থগিত রাখিবার জন্য চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু ফরাসীরা ইহার বিরোধিতা করিল। ইহা ছাড়া, ১৯২১ সনের চরমপত্রটি ফরাসীদের ক্ষুধা আরও বৃদ্ধি করিল। ফরাসীরা ভাবিল যে, রূঢ় দখল করিতে পারিলে ফ্রান্সের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হইবে এবং জার্মাণ শিল্পগুলির মুনাফা মিত্রশক্তিদের করতলগত হইবে। ১৯২২ সনের ডিসেম্বর মাসে জার্মানী মিত্রপক্ষকে নির্দিষ্ট দ্রব্যাদি দিতে অল্পের জন্য অসমর্থ হওয়ায় ক্ষতিপূরণ কমিশন বৃটিশ প্রতিনিধির বিরোধিতা সত্ত্বেও জার্মানীকে 'ইচ্ছাকৃত বাকীদার'রূপে ঘোষণা করিল। ইহার ফলে ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী মিত্রবর্গ জার্মাণীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকারী হইল।

১৯২৩ সনের ১১ই জানুয়ারী বৃটিশ সরকারের সহযোগিতা অথবা এমন কি অনুমোদন লাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ফরাসী ও বেলজিয়াম সৈন্যগণ রূঢ়ে প্রবেশ করিলে জার্মান সরকার নিষ্ক্রিয় বাধাদানের নীতি অবলম্বন করে। জার্মানদিগকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিতে নিষেধ করা হয় এবং স্বেচ্ছায় দেয় সকলপ্রকার ক্ষতিপূরণের অর্থ বা দ্রব্যাদি প্রদান করা বন্ধ রাখা হইল। প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স অধিকৃত ও অনধিকৃত এলাকার মধ্যে একটি সীমারেখা নির্ধারিত করিল এবং ইহাদের মধ্যে মালের আদানপ্রদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিল। অবাধ্য কর্মচারী ও শিল্পপতিদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল অথবা বন্দী করা হইল; এবং রূঢ়ের শিল্পোৎপাদন হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্য একটি সংস্থার সৃষ্টি করা হইল। বৃটিশ সরকার মন্তব্য করিল যে, অন্যায় অজুহাতে এবং মিত্রপক্ষের সর্বসম্মতি না লইয়া ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম যাহা করিয়াছে তাহার ফলে সন্ধিভঙ্গ করা হইয়াছে। ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের অবনতি ঘটিল এবং রাইন অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইল। ১৯২৩ সনে হাইকমিশনের সকল সিদ্ধান্ত বৃটিশ প্রতিনিধির মতের বিরুদ্ধে গৃহীত হইয়াছিল; এবং রূঢ় অধিকার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি বৃটেনের অধীনস্থ অঞ্চলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কার্যকরী করিতে আপত্তি করিল।

রূঢ় অধিকার জার্মাণীর অর্থনৈতিক জীবনে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিল। রূঢ় হইতে প্রাপ্ত কয়লা এবং লোহের মূল্য অপেক্ষা রূঢ় আক্রমণে ফ্রান্সের সামরিক ব্যয় হইয়াছিল অধিক। এদিকে জার্মানী সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া হইল। ১৯২৩ সনে ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইল যে, প্রতিদিন মার্কের মূল্য পূর্বদিনের মূল্যের অর্ধেকে পরিণত হইল। বিদেশীরা তাহাদের কয়েকটি মাত্র বিদেশী মুদ্রার সাহায্যে জার্মানীতে অত্যন্ত জাকজমকের সহিত দিন কাটাইতে পারিত। ১৯২৩ সনের শেষ ভাগে এক পাউণ্ডের বিনিময়ে ৫০ হাজার মিলিয়ার্ড মার্ক পাওয়া যাইত। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জার্মান মার্কের প্রারম্ভিক মূল্য-হ্রাস যুদ্ধ, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, শাসনযন্ত্রের অচলাবস্থা, ও মিত্রশক্তিবর্গের আকাশচুম্বী চাহিদার ফলেই হইয়াছিল এবং এই সকল কারণ আয়ত্তে আনা জার্মান সরকারের সাধ্য ছিল না। যখন একবার এই অবস্থার সৃষ্টি হইল তখন জার্মান কর্তৃপক্ষ ইহাকে বাধা দিবার কোনরূপ চেষ্টা করিল না। একটি বিরাট অনির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের অঙ্ক জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে যে কেবলমাত্র বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই নহে, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য জার্মানদের সদিচ্ছার মূলেও ইহা কুঠারাঘাত করিয়াছিল। কারণ জার্মানীরা জানিত, যে পরিমাণে তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে সেই পরিমাণে অর্থ মিত্রশক্তিকে দিতে হইবে। সুতরাং উদাসীনভাবে জার্মাণ কর্তৃপক্ষ মার্কের মূল্য হ্রাসের সম্মুখীন হইয়াছিল। মুদ্রাস্ফীতির এমন চরম দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখা যায় নাই, এবং জার্মানীতে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে অসংখ্য কাগজীমুদ্রা চালু করা হইল।

জার্মানীর পক্ষে এই মুদ্রাস্ফীতি ভার্সাই সন্ধি অপেক্ষাও বড় ক্ষতিরূপে দেখা দিয়াছিল। প্রত্যেকটি বন্ধক (mortgage), নির্দিষ্ট সুদ আদায়কারী অর্থবিনিয়োগ, বা মার্কের মূল্যে নির্ধারিত ব্যাঙ্কের হিসাব মূল্যহীন হইয়া গেল। চক্ষের নিমেষে সকল জমা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। অভিজাত সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, জমি, বাড়ী প্রভৃতি তাহাদের অক্ষুণ্ণ রহিল। প্রচুর লাভ হইল কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ফটকাবাজীদের। "দিন-এনে-দিন খাওয়া" মজুরদের তেমন কোন ক্ষতি হইল না। উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কেরানীদের বেতনের হার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে যত দ্রুত বাড়িয়াছিল শ্রমিকদের মজুরী সমানুপাতিকভাবে তাহা অপেক্ষা অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সঞ্চিত অর্থ হারাইয়া মধ্যবিত্ত

শ্রেণী নিঃস্বদের সমপর্য্যায়ে নামিয়া আসিল, এবং তাহাদের অবমাননার শেষ রহিল না। এই ক্ষতিগ্রস্ত এবং অধোগামী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের চেলা সংগ্রহ করা হইল।

রূঢ় অধিকার বস্তুতই যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীতে এক নূতন সরকার গঠিত হয়, এবং স্ট্রেস্‌ম্যান নামক এক ব্যক্তি চ্যানসেলর ও বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। "নিষ্ক্রীয়-বাধা-দান" নীতি অনুযায়ী কার্য করিবার ভার পড়িল ষ্ট্রেসম্যানের উপর। কিন্তু ইহাতে মিত্রশক্তিবর্গের কোনরূপ সুবিধা হইল না। জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা পুনর্গঠিত না হইলে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বৎসরের শেষভাগে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ইটালীর সহিত যোগদান করিয়া আমেরিকা অরাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জার্মানীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ সভা গঠন করিল। আমেরিকান বিশেষজ্ঞ জেনারেল ডস্ এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং এই সভা Dawes Committee নামে খ্যাত। ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসে ইহার কার্য আরম্ভ হইল। কিছুদিন পরেই ষ্ট্রেস্‌ম্যান চ্যান্‌সেলর পদ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার বহন করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সেও জনগন ইহা বুঝিতে পারিল যে, রূঢ় অধিকার একটি বিরাট ভুলস্বরূপ, এবং জার্মানীর দেউলিয়াত্ব 'ফলপ্রসূ অঙ্গীকার' (productivetguarantees)-এর নিরর্থকতা প্রমাণ করিয়াছিল। ফ্রান্সেও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে জার্মানীর ক্ষতিপূরণের টাকার প্রয়োজন আরও বেশী করিয়া দেখা দিল; কিন্তু এই টাকা আদায়ের কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। ১৯২৪ সনের ফরাসী নির্বাচনে বামপন্থীদের জয়লাভ হইল। পয়েন্‌কেয়ার মন্ত্রীসভার পতনের পর ১৯২৪ সনের ১১ই মে হ্যারিয়টের নেতৃত্বে একটি রেডিক্যাল মন্ত্রীসভা গঠিত হইল, এবং এই তারিখে যুদ্ধোত্তর কালের ইতিহাসে জোর করিয়া শান্তি স্থাপনের অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিল। কিছু কিছু ফরাসী "জোর করিয়া সন্ধির শর্ত পালন করাইবার নীতি" পরিত্যাগ করায় দুঃখবোধ করিয়াছিল। কিন্তু পরে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই নীতির অনুশীলন হইলে ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইত।

চতুর্থ অধ্যায়

ইয়োরোপের অন্যান্য ঝটিকা কেন্দ্র

(Other Storm Centres of Europe)

ফ্রান্সের ও জার্মানীর দ্বন্দ্ব লইয়া যখন সমগ্র ইউরোপ বিব্রত বোধ করিতেছিল তখন ইওরোপের অন্যত্র ভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষ আরম্ভ হইল।

দানিউবীয় রাষ্ট্রসমূহ

১৯১৪ সনের পূর্বে মধ্য দানিউবীয় অঞ্চলে, অর্থাৎ মধ্য ইয়োরোপে, বিশাল অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী রাজ্য বর্তমান ছিল। যুদ্ধের পরে এই অঞ্চলে যুগোশ্লাভিয়া, রুমানীয়া, চেকোশ্লভাকিয়া, হাঙ্গেরী এবং অষ্ট্রিয়া নামক ৫টি রাজ্যের উদ্ভব হইল। এই রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে শুল্ক-প্রাচীরের সংখ্যা বহুগুণে বাড়িয়া গেল এবং অর্থনৈতিক জীবনে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল যাহার হাত হইতে এই রাজ্যগুলি পরবর্তী যুগে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পায় নাই। ১৯২০-১৯২৪ সনের মধ্যে ফ্রান্সের সাহায্যেই যুগোশ্লভিয়া, রুমানীয়া এবং চেকোশ্লভাকিয়া এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এই কয়টি রাষ্ট্র সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে; এইস্থানে কেবলমাত্র অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রথম হইতেই অষ্ট্রিয়ার প্রজাতন্ত্র কৃত্রিম ভাববিশিষ্ট হওয়ায় ইহার চির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল। ইহার কোন জাতীয় ঐক্য ছিল না, এবং ইহার বাঁচিবার জন্য জাতীয় ইচ্ছাশক্তিরও অভাব ছিল। প্রাচীন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য জার্মান-ভাষী অধিবাসী লইয়া গঠিত ছিল। এই জার্মানরা হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় রাজাদের অনুগত প্রজা ছিল; তাহারা বিশাল অষ্ট্রিয়া রাজ্যকে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইতে দেখিয়া সুখী হইতে পারে নাই। এই নূতন প্রজাতন্ত্র দুই অংশে বিভক্ত ছিল—(১) সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লইয়া জনবহুল, মুখ্যতঃ সমাজতন্ত্রী ও ধর্মদ্বেষী রাজধানী ভিয়েনা

নগরী, এবং (২) ভিয়েনার নেতৃত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক ক্যাথলিকপন্থী পল্লীঅঞ্চল সমেত প্রাদেশিক শহরগুলি। বেসরকারী গণভোট দ্বারা অষ্ট্রিয়ার সমস্ত অধিবাসীরা বারংবার জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল তাহাই ছিল অষ্ট্রিয়ার শক্তির আধার। ইহার সাহায্যেই অষ্ট্রিয়া মিত্রশক্তিদিগকে ভয় দেখাইয়া সুবিধা আদায় করিয়া লইত। মিত্র-শক্তিবর্গ অষ্ট্রিয়ার সহিত জার্মানীর পুনর্মিলনের ঘোরতর বিরোধী ছিল বলিয়া স্বাধীন অষ্ট্রিয়াকে নানারূপ চেষ্টায় জিয়াইয়া রাখিবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিত।

প্রথমতঃ একটি আন্তর্জাতিক সাহায্য-সংস্থা অষ্ট্রিয়ার সাহায্যের জন্য গঠন করা হইল; এবং সেণ্ট জামেইন সন্ধি অনুযায়ী অষ্ট্রিয়ার সমস্ত-পরিসম্পদ ও রাজস্বের উপর হইতে অষ্ট্রিয়ান ক্ষতিপূরণ কমিশনকর্তৃক যে অর্থ আদায় করার বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং এই সকল পরিসম্পদ ও রাজস্বের উপর রিলিফবণ্ড (সাহায্যের হুণ্ডি) চালু করা হইল। ১৯১৯ হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে অষ্ট্রিয়ান সরকার 'সাহায্য-ধার' হিসাবে আড়াইকোটি টাকা পাইয়াছিল। ইহার পর মিত্রসরকারগুলি সমগ্র বিষয়টি জাতিসংঘের নিকট প্রেরণ করে এবং বৃটিশ, ফরাসী, ইটালীয়ান, চেকোস্লভাক সরকার অর্থসাহায্যের দ্বারা অষ্ট্রিয়া সরকারকে আরও কয়েকমাস জিয়াইয়া রাখিল। ইহার পর, অষ্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য, ইহার মুদ্রাব্যবস্থা স্থায়ী করিবার জন্য এবং একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কমিটি একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিল, এবং ১৯২২ সনের অক্টোবর মাসে অষ্ট্রিয়া সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই ঋণ-ব্যবস্থায় একটি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শর্তের উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা অষ্ট্রিয়া জাতিসংঘের কাউন্সিলের অনুমতি ব্যতীত তাহার স্বাধীনতা হস্তান্তর করিবে না বলিয়া সেণ্ট জার্মেইন সন্ধিতে যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা পুনরায় স্বীকার করিয়া লইল; উপরন্তু তাহার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এইরূপ শক্তির সহিত কোনরূপ অর্থনৈতিক চুক্তি করিতে পারিবে না বলিয়া অষ্ট্রিয়া আর একটি অঙ্গীকার করিল। ১৯২৩ সনের বসন্তকালে এই চুক্তির ভিত্তিতে তিনকোটি পাউণ্ডের অষ্ট্রিয়ান ঋণপত্র ১০টি দেশের জনসাধারণের নিকট ছাড়া হইল। বৃটিশ, ফরাসী, ইটালীয়ান, চেকোস্লভাক এবং কয়েকটি নিরপেক্ষ সরকার এই ঋণপত্রে আংশিকভাবে গ্যারাণ্টি দিল, এবং প্রায়

সর্ব্বত্রই এই ঋণপত্র আশাতীতভাবে ক্রীত হইল। এই সাফল্যের ফলে কয়েক বৎসরের জন্য অষ্ট্রিয়ার সমস্যার সমাধান হইল। জাতিসংঘের সৌজন্যে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রও এইরূপভাবে ঋণপত্র ছাড়িবার উৎসাহ পাইল।

অষ্ট্রিয়া অপেক্ষা হাঙ্গেরীর অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক ভাল ছিল। যদিও যুদ্ধ-পূর্ব্ব হাঙ্গেরীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং ভৌগোলিক আয়তনের অর্ধেকেরও বেশী যুদ্ধের পরে হাঙ্গেরীকে হারাইতে হইয়াছিল, তথাপি ইহা তাহার মঙ্গলকারক হইয়াছিল। কারণ যুদ্ধোত্তর হাঙ্গেরীতে ভিন্নজাতীয় কোন অসন্তোষপরায়ণ সম্প্রদায় আর ছিল না। অর্থনৈতিক দিক হইতে হাঙ্গেরী ছিল একটি সমৃদ্ধ কৃষিপ্রধান দেশ, এবং ইহার শহরবাসী জনসাধারণের সংখ্যা গ্রামবাসীর অনুপাতে খুব বেশী ছিল না। রাজনৈতিক দিক হইতে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের সকল চিহ্নই হাঙ্গেরীতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু দেশের প্রকৃত ক্ষমতা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জমিদারদের হাতে ছিল, এবং ইহারাই সৈন্য বাহিনী ও শাসনব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্ব করিত। ইয়োরোপের সমস্ত দেশের মধ্যে হাঙ্গেরীর কৃষকদের অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা শোচনীয়; তাহারা প্রায় ভূমিদাসের মতই জীবনযাপন করিত। শহরের শ্রমিকশ্রেণী ছিল ক্ষুদ্র এবং সংগঠনহীন। ১৯১৯ সনে বেলাকুন পরিচালিত সাম্যবাদী বিপ্লব ব্যর্থ হইবার পর হাঙ্গেরীতে সকলপ্রকার বিপ্লবপন্থী প্রচারকার্য্য কঠোর হস্তে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ভার্সাই সন্ধির পরে জার্মানীর ন্যায় হাঙ্গেরীও অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, এবং এই সন্ধির সংশোধনের জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিল। ত্রিয়াননের চুক্তির দ্বারা চেকোস্লভাকিয়া, রুমানীয়া ও যুগোস্লভিয়া হাঙ্গেরীর বিভিন্ন অংশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের নিকট হাঙ্গেরী আশঙ্কার কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। এবং এইজন্যই তাহারা একটি ক্ষুদ্র জোটের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু জোটবদ্ধ শক্তিত্রয় আরও একটি ভয়ে ভীত ছিল। ১৯১৮ সনের নভেম্বর মাসে হ্যাপসবার্গ বংশের শেষ রাজা চতুর্থ কার্ল সিংহাসন ত্যাগ করিলেও ইহার ফলে রাজার প্রতি হাঙ্গেরীয়ানদের সুপ্রাচীন আনুগত্য নষ্ট হইল না। হাঙ্গেরীর নূতন শাসনতন্ত্রে রাজ্যের প্রধানকে রিজেন্ট উপাধি দেওয়া হইল, এবং ইহা দ্বারা প্রাচীন রাজ-বংশের পুনপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। উপরন্তু, শ্লোভাকিয়া, ট্রান্সিলভেনিয়া এবং ক্রোশিয়ার জনগণের ও হ্যাপস্বার্গ বংশের প্রতি কিছু আনুগত্য তখনও বিদ্যমান ছিল।

সুতরাং, Little Entente-এর সরকারগুলি হ্যাপস্‌বার্গ বংশের সম্ভাব্য পুনপ্রতিষ্ঠার ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিল; কারণ ইহার ফলে ইহাদের নূতন প্রজাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল।

১৯২১ সনে কার্ল হাঙ্গেরীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দুইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হাঙ্গেরী সরকার Little Entente এর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিল না বলিয়া কার্লকে কোনরূপ সমর্থন জানায় নাই। উপরন্তু, মিত্রশক্তিবর্গের চাপে হ্যাপস্‌বার্গদিগকে হাঙ্গেরীর সিংহাসন লাভে চিরদিনের জন্য অযোগ্য বলিয়া হাঙ্গেরী সরকারকে একটি আইন পাশ করিতে হইল। ইহার পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হইল। অষ্ট্রিয়ার ন্যায় হাঙ্গেরীকেও সাহায্য দানের ব্যবস্থা হইল, এবং ১৯২৩ সনে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কমিটি পুনর্গঠনের একটি ব্যবস্থা করিল। ইহার ফলে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডের একটি হাঙ্গেরীয় ঋণপত্র ৮টি দেশের জনসাধারণের নিকট সফলতার সহিত ছাড়া হয়। অষ্ট্রিয়ার ঋণপত্রের'সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই ছিল যে ইহার পিছনে কোনরূপ আন্তর্জাতিক গ্যারাণ্টি ছিল না।

ইটালীর অবস্থা:

পাঁচটি প্রধান মিত্রশক্তির মধ্যে অন্যতম শক্তি হিসাবে ইটালীও ভার্সাই সন্ধির একজন স্রষ্টা ছিল। কিন্তু এই সন্ধি দ্বারা জাপানের মত তাহারও আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি হয় নাই। ফলে, ইটালীতে এমন অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া আন্তজাতিক ক্ষেত্রে পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হয়। এই অশান্তির কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, জার্মানীর মত ইটালীও মাত্র ১৮৭০ সনে তাহার বর্তমান রাজনৈতিক আকার লাভ করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও ইটালী অশান্ত, দুঃসাহসী যৌবনকাল অতিক্রম করে নাই, বা প্রাচীন, সুগঠিত রাষ্ট্রগুলির ন্যায় সম্মানজনক ও শান্তিকামী ঐতিহ্যের ধারক হইতে পারে নাই। যুদ্ধের সাহায্যে ইটালী একতাবদ্ধ হইয়াছিল, এবং যুদ্ধের সাহায্যেই বর্ত্তমানকালে সে তাহার শক্তি ও ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধি করিতে সংকল্প করিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যদি জাতিসংঘের অস্তিত্ব থাকিত, এবং যদি ইহার নিয়মপত্র মানিয়া চলা হইত তাহা হইলে ইটালী কখনও একটি জাতিতে পরিণত হইতে পারিত না। এই কারণে জাতিসংঘের প্রতি ইটালীর আনুগত্যে কিছুটা শিথিলতা ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইটালী যখন মিত্রপক্ষে যোগ দিয়াছিল তখন সে ইহার মূল্য স্বরূপ লণ্ডনের গোপন চুক্তিদ্বারা স্থির করিয়াছিল যে, যুদ্ধের পরে সে অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে জার্মান-অধ্যুষিত টাইরল এবং শ্লভ-অধ্যুষিত ডালমেসিয়ার সমুদ্র-উপকূল সমেত ত্রিয়েস্তে শহর ও নিকটবর্তী অঞ্চল লাভ করিল। কিন্তু ১৯১৮ সনে মিত্রশক্তিবর্গ উইলসনের যে আত্মনির্ধারণ নীতি মানিয়া লইয়াছিল এই চুক্তি তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। ফলে উইলসন লণ্ডনের এই গোপন চুক্তিটি মানিতে রাজী হইলেন না, এবং ফ্রান্স ও বৃটেন অসুবিধায় পড়িয়া গেল। শান্তি-সভায় অনেক বাগ্-বিতণ্ডার পর উইলসন দক্ষিণ টাইরল সম্বন্ধে তাহার আপত্তি উঠাইয়া লইলেন, এবং ফলে জার্মানীর ক্ষতির মাধ্যমে ইটালী লাভবান হইল ; কিন্তু যুগোশ্লভিয়ার স্বার্থ-হানি করিয়া ইটালীর হস্তে ডালমেসিয়া ও ত্রিয়েস্তে অর্পণ করিতে তিনি নারাজ হইলেন। ইহা ছাড়া, ফিউম দাবী করিয়া ইটালী মিত্রদের সহানুভূতি হারাইল। ১৯১৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এই দাবী গৃহীত না হওয়ায় ইটালীয়ান সরকারের নৈতিক সমর্থন লইয়া একটি বেসরকারী ইটালীয়ান সেনাবাহিনী ফিউম দখল করে। ১৯২০ সনের প্রথম দিকে মিত্রশক্তিবর্গ ইটালী ও যুগোশ্লভিয়ার বিবাদ পরস্পর মিটাইয়া লইতে বলে। কয়েক বৎসর ধরিয়া দুই দলে আলোচনা চলিতে থাকে, এবং ফ্রান্স এই বিবাদে যুগোশ্লভিয়াকে সমর্থন জানাইবার ফলে ইটালীর বিদ্বেষের পাত্র হয়। ১৯২৪ সনে বিবাদের মীমাংসা হয়। জারা বন্দরটি ব্যতীত সমগ্র ডালমেসিয়া উপকূলের দাবী ইটালী যুগোশ্লভিয়াকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু অন্যত্র লণ্ডন চুক্তির শর্ত অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক শর্ত লাভ করে এবং ফিউম তাহার অধিকারে আসে।

ইতিমধ্যে ইটালী ও যুগোশ্লোভিয়া আলবেনিয়ায় শত্রুতার আর একটি সূত্র বাহির করে। লণ্ডনের সন্ধি অনুযায়ী স্থির হইয়াছিল যে, ইটালী ভ্যালোনা বন্দর লাভ করিবে এবং আলবেনিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের পরিচালনার ভার পাইবে। ফলে, যুদ্ধের শেষে ইটালীয়ান সৈন্যরা সমগ্র আলবেনিয়া অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু এই দেশ ও যুগোশ্লোভিয়া বাদ সাধিল। ১৯২০ সনে ইটালীয়ান সৈন্য ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়, এবং আলবেনিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জাতিসংঘের সভ্যপদ লাভ করে। লণ্ডন সন্ধিঅনুযায়ী প্রাপ্ত অধিকারগুলি ত্যাগ করিবার বিনিময়ে ইটালী

আল্‌বেনিয়ার ব্যাপারের তাহার একটি 'বিশেষস্থানের' দাবী জানাইল। ১৯২১ খৃঃ অব্দে নভেম্বর মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রদূতদের সভায় (মিত্র পক্ষীয় সরকারগুলির প্রধান মুখপাত্র সুপ্রীম কাউন্সিলের উত্তরাধিকারী ছিল এই সভা) স্থির করা হইল যে, আল্‌বেনিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইলে বৃটিশ, ফরাসী এবং জাপানী সরকারগুলি জাতিসংঘের কাউন্সিলে তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে এই মর্মে উপদেশ দিবে যে তাহারা যেন এই স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব ইটালীর হস্তে ন্যস্ত করে। বস্তুতঃ, অদূরভবিষ্যতে এই প্রস্তাব কার্য্যকারী হইবার সম্ভাবনা ছিল না; এবং আল্‌বেনিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার মত সম্ভাব্য শক্তি ছিল একমাত্র ইটালীই। ঐ সভার এই সিদ্ধান্ত ইটালী এইরূপ ব্যাখ্যা করিল যে, আল্‌বেনিয়ার ব্যাপারে একমাত্র ইটালীরই হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকিবে। ইহার ফলে যুগোশ্লভিয়া বিরক্ত ও সন্ত্রস্ত বোধ করিল।

লণ্ডন সন্ধির আর একটি ধারায় উল্লেখ ছিল যে, আফ্রিকাতে জার্মান স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স যদি তাহাদের নিজেদের উপনিবেশ বৃদ্ধি করে তবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইটালীর আফ্রিকাস্থ উপনিবেশগুলির সহিত সন্নিকটবর্ত্তী বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশগুলির সীমারেখা ইটালীর পক্ষে সুবিধাজনক ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। এই ধারানুযায়ী ১৯২৪ সনে ইটালী ও বৃটেনের মধ্যে একটি মীমাংসা হয়। ইহার ফলে বৃটেন যুবাল্যাণ্ড নামক অঞ্চল ইটালীকে দান করে। কিন্তু, ১৯১৯ সনে উত্তর আফ্রিকায় সীমান্ত রেখার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও ইটালী সন্তুষ্ট হইল না, এবং ১৯৩৫ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে এই ব্যপার লইয়া মনোমালিন্য চলিতে লাগিল।

যখন যুগোশ্লভ-ইটালী সীমান্ত নির্ধারিত ছিল না তখন ১৯২২ সনের অক্টোবর মাসে ইটালীর শাসনব্যাপারে এক বিরাট পরিবর্ত্তন আসে। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে অসমর্থ হওয়ার জন্য ইটালীর গণতান্ত্রিক সরকার জনপ্রিয়তা হারায় এবং ফ্যাসিস্ট পার্টি কর্ত্তৃক গদিচ্যুত হয়। ফলে, পরবর্ত্তী ২০ বৎসরের জন্য ইটালীতে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইহার প্রভাব সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল। ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রে, ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমে স্পেনে, একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হইল, এবং মুসোলিনীর অভ্যুত্থানের

ফলে ইটালীর বৈদেশিক নীতি আরও আক্রমণাত্মক হইল। শীঘ্রই ইউরোপ মুসোলিনীর পরিচয় পাইল।

১৯২৩ সনের আগষ্টমাসে আলবেনিয়া ও গ্রীকসীমান্ত নির্ধারণকারী কমিশনের ইটালীয় প্রতিনিধি তাঁহার তিনজন সহকারী সমেত গ্রীক দস্যুদের হস্তে নিহত হন। ইহার ফলে ইটালীয় নৌবহর কর্ফু আক্রমণ করিয়া কয়েক-জন বেসরকারী ব্যক্তিকে নিহত করে, দ্বীপটি অধিকার করিয়া লয়, ও ক্ষতি-পূরণের দাবী করে; এবং এই দাবী প্যারিসের রাষ্ট্রদূতদের সভা সমর্থন করে। ভেনিজেলসের পতনের পর হইতে গ্রীস ইউরোপে বন্ধুশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সে সন্ত্রস্ত হইয়া জাতিসংঘ ও রাষ্ট্রদূতদের সভার নিকট আবেদন পাঠাইল। মুসোলিনী জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ মানিয়া লইতে আপত্তি জানাইল। বেসরকারী আলোচনার ফলে এই মর্মে একটি মীমাংসা হইল যে, ইটালীর দাবীর সত্যতা আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত হইবার পূর্ব্বেই গ্রীস হেগে অবস্থিত এই বিচারালয়ের নিকট পাঁচকোটী লীরা জমা রাখিবে। শেষ মুহূর্ত্তে ইটালীয় সরকার এই মীমাংসা মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হয় এবং গ্রীস রাষ্ট্রদূতদের সভার চাপে সরাসরি ইটালীকে ক্ষতিপূরণ দান করিতে বাধ্য হয়। এই সকল ব্যাপারের মর্ম এইরূপ বুঝা গেল যে, একটি ক্ষুদ্র শক্তির রক্ষাকল্পে মিত্র পক্ষীয় সরকারগুলি জাতিসংঘের মাধ্যমে অথবা অন্য প্রকারে তাহাদের নিজেদের কাহারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত ছিল না।

রাশিয়া ঃ

যুদ্ধোত্তরকালে ইউরোপীয় রাজনীতিতে শান্তিভঙ্গকারী উপাদানগুলির মধ্যে রাশিয়া অন্যতম ছিল। ১৯২৩ সন হইতে রাশিয়া সরকারীভাবে 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোসালিষ্ট রিপাব্লিকস্' নামে পরিচিত হয়। ১৯২০ সনে রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে, এবং বৃটিশ, ফরাসী, জাপানী ও আমেরিকান সরকারগুলি কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত সোভিয়েট-শত্রুরা পরাজিত হইল। ইহার ফলে স্বভাবতঃই সোভিয়েট সরকারের সহিত মিত্রশক্তিবর্গের শত্রুতা অনেকদিন ধরিয়া চলিতে থাকিল। শান্তির সময় এক রাষ্ট্র অন্যরাষ্ট্রের প্রজাদিগের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়া ঐ রাষ্ট্রের রক্ষা ব্যবস্থা শিথিল করিতে চেষ্টা করিলে তাহা আধুনিক যুগে অন্যায়রূপে ধরিয়া লওয়া হয়, যদিও

যুদ্ধের সময় ইহা অন্যায়রূপে গণ্য না হইতেও পারে। সোভিয়েট-নীতি এই সাধারণ আন্তর্জাতিক নিয়ম মানিয়া লইতে রাজী হইল না। প্রত্যেক খাঁটি সাম্যবাদী ব্যক্তির নীতি হইল সমগ্র বিশ্বে বিপ্লবের সৃষ্টি করা, এবং সোভিয়েট নেতারা মনে করিতেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের বিলোপ সাধন না করিতে পারিলে সোভিয়েটের বিপ্লবী সরকার স্থায়ী হইতে পারিবে না। "কমিউনিষ্ট ইণ্টারনেশনাল" বা সংক্ষেপে কোমিণ্টার্ন ইহার সদর দপ্তর মস্কো হইতে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত স্থানীয় শাখাগুলিকে সর্ব্বদাই মন্ত্রণা দিত ঐ সকল দেশের ধনতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদের জন্য, এবং এই কোমিণ্টার্নের পরিচালক ছিলেন সোভিয়েট সরকারের কর্ণধারগণ যাঁহারা আবার ঐ সকল রাষ্ট্রের সহিত স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতেও ইচ্ছুক ছিলেন। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের এই দ্বিমুখী নীতি অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ স্থাপনে বাধাস্বরূপ হইয়াছিল।

প্রথমদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ইহার ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের সহিত সরকারীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে। যে সকল রাজ্য রাশিয়ান সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। ১৯২০ সনে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ফিন্‌ল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাট্‌ভিয়া এবং লিথুনিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে, এবং পরবৎসর পোল্যাণ্ডের সহিতও সন্ধিস্থাপন করে। জর্জিয়া, আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া নামক ককেশিয়ান রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে একমাত্র জর্জিয়াই যুদ্ধের শেষ বৎসরে মিত্রসৈন্যদের সাহায্যে আংশিকভাবে স্বাধীন হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রসৈন্যের অপসরণের পর এই অঞ্চলগুলি পুনরায় রাশিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে মিলিত হইল। ১৯২১ সনের প্রথমভাগে সোভিয়েট ইউনিয়ন তুরস্ক, পারস্য এবং আফ্‌গানিস্থানের সহিত সন্ধিস্থাপন করিল। এই সন্ধির ফলে পারস্য ও আফ্‌গানিস্থান বৃটিশ প্রভাবের চাপকে প্রতিরোধ করিতে উৎসাহিত বোধ করিল, এবং এশিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে ইঙ্গ-রাশিয়ান প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা দেখা দিল।

তখন পর্যন্তও বৃহৎশক্তিগুলি রাশিয়ার সহিত সরকারী সম্পর্ক স্থাপনে বিমুখ ছিল। কিন্তু রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যের সম্ভাবনা কেহই অবহেলা করিতে পারিল না। ১৯২১ সনে, বৃটেন রাশিয়ার সহিত একটি বাণিজ্যচুক্তি

সম্পাদন করে এবং মস্কোতে একটি 'বাণিজ্য মিশন' প্রেরণ করে। ইটালীও এই উদাহরণ গ্রহণ করে ; এবং পরবৎসর এপ্রিল মাসে জেনোয়ায় অনুষ্ঠিত একটি সর্ব-ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমন্ত্রিত হয়। যদিও এই সভার মাধ্যমে লয়েড্ জর্জ সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য শক্তিগুলির মধ্যে একটি মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসী ও বেল্‌জিয়ান প্রতিনিধিগণ অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট রাশিয়ার যুদ্ধপূর্বকালীন যে ঋণ ছিল তাহার স্বীকৃতি না হইলে এইরূপ মীমাংসায় রাজী হইলেন না। এই সম্মেলনের এক সপ্তাহকাল পরে জার্মান ও সোভিয়েট প্রতিনিধিদের মধ্যে রাপালো নামক স্থানে একটি মৈত্রী চুক্তি হয়। এই সন্ধির ফলে জার্মানীর ন্যায় একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের নিকট হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারী স্বীকৃতি লাভ করিল, এবং জার্মানীও তাহার চারিধারে মিত্রশক্তিবর্গ যে বেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ভেদ করিবার এই সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করিল। ইহাতে মিত্রশক্তিবর্গ উষ্মা প্রকাশ করিল। অবশ্য, জার্মানী ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিম্নশ্রেণীর শক্তিরূপে গণ্য করার জন্যই তাহারা উভয়ে হাত মিলাইয়াছিল এবং দশ বৎসরেরও অধিককাল তাহাদের মিত্রতা স্থায়ী হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি বৃটেনের নীতি বৃটেনের দলীয় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ও ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। জেনোয়া সম্মেলনের অল্পদিন পরেই বলশেভিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের অপরাধে লয়েড জর্জের মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং নূতন 'কন্‌জারভেটিভ' সরকার একটি শক্ত নীতি অবলম্বন করে। আবার ১৯২৪ সনে 'লেবার' সরকার সোভিয়েট সরকারকে সরকারী স্বীকৃতি দান করে। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে সোভিয়েট ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে চুক্তির ফলে স্থির হয় যে, উভয় পক্ষের দাবী-দাওয়া নাকচ করা হইল এবং সোভিয়েট সরকারকে একটি গ্যারাণ্টীযুক্ত ঋণ দেওয়া হইবে। এদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি লেবার দলের দৃষ্টিভঙ্গীকে কেন্দ্র করিয়াই কন্‌জারভেটিভদল লেবার দলের প্রতি বিরোধিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। ১৯২১ সনের বাণিজ্য চুক্তির একটি ধারা অনুযায়ী সোভিয়েট সরকার বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল স্থানে বিপ্লবপন্থী প্রচার কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। কন্‌জারভেটিভ সরকার ও লেবার সরকার উভয়েই সোভিয়েট সরকার ও কোমিনটার্নকে দুইটি পৃথক সত্ত্বা হিসাবে দেখিত না এবং কোমিন্‌টার্নের

কার্য্যাবলীর দ্বারা ঐ চুক্তি লঙ্ঘিত হইবে না বলিয়া সোভিয়েট সরকারের যুক্তিকেও তাহারা মানিতে রাজী ছিল না। ১৯২৪ সনের অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে, একটি 'কনজারভেটিভ' সংবাদ পত্রে কোমিন্‌টার্নের সভাপতি জিনোভিয়েভ কর্তৃক বৃটেনে সাম্যবাদী প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য বৃটিশ কম্যুনিষ্টদিগকে প্রদত্ত উপদেশাবলী-সম্বলিত একটি পত্র প্রকাশিত হয়। যদিও সোভিয়েট সরকার এই পত্রের সত্যতা অস্বীকার করে, তথাপি বৃটেনের বহুলোক ইহা বিশ্বাস করে এবং নির্বাচনে কনজারভেটিভ দল জয়ী হয়। ফলে, বৃটেনের সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক আবার তিক্ত হইল; যদিও সরকারীভাবে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে নাই।

বৃটেনের নীতি অনুসরণ করিয়া ইটালী, ফ্রান্স, জাপান এবং অধিকাংশ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেয়। বৃহৎশক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অস্বীকৃত হয়। এদিকে ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসে লেনিনের মৃত্যুর পর হইতে রাশিয়ার সাম্যবাদীদলের কার্যপ্রণালীতে বিশ্ব-বিপ্লবের নীতিকে আর পূর্বের মত প্রাধান্য দেওয়া হইল না, এবং রাশিয়ার সর্বত্রই 'জিনোভিয়েভ-পত্রের' সত্যতা অস্বীকার করিবার একটি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু, এই সময়ে ট্রট্স্কির বিশ্ব-বিপ্লব' নীতি ও ষ্ট্যালিনের একটি রাষ্ট্রে সমাজবাদ গঠনের নীতিরে মধ্যে সংঘর্য আরম্ভ হয়। ১৯২৭ সনে ট্রট্স্কিকে সাম্যবাদী দল হইতে বহিষ্কৃত করা হইলে ·বিশ্ব-বিপ্লবের নীতিই কেবলমাত্র পরিত্যক্ত হইল না, এই নীতি যে ভবিষ্যতে সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধাস্বরূপ হইবে না তাহাও স্পষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে সোভিয়েট ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের মূল ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া লইল।

পঞ্চম অধ্যায়

শান্তির ভিত্তি

১৯২৪ সন হইতে ১৯৩০ সন পর্যন্ত যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের স্বর্ণযুগ রূপে বর্ণনা করা যায়। কারণ, এই সময়ে ক্ষতিপূরণ ও ফরাসী-রক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধীয় সমস্যা দুইটির সমাধানের ফলে সর্বত্রই একটি শান্তির আলোক প্রস্ফুটিত হইল।

ডস্ পরিকল্পনা (Dawes Plan)

১৯২৪ সনের ১১ই মে ডস্ কমিটি ক্ষতিপূরণ কমিশনের নিকট ইহার পরিকল্পনা প্রকাশ করে। ফ্রান্সের নূতন প্রাধান মন্ত্রী হেরিয়ট, জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী ষ্ট্রেস্‌ম্যান এবং বৃটেনের শ্রমিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ ডস্ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন।

১৯২৩ সনের শেষভাগে জার্মান মার্ক কার্য্যতঃ একেবারে মূল্যহীন হইয়া পড়িল। এই সময়ে জার্মান সরকার পূর্বের ২০ মার্ক : : ১ পাউণ্ড হারে রেণ্টেন্‌মার্ক নামক একটি নূতন জার্মান মুদ্রা সাময়িকভাবে চালু করে। কিন্তু স্বর্ণ অথবা বিদেশী সম্পত্তির পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে রেণ্টেনমার্কের অবস্থা সঙ্গীন ছিল। ডস্ কমিটি ঐ একই সমানুপাতিক মূল্যের ভিত্তিতে রাইকমার্ক (reichmark) নামে একটি নূতন মুদ্রা চালু করিবার সুপারিশ করে এবং স্থির হয় যে জার্মান সরকারের কর্ত্তৃত্ব-মুক্ত, মুদ্রাচালুকারী একটি ব্যাঙ্ক এই রাইক্‌মার্কের নিয়ন্ত্রক হইবে।

একটি স্থায়ী মুদ্রা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে এইরূপ অনুমান করিয়া এই কমিটি স্থির করিল যে, ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মানী বাৎসরিক পাঁচকোটি পাউণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম বৎসর হইতে বাৎসরিক সাড়ে বার কোটি পাউণ্ড পর্যন্ত মিত্রশক্তিবর্গকে দিতে পারিবে। এই সকল দেয় অর্থের জামীনরূপে থাকিবেঃ (১) সরকারী রেলপথসমূহ, (২) জার্মান শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি, এবং (৩) শুল্ক ও মদ, চিনি এবং চায়ের উপর সংগৃহীত আয়ের

তিন শ্রেণীর হুণ্ডি। যাহাতে এই সকল লেনদেনের ফলে মুদ্রাবিনিময় ব্যবস্থায় পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা না দিতে পারে সেই জন্য স্থির হইল যে, জার্মানী মার্কের সাহায্যে এই অর্থ প্রদান করিবে, এবং বিদেশী মুদ্রায় এই সকল অর্থের বিনিময় করার ভার থাকিবে মিত্রপক্ষীয় সরকারগুলির। উত্তমর্ণদের স্বার্থানুযায়ী যাহাতে এই ব্যবস্থা ভালরূপে চলিতে পারে সেইজন্য স্থির হইল যে, ক্ষতিপূরণ কমিশন মুদ্রাচালুকারী ব্যাঙ্কটির, রেলপথের শাসন-ব্যবস্থার, এবং নিয়ন্ত্রিত সরকারী আয়সমূহের (controlled revenues) পরিচালনা সভায় মিত্রপক্ষীয় কমিশনারগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবে; এবং সমস্ত পরিকল্পনাটি দেখাশুনা করিবার জন্য "ক্ষতিপূরণ প্রদানের এজেণ্ট" নামক একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হইবে। এই ব্যবস্থার কৃতকার্যতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল—(১) রূঢ়—অধিকার পরিত্যাগ করা ও সমগ্র জার্মানীর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব জার্মান সরকারের হস্তে অর্পণ করা, এবং (২) মুদ্রা-সঞ্চয়ের (currency reserve) জন্য ও প্রথম বৎসরের দেয় অর্থ—প্রদানে সাহায্য করিবার জন্য জার্মানীকে ৪ কোটী পাউণ্ডের একটি বিদেশী ঋণ দান করা।

আগষ্টমাসে লণ্ডনে একটি সম্মেলনে "ডস্ পরিকল্পনাটি" গৃহীত হয়; জার্মানদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ইচ্ছা করিয়া বড় রকমের বাকী না ফেলিলে জার্মানীর বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না। অক্টোবর মাসে জার্মান ঋণপত্রছাড়া হয় এবং শীঘ্রই ইহা নিঃশেষিত হয়। যদিও জাতিসংঘের কর্তৃত্বাধীন এই ঋণ ব্যবস্থা চালুকরা হয় নাই, তথাপি ইহার কৃতকার্যতার জন্য অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের নজীর অনেকাংশে দায়ী। নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে রূঢ় অঞ্চল হইতে ফরাসী এবং বেলজিয়ান সৈন্যদের শেষ দল অপসারিত করা হয়।

ডস্ পরিকল্পনার অনেকগুলি ভাল দিক্ আছে। (১) যদিও ফরাসীদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিশেষজ্ঞরা কিছুটা আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছিলেন তথাপি মোটামুটিভাবে সুবিধাজনক পরিবেশে জার্মানীর পক্ষে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া সম্ভব ছিল ডস্ কমিটি ইহার বেশী দাবী করে নাই। (২) ইহা অর্থপ্রদান ব্যাপারটি হস্তান্তরকরণ বিষয়টি (transfer) হইতে আলাদা করে, এবং পরের বিষয়টি উত্তমর্ণদের বিবেচ্য বিষয়রূপে রাখা হয়।

(৩) জার্মানীর সম্পত্তির উপর অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট দায় চাপাইবার পরিবর্তে উত্তমর্ণদিগের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট আয়ের উপর জামীনের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। (৪) ক্ষতিপূরণ সমস্যাকে রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডার ঊর্ধ্বে রাখা হইয়াছিল এবং ইহাকে একটি সাধারণ বাণিজ্যিক ঋণের ন্যায় দেখা হইয়াছিল। অসুবিধাজনক ক্ষতিপূরণ-কমিশনের হাত হইতে সমগ্র সমস্যাটি সরাইয়া লওয়া হয় এবং ইহাকে একটি পক্ষপাতহীন, অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিবার ব্যবস্থা হয়,এবং একজন আমেরিকান নাগরিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের এজেন্টরূপে নিযুক্ত করা হয়। ডস্ পরিকল্পনার কতগুলি বড় রকমের ত্রুটিও ছিল। (১) ইহা বাৎসরিক অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করে, কিন্তু কত বৎসর যাবৎ এই ব্যবস্থা চালু থাকিবে, অথবা জার্মানীর মোট দেনা কত তাহা নির্ধারণ করে নাই; কারণ এই সময়ে কোন ফরাসী সরকারই ৬৬০ কোটি পাউণ্ডের ক্ষতিপূরণের একটি ক্ষুদ্র অংশও ছাড়িয়া দিতে সাহসী ছিল না। সুতরাং জার্মানী আগের মতই নৈরাশ্যকর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দিন গুণিতেছিল। যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নতিতে কেবল মাত্র দায়ই বৃদ্ধি পাইবে, সেই হেতু অর্থ-সঞ্চয়ের কোনরূপ ইচ্ছা জার্মানদের মনে স্থান পাইল না (২) আরও বড় ত্রুটি ছিল এই যে, জার্মানীকে তাহার সর্বস্ব দান করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা শোধ করিতে হইয়াছিল।

ডস্ ঋণের সাফল্যে আশান্বিত হইয়া পরবর্তী পাঁচ বৎসরে বড় বড় জার্মান মিউনিসিপালিটি এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যুক্তরাষ্ট্রে ও আংশিকভাবে গ্রেটবৃটেনে প্রচুর ঋণ ও credit সংগ্রহ করিল। প্রভূত ধনাগমের ফলে জার্মানীর সর্বত্র এমন সমৃদ্ধির সৃষ্টি হইল যে জার্মানী বিশেষ কষ্ট ব্যতিরেকেই দেয় বাৎসরিক টাকাগুলি দিতে পারিল এবং প্রচুর বিদেশী মুদ্রা হস্তগত হওয়ার ফলে হস্তান্তরকরণ সমস্যার সমাধান করিতে পারিল। এই সময়ে সকলের চক্ষে ডস্ পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ সফলরূপে প্রতিভাত হইল। খুব কম লোকই তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, জার্মানী আমেরিকার অর্থ দ্বারা তাহার ঋণ শোধ করিতেছিল এবং আমেরিকায় জার্মাণ ঋণের জনপ্রিয়তার উপরেই জার্মানীর স্বচ্ছলতা নির্ভরশীল ছিল।

আন্তর্মিত্র ঋণ (Inter-Allied Debts)

অন্য একশ্রেণীর আর্থিক দায় ক্ষতিপূরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত হইয়া

পড়িয়াছিল, এবং কালক্রমে ইহার মত একই পরিণতি লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে গ্রেট বৃটেন ইউরোপীয় মিত্ররাষ্ট্র গুলিকে অনেক টাকা ধার দিয়াছিল এবং সে নিজে ইহার অর্ধেকেরও বেশী টাকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে কর্জ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, মিত্ররাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতেও ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। ক্ষতিপূরণ সমস্যার ন্যায় এই ঋণগুলির জটিলতাও দূরপনেয় ছিল। আন্তর্মিত্রপক্ষীয় ঋণের ব্যাপারে আমেরিকাই ছিল একমাত্র উত্তমর্ণ, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ছিল একমাত্র অধমর্ণ (অবশ্য অল্প পরিমাণ অর্থের জন্য ফ্রান্সও উত্তমর্ণ ছিল), এবং বৃটেন আংশিকভাবে উত্তমর্ণ, আবার আংশিক ভাবে অধমর্ণ ছিল।

১৯২২ সনে যখন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঋণশোধের জন্য বিশেষভাবে চাপ দিতে লাগিল, তখন ফ্রান্স জানাইল যে, জার্মানী তাহাকে ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান করিলে সে আমেরিকাকে তাহার ঋণের টাকা দিতে পারিবে ; কারণ, পরাজিত জার্মানী ঋণশোধ করিবে না অথচ বিজয়ী ফ্রান্সকে তাহার ঋণশোধ করিতে হইবে—ফ্রান্সের নিকট ইহা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ঋণদান ও ঋণ গ্রহণের ভারসাম্যে স্থিত গ্রেটবৃটেন সকল যুদ্ধ-ঋণ মকুব করিতে ইচ্ছুক ছিল। ১৯২২ সনের আগষ্ট মাসে সে তাহার ইউরোপীয় মিত্রদের 'Balfour Note' নামক পত্রে জানাইল যে, যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধের জন্য তাহার যতটাকা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে মিত্রদের নিকট পাওনা টাকার মধ্যে ততটাকাই সে দাবী করিবে। ঋণ আদায়ের সমস্ত তিক্ততা এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্কন্ধে চাপাইবার এইরূপ চতুর চেষ্টার ফলে আমেরিকায় ঋণ-মকুবের বিরুদ্ধে অধিকতর বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইল।

আমেরিকার এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বৃটিশ সরকার তাহার দায় শোধ করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতে পাইল না। ১৯২২ সনের ডিসেম্বর মাসে একটি চুক্তির ফলে স্থির হয় যে, তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড (সুদ সমেত) বৃটিশ ঋণ ৬২টি বাৎসরিক কিস্তিতে যুক্তরাষ্ট্রকে পরিশোধ করা হইবে। অপর পক্ষে ১৯২৬ সন পর্যন্ত মিত্রদের নিকট হইতে বৃটেন কিছুই পায় নাই। অবশ্য, 'ডস্' ব্যবস্থা চালু হইবার পর ইঙ্গ-আমেরিকান চুক্তির ন্যায় কতগুলি চুক্তি দ্বারা স্থির হইল যে, ফ্রান্স, ইটালী, রুমানীয়া, যুগোশ্লভিয়া, গ্রীস এবং পর্তুগাল বাৎসরিক কিস্তিতে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রকে তাহাদের ঋণের টাকা পরিশোধ করিবে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইঙ্গ-আমেরিকান

ঋণ-পরিশোধের চুক্তিতে মূল বৃটিশ ঋণের প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অপর পক্ষে বৃটেন ইটালীর মূল ঋণ হইতে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী এবং অন্যান্য মিত্রদের মূলঋণের শতকরা ৬০ ভাগের বেশী অর্থ মকুব করিয়াছিল। উপরন্তু, মিত্রদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ ও ক্ষতিপূরণ খাতে প্রাপ্ত অর্থ যোগ করিলেও মোট টাকার সংখ্যা বৃটেন কর্তৃক আমেরিকাকে প্রদত্ত অর্থ অপেক্ষা কম ছিল। সুতরাং, ফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, যেখানে যত ঋণের টাকাই লেনদেন হউক না কেন এই সমস্ত অর্থই আমেরিকার অর্থকোষে জমা হইল।

'ডস্ পরিকল্পনার হস্তান্তর করণের' ন্যায় ঋণ-পরিশোধ চুক্তিঅনুযায়ী বিপুল অর্থের এই লেনদেন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অধমর্ণদিগকে ঋণ কর্জ দেওয়ার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীতে জাতিসংঘ যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিল তাহা চালু রাখা হইল। ১৯২৪ সন হইতে ১৯২৮ সনের মধ্যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গ্রীস, বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া এবং ডেনাজগ ঋণপত্র ছাড়ে, এবং ইহার বেশীর ভাগই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ক্রীত হয়। জার্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে প্রদত্ত আমেরিকান ক্রেডিটের (Credit) ফলে যে কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ও যুদ্ধ ঋণ পরিশোধের জটিল কাঠামো দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল তাহা নহে, ইহার ফলে ইউরোপে সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতার সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সদ্‌ভাবের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে এই সমৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজনও ছিল।

জেনেভা প্রোটোকোল (জেনেভা খসড়া)—Geneva Protocol

১৯২৪ সনের আগষ্ট মাসে, ডস্ পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পর পরবর্তী মাসে ম্যাগডোনাল্ড্ ও হ্যারিয়ট জেনেভার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯২১ সনে জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা লইয়া কাজ আরম্ভ করে, এবং ১৯২২ সনে ফরাসী সরকার এই মত প্রকাশ করে যে, ফ্রান্সের রক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইলেই ফ্রান্স তাহার সমরোপকরণের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের মিত্রগণের রক্ষা ব্যবস্থাও ফ্রান্সের নিজস্ব রক্ষা-ব্যবস্থার অংশরূপে ফ্রান্স মনে করিত। সুতরাং, ফ্রান্সের দাবী ছিল তাহার নিজের ও তাহার মিত্রদের জন্য আরও অধিক নিরাপত্তার একটি সামগ্রিক অঙ্গীকার আদায় করা, নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধেও জেনেভা আলোচনা এইরূপ একটি অঙ্গীকার দাবী করিবার উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করিল। এই

দাবী গৃহীত হইলে ফরাসী নীতি সফল হইত, কিন্তু গৃহীত না হইলে ফ্রান্স ও তাহার মিত্রগণ নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব স্বীকার করিত না।

জেনেভায় অবস্থিত বৃটিশ প্রতিনিধিদল ইহাতে মৌনসম্মতি জানাইল। ১৯২৩ সনে অস্থায়ী মিশ্রকমিশন (নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্ন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য গঠিত) "পারস্পরিক সাহায্যের সন্ধি"-র একটি খসড়া পরিষদের নিকট পেশ করিল। ইহাতে ভবিষ্যৎ নিরস্ত্রীকরণের কতগুলি অস্পষ্ট ব্যবস্থার এবং বর্তমান নিরাপত্তার জন্য কয়েকটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট অঙ্গীকারের উল্লেখ ছিল। উল্লিখিত ছিল যে, কোনস্থানে আক্রমণ হইলে ৪ দিনের মধ্যেই জাতিসংঘের কাউন্সিল আক্রমণকারী কে ইহা স্থির করিবে, এবং তখন জাতিসংঘের সভ্যগণকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে স্বাভাবিক সাহায্য প্রদান করিবার দায়িত্ব লইতে হইবে। ইহার ফলে জাতিসংঘের নিয়মপত্রের ১৬নং ধারার উদ্দেশ্য পরিবর্ধিত হয়, এবং এই ধারানুযায়ী সামরিক সাহায্যদানকে স্বাভাবিক ও বাধ্যতামূলক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ১৯২৩ সনের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে বৃহৎ শক্তিগুলির দায়িত্বশীল মন্ত্রীগণ উপস্থিত না থাকার ফলে এই পরিষদ কোনরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া এই খসড়াটি বিভিন্ন সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করে। যদিও ফ্রান্স, তাহার প্রায় সকল মিত্ররাষ্ট্র ও পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ইহা গ্রহণ করিয়াছিল, বৃটেন, বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলি, স্কেণ্ডিনেভিয়ার রাষ্ট্রগুলি এবং হল্যাণ্ড ইহা গ্রহণ করিতে আপত্তি করিল। কিন্তু পরবৎসর ম্যাগডোনাল্ড ও হ্যারিয়ট পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিলে অবস্থার এরূপ উন্নতি ঘটে যে, এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯২৪ সনের জাতিসংঘ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে জেনেভা প্রোটোকোল নামে একটি চুক্তির খসড়া রচনা করে, এবং ইহা বিভিন্ন সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। ইহার সম্পূর্ণ নাম ছিল "আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার খসড়া"।

এই খসড়ার প্রধান অভিনবত্ব ছিল এই যে, ইহা জাতিসংঘের নিয়মপত্রের উন্নতি সাধন করিয়াছিল এবং সালিশ গ্রহণের বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে অধিকতর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যখন কোন বিবাদে কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবে, বা কোন বিবাদের বিষয় বস্তু কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া কাউন্সিল

মত প্রকাশ করিবে তখন যুদ্ধ বন্ধ করা যাইবে না বলিয়া নিয়মপত্রে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই খসড়া এই ত্রুটি দুইটি দূর করিবার চেষ্টা করে। স্থির করা হয় যে, আইনসংক্রান্ত সকল বিবাদ স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই আদালতের রায় বাধ্যতামূলকভাবে মানিয়া লইতে হইবে। অন্যান্য বিবাদে নিয়মপত্রের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। কিন্তু, কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ হইলে সেই বিবাদ সালিশদের একটি সভার নিকট কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরিত হইবে, এবং এই সভার রায় বাধ্যতামূলকভাবে মানিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয় ত্রুটি সম্বন্ধে স্থির করা হইল যে, কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে মিটাইয়া ফেলিবার জন্য ১১নং ধারানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, এবং এই ধারানুযায়ী যদি কোন রাষ্ট্র এই জাতীয় বিবাদ জাতিসংঘের নিকট আনয়ন করে তবে তাহাকে আক্রমণকারী বলিয়া গণ্য করা হইবে না। সর্বশেষে, নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য এই খসড়ায় প্রস্তাব করা হইল যে, যদি যথেষ্টসংখ্যক রাষ্ট্র ইহার অনুমোদন করিয়া লয় তবে ১৯২৫ সনের ১৫ই জুন নিরস্ত্রীকরণ সভার অধিবেশন বসিবে।

নিয়ম পত্রের ১৬ নং ধারাঅনুযায়ী জাতিসংঘের কাউন্সিলের ক্ষমতাবৃদ্ধি করিতে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে জেনেভা খসড়া কোনরূপ চেষ্টা করে নাই; এবং সেইজন্য "পারস্পরিক সাহায্যের সন্ধি"-র ন্যায় ইহা ফরাসী দাবী পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় নাই। পয়েন্‌কেয়ার মন্ত্রীসভার পতনের পর ১৯২৪ সনে ফরাসী নীতি যে কিছুটা নরমপন্থী হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ফরাসী সরকার কর্তৃক এই খসড়া অনুমোদনের মধ্যে। ১৯১৯ সনের শান্তি-ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া ইহার আঞ্চলিক ব্যবস্থা, চালু রাখিয়া এই খসড়া ফ্রান্স ও তাহার মিত্রবর্গের একটি বড় স্বার্থ রক্ষা করিয়াছিল। কোন সন্ধির শর্তের পরিবর্ত্তনের দাবীকে বিবাদ বলিয়া গণ্য করা যাইবে না এবং ইহার সম্বন্ধে প্রোটোকোলে উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না বলিয়া প্রোটোকোল-রচনাকারী সভার বিবরণীতে জোরের সহিত স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, ১৯১৯ সালের শান্তিব্যবস্থা বজায় রাখার সহিত নিরাপত্তাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রহণ করিবার এবং এই শান্তিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে কোনরূপ উপযুক্ত উপায়

নির্ধারণ না করিবার যে প্রবৃত্তি নিয়মপত্রে দেখা যায় (ইহার জন্য পরে নিয়ম পত্র নিন্দিত ও সমালোচিত হইয়াছিল) তাহা প্রোটোকোলেও সমর্থন লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৪ সনে এই সমালোচনার বিশেষ কোনরূপ অস্তিত্বই ছিল না। জার্মানী তখনও জাতিসংঘের সভ্যপদ লাভ করে নাই। ভূতপূর্ব্ব ক্ষুদ্র শত্রু রাষ্ট্রগুলির আক্রমণ করা অপেক্ষা আক্রান্ত হওয়ার ভয় ছিল বেশী, সুতরাং তাহারা সানন্দে প্রোটোকোলে স্বাক্ষর দিল।

পরিষদের অধিবেশনের সমাপ্তি পর্য্যন্ত চারিদিকে উৎসাহের প্রকাশ দেখা গেল। কিন্তু শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল। নিয়মপত্রের ১১নং ধারা অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত বিবাদ জাতিসংঘের নিকট আনয়ন করা যাইতে পারে বলিয়া যে সমস্ত ধারায় উল্লেখ রহিয়াছে তাহা লইয়া প্রথম গোলমালের সৃষ্টি হয়। জাপান কর্ত্তৃক আনীত এই প্রস্তাবের পশ্চাতে যে মতলব ছিল তাহা সর্বজনবিদিত। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড কিছুদিন পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রে জাপানীদিগকে বসবাস করিতে না দেওয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করিয়াছিল, এবং জাপান জেনেভায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদাধিকার লাভ করিতে ইচ্ছুক ছিল। ১১নং ধারার বিষয় বস্তুর অর্থ এরূপ ব্যাপক ছিল যে, ইহার দ্বারা এই অধিকার দেওয়া সম্ভবপর ছিল। কিন্তু বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলি জাতিসংঘ কর্ত্তৃক বিদেশীদিগকে বাসস্থান দেওয়া সংক্রান্ত তাহাদের আভ্যন্তরীণ আইন আলোচিত বা উপেক্ষিত হইতে দিতে রাজী ছিল না; এবং স্পষ্ট বুঝা গেল যে, অন্য কোন কারণে না হইলেও কেবলমাত্র এই কারণেই তাহারা প্রোটোকোল অনুমোদন করিবে না।

প্রোটোকোলের অন্যান্য ধারাগুলিতেও বৃটেন এবং ডোমিনিয়নসমূহ আপত্তির কারণ দেখিতে পাইয়াছিল। বৃটিশ সরকার সহজে বাধ্যতামূলক সালিশ ব্যবস্থা মানিতে ইচ্ছুক ছিল না; এবং যদিও পরবর্ত্তী বৃটিশ সরকার-গুলি নিয়মপত্রের প্রতি তাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় আনুগত্যের ঘোষণা করিয়া-ছিল তথাপি বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশেই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের নীতি জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। যদিও এই প্রোটোকোল ১৬নং ধারার পরিবর্ত্তন করে নাই তথাপি ইহা সত্য যে, যে সকল বিবাদে কাউন্সিল আক্রমণকারীকে চিহ্নিত করিতে পারিবে সেই সকল বিবাদের সংখ্যার অনুপাতে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনেরও প্রয়োজন ঘটিবে। এই অবস্থায়, ডোমিনিয়নগুলির অমতের জন্য এবং বৃটেনের দায়িত্ব

বৃদ্ধি করিতে অনিচ্ছুক কমন্স সভার আপত্তির ফলে বৃটিশ শ্রমিক সরকারও এই প্রোটোকোল গ্রহণ করিতে সাহসী হইল না। কিন্তু জেনোভিয়েভ্ পত্রের প্রকাশের পর নূতন নির্বাচনে শ্রমিক মন্ত্রীসভার পতন হয় এবং বলডুইনের কনজারভেটিভ্ সরকার গঠিত হয়। ফলে, ১৯২৫ সনের মার্চ মাসে বৈদেশিক দপ্তরের নূতন মন্ত্রী সরকারীভাবে এই প্রোটোকোল প্রত্যাখ্যান করেন।

লোকার্নোর সন্ধি

জেনেভা প্রোটোকোলের মৃত্যু হইল, এবং ফ্রান্সের চক্ষে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল বৃটেন। আশ্চর্যের বিষয়, ফ্রান্সে নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান দুই বৎসর পূর্ব্বের একটি জার্মান প্রস্তাবের মধ্যে পাওয়া গেল। ১৯২২ সনের শেষভাগে বৃটেন এবং বেলজিয়ামকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া জার্মান সরকার ফরাসী সরকারকে অন্ততঃ এক পুরুষ যাবৎ পরস্পরকে আক্রমণ না করিবার জন্য একটি পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব দিয়াছিল। এই প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মারফৎ পাঠানো হইয়াছিল। রূঢ় অধিকারের প্রাক্কালে এই প্রস্তাব ফ্রান্স অপেক্ষা জার্মানীর পক্ষেই অধিকতর সুবিধাজনক ছিল বলিয়া ইহা পয়েনকেয়ার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। পরবর্ত্তী দুই বৎসর যাবৎ জার্মান সরকার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতে থাকে। অবশেষে, জেনেভা খসড়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে এই প্রস্তাবটির প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় রাজনীতি হইতে যুক্তরাষ্ট্র সরিয়া দাঁড়াইবার ফলে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে বৃটেন প্রস্তুত ছিল। জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসী-জার্মান সীমান্ত রক্ষার অঙ্গীকার করিতে, এবং অপর পক্ষে ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে এই সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বৃটেন রাজী ছিল।

লোকার্নোর সন্ধির এই ছিল ভিত্তি। ১৯২৫ সনের গ্রীষ্মকাল ধরিয়া এই সম্বন্ধে কূটনৈতিক আলোচনা চলে। ধীরে ধীরে এই সন্ধির সমস্ত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হয়। ফরাসী জার্মান সীমান্তের ন্যায় বেলজিয়াম-জার্মান সীমান্ত সম্বন্ধেও একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। কেবলমাত্র সীমান্তগুলি সম্পর্কে এই অঙ্গীকার (guarantee) প্রযোজ্য ছিল না। নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চল সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য ছিল (এই অঞ্চলে জার্মানী সৈন্য রাখিতে বা দুর্গাদি নির্মাণ করিতে অধিকারী ছিল না)। অতিরিক্ত

অঙ্গীকারকারী হিসাবে ইটালিকেও পাওয়া গেল। স্থির হইল যে, সন্ধি-স্বাক্ষরিত হইবার পর জার্মানী জাতিসংঘে যোগদান করিবে, এবং ইহার কাউন্সিলের একটি স্থায়ী সভ্যপদ লাভ করিবে। কিন্তু দুইটি অসুবিধার সৃষ্টি হইল। প্রথমটির সৃষ্টি হইল চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর সীমান্ত লইয়া। যদিও জার্মানী ভার্সাই সন্ধি-নির্দিষ্ট তাহার পশ্চিম সীমান্তগুলি পুনরায় মানিয়া লইতে রাজী ছিল, কিন্তু ভার্সাই—নির্দিষ্ট অন্য সীমান্তগুলির সম্পর্কে তাহার মনোভাব ছিল ইহার বিপরীত। বৃটেনও কেবলমাত্র জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তগুলি সম্পর্কেই অঙ্গীকার করিতে রাজী ছিল; পূর্ব্ব সীমান্ত সম্বন্ধে নহে। জার্মানীর সহিত পোল্যাণ্ডের এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সালিশি চুক্তি, ও এই দুইটি রাষ্ট্রের সহিত ফ্রান্সের গ্যারাণ্টি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে প্রথম অসুবিধাটি দূর হয়।

দ্বিতীয় অসুবিধাটি সৃষ্টি হইয়াছিল রাপালো সন্ধি প্রসূত সোভিয়েট-জার্মান মৈত্রীর ফলে। জার্মানীর ভয় হইয়াছিল যে, নিয়মপত্রের ১৬নং ধারা অনুযায়ী পশ্চিমী শক্তিগুলি কোন একদিন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া জার্মানীকে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতে পারে। লোকার্নো-শক্তিগুলি একটি পত্রে এই কথা লিখিয়া জার্মানীর ভীতি দূর করে যে, নিয়মপত্রের সমর্থনে জাতিসংঘের একটি সভ্যকে সেই অনুপাতে সহযোগিতা করিতে হইবে যাহা তাহার সামরিক ও ভৌগোলিক অবস্থার সহিত সমঞ্জস হইবে। ইহার অর্থ এই দাঁড়াইল যে, নিরস্ত্রীকৃত দেশ হিসাবে জার্মানীকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনে অংশ গ্রহণ করিতে বলা হইবে না।

সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নো নামক শহরে ১৬ই অক্টোবর এই সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ নিম্নলিখিত চুক্তির খসড়া গ্রহণ করেন :—

(১) সন্ধিটি (লোকার্নো সন্ধি) ফরাসী-জার্মান এবং বেলজিয়াম-জার্মান সীমান্তগুলি,

(২) ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর সালিশ চুক্তিগুলি,

এবং (৩) ফ্রান্সের সহিত চেকোশ্লভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের পারস্পরিক অঙ্গীকার চুক্তিগুলি বজায় রাখিবার গ্যারাণ্টি দিল।

১৯২৫ সনের ১লা ডিসেম্বর লণ্ডনে এই সন্ধিটি সরকারীভাবে স্বাক্ষরিত

হয়। ইহা স্বাক্ষর করিবার সময় ইহার মধ্যস্থ স্বাক্ষরকারীরা বিশেষ আমল দেয় নাই ; কিন্তু ধীরে ধীরে ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, পশ্চিম সীমান্তকে জার্মানী স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লওয়ার ফলে তাহার অন্যান্য সীমান্ত অপেক্ষা এই সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অধিকতর মহনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইল ; ইহার তাৎপর্য্য এই দাঁড়াইল যে, স্বেচ্ছায় স্বীকৃত দায়িত্ব অপেক্ষা ভার্সাই-আরোপিত দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা ছিল আইনগত দৃষ্টিতে না হইলেও নৈতিক দৃষ্টিতে কম। দ্বিতীয়তঃ, গ্রেটবৃটেন কর্ত্তৃক কতগুলি সীমান্ত সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দেওয়া ও অন্য কতগুলি সম্বন্ধে না দেওয়ার ফলে সীমান্তগুলি নিরাপত্তার দিক হইতে প্রথম ও দ্বিতীয়—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল ; এবং বৃটিশ সরকার যখন নিয়মপত্রানুযায়ী সকল দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতে অস্বীকৃত হইল, তখন লোকার্নো-সন্ধিব দ্বারা এইরূপ বুঝা গেল যে, পূর্ব্ব ইউরোপীয় সীমান্ত রক্ষার জন্য বৃটেন সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে রাজী ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত, ভার্সাই-সন্ধি ও নিয়মপত্র উভয়েরই ক্ষতিকারীরূপে লোকার্নো সন্ধিটি আত্ম-প্রকাশ করিল। ফলে, এইরূপ মতের সৃষ্টি হইল যে, স্বেচ্ছাকৃত অন্যান্য চুক্তির দ্বারা ভার্সাই সন্ধিকে বলবৎ না করা হইলে ইহার বাধ্যবাধকতার জোর নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং কোন সীমান্ত সম্পর্কে কোন সরকারের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকিলে সেই সীমান্ত-রক্ষার দায়িত্ব ঐ সরকারের উপর বর্ত্তাইবে না। ১০ বৎসর পরে প্রায় সকল সরকারই এই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিল।

১৯২৫ সনে ব্যাপক শুভেচ্ছা ও আশাবাদের পরিবেশে উপরোক্ত তাৎপর্য্য গুলির প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করে নাই, এবং ইহার ফলে কোন অসুবিধারও সৃষ্টি হয় নাই। ইউরোপে শান্তিস্থাপন ব্যাপারে লোকার্নো—সন্ধির অবদান প্রকৃতই অনস্বীকার্য। যুদ্ধের পরে, ফরাসী-দাবী ও জার্মান দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে প্রথম সফলতা ইহার মাধ্যমেই আসিয়াছিল। বৃহৎ শক্তিগুলির গোষ্ঠীতে জার্মানীকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করিবার যে চেষ্টা ডস্ পরিকল্পনা আরম্ভ করিয়াছিল, সম্পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে না হইলেও (জার্মানীর একক নিরস্ত্রীকরণ তখনও বজায় ছিল) জার্মানীকে জাতিসংঘের সমসম্মান—বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিগণিত করিয়া ইহা সেই চেষ্টাকে সম্পূর্ণতা দান করে। অষ্টিন্ চেম্বারলেন্ ইহাকে যুদ্ধকাল এবং ইহার পরবর্ত্তী শান্তির যুগের মধ্যে একটি প্রকৃত সীমারেখা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চরম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জাতিসংঘ

১৯২৪ সন হইতে ১৯৩০ সন পর্যন্ত জাতিসংঘের সম্মান এবং ক্ষমতা চরমে উঠিয়াছিল। ১৯২৪ সনের পূর্বে জাতিসংঘের বৈঠকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীরা তাঁহাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন নাই, কিন্তু ১৯২৪ সন হইতে এই সকল বৈঠকে তাঁহারা সর্বদাই অংশ গ্রহণ করেন। ইহার ফলে প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভা ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কগণের মিলন স্থানরূপে পরিণত হইয়াছিল। ১৯২৯ সনে জাতিসংঘের পরিষদে ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী যোগ দিয়াছিলেন। অ ইউরোপীয় দেশগুলি প্রায়শঃই এই সকল সভায় তাহাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রেরণ করিতেন।

পূর্ণক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জাতিসংঘ :

লোকানোর সন্ধিগুলি স্বাক্ষরিত হইলে ১৯২৬ সনের মার্চমাসে কাউন্সিলের নিয়মিত অধিবেশনের কালে সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ বৈঠক আহ্বান করা হয় যাহাতে জার্মানী আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সভ্যপদ এবং কাউন্সিলে একটি স্থায়ী আসনলাভ করিতে পারে। জাতিসংঘের ইতিহাসে এই সময়টি যুগান্তকারী হইয়াছিল। এই সময় পর্যন্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং পূর্বতন ক্ষুদ্র শত্রু রাষ্ট্রগুলির প্রভাব এত কম ছিল যে, জাতিসংঘকে সাধারণতঃ শান্তিচুক্তি রক্ষার জন্য বিজয়ী শক্তিগুলির একটি প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা হইত। জাতিসংঘের সভ্য হিসাবে ও কাউন্সিলের একটি স্থায়ী সভ্যরূপে জার্মানির নির্বাচনের ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, এবং অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষার ভিত্তিতে জাতিসংঘের কার্যকলাপের সূচনা হয়। নিয়মপত্রের মূল ভাষানুযায়ী বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এই পাঁচটি বৃহৎ বিজেতা-রাষ্ট্র স্থায়ী সভ্য এবং পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত চারিজন অস্থায়ী সভ্য লইয়া কাউন্সিল গঠিত হইল। কাউন্সিলের সর্বসম্মতিক্রমে এবং পরিষদের অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদন পাওয়া গেলে

কাউন্সিলের স্থায়ী সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইত। যুক্তরাষ্ট্রের যোগ না দেওয়ার ফলে স্থায়ী সভ্যদের সংখ্যা চারিজনে দাঁড়াইল এবং ১৯২২ সনে ক্ষুদ্রশক্তিগুলির চাপের ফলে অস্থায়ী সভ্যদের সংখ্যা ছয়টি হইল। ১৯২৬ সনের মার্চমাসে, স্থায়ী সভ্যপদের জন্য জার্মানীর দরখাস্তটি কাউন্সিল কর্তৃক বিবেচিত হইবার সময় আন্তর্জাতিক অবস্থা এইরূপ ছিল।

কিন্তু, এই সময় একটি গোলমালের সৃষ্টি হইল। কাউন্সিলের স্থায়ী সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করার যে ব্যবস্থা নিয়মপত্রে লিখিত ছিল তাহার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানী ও রাশিয়া এই বৃহৎ শক্তি দুইটিকে ভবিষ্যতে কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত করা। লোকার্নো আলোচনার সময় অন্য কোন শক্তিকে স্থায়ী সভ্যপদ দেওয়ার সম্ভাবনার কথা কেহ ধরিয়া লয় নাই। কিন্তু যখন জার্মানী স্থায়ী সভ্যপদের জন্য আবেদন করিল তখন পোল্যাণ্ড, স্পেন এবং ব্রাজিল অনুরূপ দাবী জানাইল। পোল্যাণ্ডের দাবীর পিছনে অবশ্য কিছু যুক্তি ছিল। বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর একজন না হইলেও, পোলাণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল ; জনসংখ্যা ও সম্পদের দিক হইতে সে ইটালী অপেক্ষা বিশেষ দুর্বল ছিল না। লোকার্নোর সন্ধিগুলিতে দেখা যায় যে, ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের স্বার্থকে স্বীয় স্বার্থের খাতিরে ছোট করিয়া দেখিয়াছিল ; যাহাতে ফ্রান্স ও বৃটেন তাহার ক্ষতি করিয়া জার্মানীর সঙ্গে মীমাংসার চেষ্টা না করে সেইজন্যই পোল্যাণ্ড কাউন্সিলে একটি স্থায়ী আসন দাবী করিয়াছিল। আবার অপরপক্ষে, জার্মানীও যুক্তি দিয়াছিল যে, লোকার্নো-সন্ধির অঙ্গ হিসাবে কেবল তাহাকেই স্থায়ী সভ্যপদ দানের অঙ্গীকার করা হইয়াছিল। সুতরাং যদি পোলাণ্ডকে স্থায়ীপদ দেওয়া হয় তবে সকল প্রয়োজনীয় ব্যাপারেই পোল্যাণ্ড তাহার বিরোধিতা করিবে এবং ফলে তাহার স্থায়ী সভ্যপদ লাভ নিরর্থক হইবে।

ইংল্যাণ্ডের জনমত ও জেনেভায় উপস্থিত অধিকাংশ প্রতিনিধি জার্মানীর যুক্তিকে মানিয়া লইয়াছিল, এবং কাউন্সিলের স্থায়ী সভ্য হিসাবে অন্য কোন রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করিতে অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সময় চেম্বারলেন স্পেনের দাবী সমর্থন করে, এবং ফলে নূতন ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী ব্রিয়াণ্ড পোল্যাণ্ডকে সমর্থন করিলেন। স্পেন ও ব্রাজিল উভয়েই তখন কাউন্সিলের অস্থায়ী সভ্য ছিল বলিয়া কাউন্সিলে জার্মানীর প্রবেশের জন্য তাহাদের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহাদের নিজেদের দাবী

স্বীকৃত না হইলে তাহারা জার্মানীর পক্ষে ভোট দান করিতে অস্বীকৃত হইল। এইরূপে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কাউন্সিল কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারিল না, এবং কোন কিছু না করিয়া পরিষদ ভাঙ্গিয়া গেল। ফলে জার্মানী লীগের বাহিরেই রহিয়া গেল।

১৯২৬ সনের গ্রীষ্মকালে লীগ কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি এই অচলাবস্থার সমাপ্ত ঘটাইতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত সমাধান এইরূপে হয় যে, অস্থায়ী সভ্যের সংখ্যা ৬ হইতে ৯ পর্যন্ত করা হইবে এবং পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সাহায্যে ত্রৈবার্ষিক কার্য্যকাল শেষ হইবার পরেও তিনটি অস্থায়ী সভ্যরাষ্ট্রকে পুনরায় কাউন্সিলের সভ্যপদে নির্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হইবে। এইরূপে কাউন্সিলে আধাস্থায়ী একটি সভ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হইল। পোল্যাণ্ড ও জার্মানী উভয়েই এই মীমাংসা মানিয়া লয়, এবং পোল্যাণ্ড আশা করিল যে, আধাস্থায়ী সভ্যদের একটি আসন তাহাকে নিশ্চয়ই দেওয়া হইবে। অপরপক্ষে, স্পেন ও ব্রাজিল ইহা প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু জার্মানীর প্রবেশের বিরুদ্ধে ভোট দিলে যে অশান্তি সৃষ্টি হইবে তাহা এড়াইবার জন্য তাহারা জাতিসংঘ ত্যাগ করিল। ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পরিষদের অধিবেশনে জার্মানী জাতিসংঘে যোগ দেয় এবং প্রচুর উৎসাহের মধ্যে তাহাকে কাউন্সিলের স্থায়ী সভ্যপদ দেওয়া হয়। তথাপিও জার্মান মনে এই সন্দেহ রহিয়া গেল যে, জার্মানী জেনেভায় ন্যায্য ব্যবহার পাইবে না। জার্মানীর জাতিসংঘ-বিরোধীদল আরও প্রবল হইয়া উঠিল; এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে স্থায়ীপদ লইয়া কলহের সময়ে জার্মানী সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত একটি সন্ধিস্থাপন করে এই সন্ধিতে উভয় দেশ রাপালো সন্ধির প্রতি তাহাদের আনুগত্য পুনরায় স্বীকার করিয়া লয়; তাহাদের একজন আক্রান্ত হইলে অন্যজন নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

জার্মানীর যোগদানের ফলে জাতিসংঘের শক্তি পূর্ণতা লাভ করিল। আমেরিকা মহাদেশের সর্বাপেক্ষা বড় ৩টি রাষ্ট্র—যুক্তরাষ্ট্র আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল জাতি সংঘের বাহিরে ছিল; এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ইহার ভিতরে থাকিলেও আর্থিকভাবে অথবা নৈতিকভাবে ইহারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধন করে নাই। দূর প্রাচ্যে জাপান, চীন, ও শ্যাম, এবং ভারতবর্ষ ইহার সভ্য ছিল; মধ্যপ্রাচ্যে পারস্য জাতিসংঘে যোগ

দিয়াছিল; কিন্তু তুরস্ক ইহার বাহিরেই রহিল। আফ্রিকার সাউথ আফ্রিকায় ইউনিয়ন সাধারণতঃ পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাইত, কিন্তু লাইবেরিয়া ও আবিসিনীয়ার সভ্যপদ একটু অদ্ভুত ধরণের ছিল। অষ্ট্রিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড পঞ্চম মহাদেশটি প্রতিনিধিত্ব করে। তথাপি জাতিসংঘের কেন্দ্রস্থল ছিল ইউরোপ, এবং ১৯২৮ সনে স্পেন যখন জাতিসংঘে পুনরায় যোগদান করে তখন বৃহৎশক্তি হিসাবে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নই জাতিসংঘের বাহিরে রহিয়া গেল।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রতি সোভিয়েট সরকারের যে বিদ্বেষ ছিল সেই সব রাষ্ট্র লইয়া গঠিত জাতিসংঘের প্রতি ইহার দৃষ্টিভঙ্গীও অনুরূপ ছিল। ১৯২৪ সন হইতে ইঙ্গ-সোভিয়েট সম্পর্কের অবনতি হইতে লাগিল ১৯২৬ সনে সাধারণ ধর্মঘটের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনের ফলে ইংলণ্ডে বিদ্বেষের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। পরবৎসর, বৃটিশ সরকার অন্যায়ভাবে সোভিয়েটের সরকারী বাণিজ্য সংস্থা Arcos আক্রমণ করে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ষড়যন্ত্রের প্রমাণস্বরূপ কিছু দলিলপত্র সেখানে পাওয়ার ফলে ১৯২১ সনের বাণিজ্যচুক্তি বাতিল করা হয়, এবং সোভিয়েট সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। কিন্তু ইটালীও ফ্রান্সের সহিত সোভিয়েটের সম্পর্কের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। জাতিসংঘের জার্মানীর প্রবেশের ফলে সোভিয়েট-জার্মান সম্পর্কের বিশেষ কোন উন্নতি হইল না। যদিও সোভিয়েট মুখপাত্ররা জাতিসংঘের নিন্দা করিত, তথাপি ১৯২৭ সনে, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, মানবিক, এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত কার্য্যকলাপের সংগে সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। সেই বৎসরই সোভিয়েট প্রতিনিধিরা সর্বপ্রথম জেনেভায় আগমন করেন এবং একটি অর্থনৈতিক সভা ও নিরস্ত্রীকরণ সভার Preparatary Commission এর কমিটিতে অংশ গ্রহণ করেন।

শান্তির দূতরূপে জাতিসংঘ :

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের মীমাংসা করিয়া যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে ইউরোপকে রক্ষা করাই ছিল জাতি সংঘের প্রধান কাজ। তবে ইহার চরম শক্তি ও গৌরবের দিনগুলিতেও ইহার অধিকার সর্বব্যাপী ছিল না। যখন ১৯২৬ সনে নিকারাগুয়ার সরকার মেক্সিকোর বিরুদ্ধে জাতিসংঘের

নিকট বিচার প্রার্থনা করিল তখন যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমেরিকান ও অন্যান্য বিদেশীদের ধন-প্রাণী রক্ষার জন্য কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ খুব তৎপরতার সহিত নিকারাগুয়ায় প্রেরণ করে। ইহার ফলে জাতিসংঘ স্বীকার করিয়া লয় যে, মধ্য আমেরিকার শান্তি রক্ষার ব্যাপারে ইহার কোনরূপ চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। যদিও মিশরকে ১৯২২ সনে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল, তথাপি বৃটেন ও মিশরের অদ্ভুত সম্পর্কের জন্য মিশরকে জাতিসংঘের সভ্যপদ দেওয়া হয় নাই। উপরন্তু বৃটেন ও মিশরের বিবাদকে আন্তর্জাতিক বিবাদ বলিয়াও পরিগণিত করা হয় নাই। যে সকল সন্ধির দ্বারা বিদেশীরা চীন দেশে বিশেষ প্রকারের অধিকার লাভ করিয়াছিল সেই সকল সন্ধি সম্পর্কিত বিবাদ জাতিসংঘের নিকট আনয়ন করিতে দেওয়া হইত না। কিন্তু এই ব্যতিক্রম সত্ত্বেও জাতিসংঘের অধিকার ছিল সুদূর-প্রসারিত, এবং এই কয়েক বৎসরেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন বিবাদের মীমাংসার জন্য ইহার নিকট আবেদন আসিয়াছিল।

তুরস্ক ও ইরাকের সীমান্ত সম্পর্কিত বিরোধই ছিল জাতিসংঘের প্রথম মীমাংসার বিষয়। পূর্বে এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে তুরস্ক ও ইরাকের সীমান্ত-সমস্যা বৃটিশ ও তুরস্ক সরকার সমাধান করিতে না পারিলে জাতিসংঘের কাউন্সিল কর্তৃক ইহা মীমাংসিত হইবে। ১৯২৪ সনের শরৎকালে কাউন্সিল (এই প্রশ্নের আলোচনার জন্য তুরস্ককেও একটি বিশেষ সভ্যরূপে ইহাতে আসন দেওয়া হইয়াছিল) সীমান্তরেখা নির্ধারণ করিবার জন্য একটি 'নিরপেক্ষ সীমান্ত কমিশন' গঠন করে। কুর্দ, তুর্কী ও আরব অধিবাসী অধ্যুষিত, বৃটিশ অধিকৃত মসুল জিলা লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। যখন সীমান্ত কমিশন তাহাদের অনুসন্ধান কার্য্য চালাইয়া যাইতেছিল তখন তুরস্কের কুর্দগণ তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এবং কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। ফলে অনেক কুর্দ মসুল অঞ্চলে আশ্রয় লয়, ও সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি ভীষণ সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হইল যে, ১৯২৫ সনের প্রথম ভাগে জাতিসংঘের কাউন্সিল এই সকল গোলযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে একটি দ্বিতীয় কমিশন প্রেরণ করে। এই কমিশনের বিবরণী তুরস্কের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিল, এবং ফলে এই বিবরণীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কাউন্সিল প্রায় সমগ্র মসুল জিলাকে ইরাকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সীমারেখা নির্ধারণ করিল। তুরস্ক কিছুদিন পরে

কাউন্সিল ত্যাগ করে, এবং বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী বিচারালয়ের নিকট প্রেরিত হয়। এই বিচারালয় রায় দিল যে, লুসান সন্ধি অনুযায়ী কাউন্সিলের কোন প্রকার মীমাংসার জন্য বিবদমান পক্ষগুলির ভোটের প্রয়োজন নাই। অল্প ইতস্ততের পর তুরস্ক নূতন সীমান্ত স্বীকার করিয়া লয়, এবং ১৯২৬ সনের জুনমাসে বৃটেন, তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে স্থাপিত সন্ধি দ্বারা ইহা অনুমোদিত হয়।

দ্বিতীয় বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল বলকান অঞ্চল লইয়া। যুদ্ধের পর অনেক বৎসর যাবৎ গ্রীস ও বুলগেরিয়ার সীমান্তে প্রধানতঃ মেসিডোনিয়ার দস্যুদের কার্যকলাপের ফলে অনেক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ১৯২৪ সনের অক্টোবর মাসে, এইরূপ একটি ঘটনায় গ্রীক সীমান্ত রক্ষী একজন সেনাপতি ও তাঁহার একজন সঙ্গী নিহত হন। প্রতিশোধের জন্য একটি গ্রীকবাহিনী বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে। ফলে, বুলগেরিয়া সরকার নিয়মপত্রের ২২নং ধারানুযায়ী জাতিসংঘের নিকট আবেদন করে কাউন্সিল অবিলম্বে প্যারিস মিলিত হইয়া গ্রীক সরকারকে সৈন্য সরাইয়া লইতে পরামর্শ দেয় এবং বৃটিশ, ফরাসী ও ইটালীর সরকারদিগকে ঘটনাটি অনুসন্ধানের জন্য সামরিক কর্মচারী প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানায়, ইহার ফলে গ্রীক বাহিনী বুলগেরিয়া হইতে পশ্চাদপসরণ করে এবং গ্রীস বুলগেরিয়া সীমান্ত লঙ্ঘনে জাতিসংঘের একটি কমিশন কর্তক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ বুলগেরিয়াকে দান করিতে স্বীকৃত হয়। দুই বৎসর পূর্বে গ্রীসের সীমান্ত ইটালী কর্তৃক লঙ্ঘিত হইলে ইটালীকে এই প্রকারের শাস্তি দেওয়া হয় নাই বলিয়া গ্রীসবাসীর মনে একটি ক্ষোভ রহিয়া গেল।

তৃতীয় বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল লিথুনিয়া ও পোল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া। ভিলনা শহর লইয়া এই দুইপক্ষের মধ্যে কলহের ফলে মিত্রসরকারগুলি ভিল্‌নার অধিকার পোলাণ্ডের হস্তে ছাড়িয়া দিলে লিথুনিয়ার সরকার এই ব্যবস্থা মানিতে অস্বীকৃত হয়, পোল্যাণ্ডের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ইহার সহিত 'যুদ্ধাবস্থা' ঘোষণা করে। ইহার ফলে দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সীমান্তে ছোটখাট সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ১৯২৭ সনের শরৎকালে, লিথুনিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ভোল্ডেমারাস ভিল্‌না হইতে কিছু সংখ্যক লিথুনিয়ানের বহিষ্করণের সুযোগ লইয়া সমগ্র বিবাদই নিয়মপত্রের ১১নং ধারানুযায়ী জাতিসংঘের নিকট প্রেরণ করেন।

ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ কাউন্সিলের একটি স্মরণীয় অধিবেশনে লিথুনিয়া ও পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়কদ্বয় মিলিত হন। ইহার ফলে, 'যুদ্ধাবস্থা'কে জাতি সংঘের উদ্দেশ্যের পরিপন্থীরূপে মনে করিয়া উভয়েই ইহা প্রত্যাহার করিতে রাজী হন। কিন্তু ইহা দ্বারা ভিল্‌না সম্বন্ধে মতভেদ দূর হইল না। সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে ভিল্‌না সম্পর্কে মীমাংসার জন্য দুই সরকারকে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই, এবং ইহা ছাড়া দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক অথবা বাণিজ্যিক সম্পর্কেও পুনস্থাপিত হয় নাই। তথাপি পোল্যাণ্ড ও লিথুনিয়ার মধ্যে বহুদিনের কলহ লইয়া একটি মনখোলা আলোচনা জেনেভা—সভায় হইয়াছিল বলিয়া দুই রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততা বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছিল; এবং কোনরূপ অশান্তির ভয়ও আর রহিল না।

মসুল বিবাদ ও পোলিশ—লিথুয়ান বিবাদ ছিল অসমশক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দুইটি ব্যাপারেই দেখা যায় যে, অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রটি বিরোধমূলক স্থানটি স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিল এবং অধিকন্তু ইহার উপর তাহার আইনানুযায়ী দাবীও ছিল। এই উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ কোন ক্ষতি স্বীকার না করিয়াই দুর্বল রাষ্ট্রটি জাতিসংঘের অনুরোধে নিজস্ব দাবী ছাড়িয়া দিতে রাজী হয়। কিন্তু গ্রীক-বুলগেরিয়ান বিবাদটি দুইটি দুর্বল ও সমশক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং ইহাদের মধ্যে কাহারও কাউন্সিলে কোন শক্তিশালী মিত্র ছিল না। ফলে জাতিসংঘের পক্ষে এইটিই ছিল উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র। এই ব্যাপারে কাউন্সিলের পক্ষে একটি নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও বিবদমান দলগুলিকে ইহাতে সম্মত করা সহজ ছিল। পরবর্তীকালে যুদ্ধের সম্ভাবনাযুক্ত বিবাদে এইরূপ উপযুক্ত পরিবেশ আর পাওয়া যায় নাই; এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা নষ্ট করিতে জাতিসংঘের সফলতার চরম নিদর্শন ছিল এই ঘটনাটি।

জাতিসংঘের এই সকল সফলতায় ইহাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই এই সাফল্য আসে। শেষোক্ত দুইটি ব্যাপারে নিয়মপত্রের ৪নং ও ১১নং ধারার প্রয়োগ হইয়াছিল। উভয় পক্ষই পূর্ণ সভ্যরূপে কাউন্সিলে আসন গ্রহণ করিয়াছিল; এবং ইহার অর্থ এইরূপ দাঁড়াইল যে, উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না। মসুল বিবাদের প্রথম দিকে এই প্রণালী অনুযায়ী কার্য করা হইয়াছিল,

কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায়ের দ্বারা ইহা পরিবর্তিত হয়। সমস্ত ক্ষেত্রেই ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, কেবলমাত্র বোঝাপড়া এবং বোঝানোর দ্বারাই কাউন্সিল তাহার কার্য করিবে। জাতিসংঘ তাহার শক্তি ও সম্মানের দিনে নৈতিক বলের উপরই বেশী নির্ভরশীল ছিল; কারণ নিয়মপত্রের ১১নং ধারা ইহাকে আর কোন ক্ষমতা দান করে নাই। ১৯৩২ সনের পূর্বে প্রমাণ পত্রের ১৫নং এবং ১৬নং ধারা অনুযায়ী বিচার বা শাস্তি প্রদান করিবার কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই।

জাতিসংঘের অন্যান্য কার্য্য :

শান্তিরক্ষা ব্যতিরেকে জাতিসংঘ কতগুলি রাজনৈতিককার্য্য সমাধা করিয়াছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ১১ জন সভ্য লইয়া গঠিত Mandates Commission জেনেভায় প্রতিবৎসর দুইবার মিলিত হইয়া Mandatory শক্তিগুলির নিকট হইতে বার্ষিক বিবরণী গ্রহণ করিত, এবং নিজেদের মন্তব্য ও সুপারিশ সমেত এই বিবরণীগুলি কাউন্সিলের নিকট পেশ করিত। কাউন্সিল এইগুলি বিবেচনা করিত, এবং প্রয়োজন হইলে ইহাকে ভিত্তি করিয়া নির্দেশ দিত (এইজন্য কাউন্সিলের সভ্য না হইলেও Mandatory শক্তিকে কাউন্সিলে যোগ দিতে দেওয়া হইত)। সংখ্যালঘু—সংক্রান্ত সন্ধিগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি ভিন্ন ধরণের উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছিল। সংখ্যালঘুদের দরখাস্ত ও যে—সরকারের বিরুদ্ধে এই দরখাস্ত করা হইত তাহার জবাব একসঙ্গে কাউন্সিলের তিনজন সভ্য লইয়া গঠিত একটি কমিটির নিকট পেশ করা হইত। এই কমিটি সেই সরকারের সহিত বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিত, এবং সাধারণতঃ সরকারকে নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিত অথবা ইহার নিকট হইতে অভিযোগের প্রতিকারের অঙ্গীকার আদায় করিয়া লইত (সংখ্যালঘুদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা হইত না)। এই কমিটি যদি কোন সরকারের কার্যে সন্তুষ্ট হইতে না পারিত তবে ঐ দরখাস্ত কাউন্সিলের নিকট পেশ হইত, এবং এই কাউন্সিলে অভিযুক্ত —সরকারের প্রতিনিধি থাকিত। এইরূপে নিয়মপত্রের ১১নং ধারা অনুযায়ী পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা সংশ্লিষ্ট সরকারের সম্মতির ভিত্তির উপর Mandate ও সংখ্যালঘু-সমস্যার সমাধান প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইহা ছাড়া, জাতিসংঘ ১৯২০ হইতে ১৯৩৫ সন পর্যন্ত একটি শাসন

পরিষদের সাহায্যে 'সার' অঞ্চল কৃতকার্যতার সহিত শাসন করিয়াছিল, এবং ১৯৩৫ সনের জানুয়ারী মাসে এখানে গণভোট গ্রহণ করিয়াছিল। ডানজিগের শাসনতন্ত্র জাতিসংঘ কর্তৃক গ্যারান্টীকৃত ছিল, এবং জাতিসংঘের একজন হাইকমিশনার এই নগরী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত সকল বিবাদের সালিশী করিত। হাইকমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উভয় পক্ষেরই কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিবার অধিকার ছিল। ১৯৩৪ সনের পূর্বে যখন জার্মান—পোলিশ চুক্তির দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন হয়, তখন পোল্যাণ্ড ও ডানজিগের বিবাদ বার বার কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছিল; এবং জাতিসংঘও এই সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়া যথেষ্ট কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংযোগিতার জন্য জাতিসংঘ একটি নূতন ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রতিবৎসর, বিভিন্ন দেশ হইতে বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া গঠিত অর্থনৈতিক কমিটিগুলি জেনেভায় মিলিত হইয়া জাতিসংঘের মহাকরণের অর্থনৈতিক বিভাগগুলির পরিচালনা করিত। জাতিসংঘের বিভিন্ন ঋণ ব্যবস্থার সৃষ্টি ও তত্ত্বাবধানের ভার ছিল এই অর্থনৈতিক কমিটির উপর। ১৯২০ খৃঃ অব্দে ব্রাসেল্‌স, এবং ১৯২৭ খৃঃ অব্দে জেনেভায় অর্থনৈতিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম সভায় যুদ্ধোত্তরকালীন অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও দ্বিতীয় সভায় শুল্ক ও অন্যান্য বাণিজ্য বাধা দূরীকরণ লইয়া আলোচনা হয়।

যুদ্ধের পূর্বে ও পরে সামাজিক ও মানবিক ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যে সকল কাযকলাপ চলিতেছিল তাহার মধ্যে যোগাযোগ বিধানের জন্য জাতিসংঘ চেষ্টা করে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ছিল দাস প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ১৯২৫ সনে জেনেভায় Slavery Convention সৃষ্ট হয়, এবং ১৯৩২ সনে জাতিসংঘ একটি স্থায়ী Slavery Commission গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করে। অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে মারাত্মক ঔষধ ও নারীঘটিত ব্যবসা, শিশুদের রক্ষা, শরণাগতের সাহায্য ও পুনর্বসতির ব্যবস্থা, এবং স্বাস্থ্য ও রোগ প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী বিচারালয় নামক প্রতিষ্ঠান দুইটি জাতিসংঘের অর্থে পালিত হইলেও শাসনতান্ত্রিক

ব্যাপারে ইহারা জাতিসংঘ হইতে স্বাধীন ছিল। আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য শান্তিচুক্তির সাহায্যে জেনেভায় অবস্থিত এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার শাসনতন্ত্র জাতিসংঘের শাসনতন্ত্রের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল; ইহার বাৎসরিক সভা, শাসন পরিষদ এবং কার্যালয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কাউন্সিল ও মহাকরণের সঙ্গে তুলনীয়। এই সংস্থায় জাতিসংঘের সকল সভ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিল যোগ দিয়াছিল। ইহার বাৎসরিক সভায় প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্র হইতে সরকার—নিযুক্ত দুইজন, মালিক প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে ১ জন, এবং শ্রমিক সমিতিগুলি হই ১ জন—এই মোট ৪ জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইত। শ্রমিক জীবনের বিভিন্ন দিক্‌ লইয়া অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সকলগুলিই পাকা অনুমোদন লাভ করে নাই।

আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার জন্য এবং কাউন্সিল বা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রার্থিত উপদেশ প্রদানের জন্য নিয়মপত্রের ১৪নং ধারা অনুযায়ী জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিচারের জন্য স্থায়ী আদালতের সৃষ্টি হয়। কাউন্সিল ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতি ৯ বৎসর অন্তর ১৫ জন বিচারক এই আদালতের জন্য মনোনীত হইতেন। এই আদালতের গঠনতন্ত্রে একটি ঐচ্ছিক ধারা (Optional Clause) ছিল; ইহাতে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্র জাতিসংঘের অন্যান্য সভ্যের সহিত আইন সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক বিবাদ ঐ আদালতের নিকট আনয়ন করিতে বাধ্য ছিল। প্রায় সকল বৃহৎ শক্তি সমেত ৫০টি রাষ্ট্র এই ধারায় স্বাক্ষর দেয়, অবশ্য ইহাদের মধ্যে কতিপয় ইহাতে কিছু ব্যতিক্রমের উল্লেখ রাখিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই আদালতের অধীনে আসিবার জন্য দুইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই এই চেষ্টা বিফল হয়। ১৯১২ সন হইতে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত এই বিচারালয় ৫০টিরও অধিক রায় দিয়াছিল ও মত প্রকাশ করিয়াছিল।

———

সপ্তম অধ্যায়

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

লোকার্নো সন্ধির ফলে নিরাপত্তা-প্রচেষ্টার শেষ হইল না। ফ্রান্স লোকার্নো সন্ধির উপর নির্ভর করিয়া তাহার মিত্রগণকে ত্যাগ করিতে অথবা স্বীয় নিরস্ত্রীকরণে রাজী ছিল না। তাহার কর্মপন্থার মধ্যে নিরাপত্তার প্রশ্নটিই সর্বাগ্রে স্থান পাইয়াছিল। ফ্রান্সের মিত্রশক্তিদের নিরাপত্তার জন্য লোকার্ণো কিছুই করে নাই এবং সেই জন্যই নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু, নিরস্ত্রীকরণের চাপের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তাকে ফ্রান্স ব্যবহার করিয়াছিল। ১৯২২ সনে জেনেভায় ফরাসী প্রতিনিধিরা যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন পরে তাহা ফরাসী পররাষ্ট্র নীতির একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে পরিণত হইল। যতবারই বৃটিশ (এবং ১৯২৬ সনের পরে জার্মান) প্রতিনিধিরা জাতিসংঘকে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন, ফরাসী, পোলিস এবং Little Entente এর প্রতিনিধিরা নিরস্ত্রীকরণের পূর্বে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার উপর ততই জোর দিতে লাগিলেন। ফলে জাতিসংঘের সভ্যগণ দুই দলে বিভক্ত হইল—একদল নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে নিরাপত্তা সৃষ্ট হইবে বলিয়া মনে করিতেন এবং অপরদল নিরস্ত্রীকরণের পূর্বে অধিকতর নিরাপত্তার দাবী জানাইলেন কিন্তু কেহই নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের পরস্পর নির্ভরশীলতাকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না; এই ভাবধারাই পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি ও জেনেভা খসড়ার ভিত্তি স্বরূপ ছিল এবং লোকার্নোত্তর যুগে জাতিসংঘের কার্যাবলী ইহা দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিল।

জাতিসংঘর চুক্তিসমূহ (Conventions)

১৯২৬ সন ও ১৯২৯ সনের মধ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিবার জন্য অনেকগুলি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে, ফিনল্যাণ্ডের প্রতিনিধিগণ একটি প্রস্তাব করিলেন যে, যে সকল রাষ্ট্রের আক্রান্ত হইবার আশংকা ছিল তাহাদিগকে জাতিসংঘের অন্যান্য

সভ্যদের নিকট হইতে সুবিধজনক শর্তে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রস্তাব পরে "আর্থিক সাহায্যের চুক্তি"-তে পরিণত হয় এবং ১৯৩০ সনে পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। যেহেতু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইবে না বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল, সেইহেতু ইহা পরিকল্পনাতেই পর্যবসিত হইয়া রহিল।

১৯২৭ সনে যখন পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইল তখন নিরস্ত্রীকরণ সভার প্রস্তুতকারী কমিশনের সম্মুখে একটি বাধা দেখা দিয়াছিল এবং কিছুদিন পূর্বে জেনেভায় অনুষ্ঠিত নৌ-সভা বিফল হইয়াছিল। এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য পরিষদ নিরাপত্তা-সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষরূপে সজাগ রহিল। জেনেভা খসড়াকে পুনর্জীবনদান করিবার জন্য কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন এবং হল্যাণ্ডের প্রতিনিধিবর্গ নিয়মপত্রে উল্লিখিত নিরস্ত্রীকরণ, নিরাপত্তা ও সালিশ ব্যবস্থার নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য পরিষদকে আহ্বান জানাইলেন। ফলে পরিষদ সালিশ ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করিতে প্রস্তুতকারী কমিশনকে আহ্বান জানাইল; স্থির হইল যে, এই কমিটির কার্য হইবে সমস্ত রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি দেওয়ার জন্য ও সকল রাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করিবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির ব্যবস্থা করা।

১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের মধ্যে সালিশ ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কমিটি বিপুল উৎসাহের সহিত ইহার কর্তব্য করিয়াছিল। ১৯২৪ সনের অভিজ্ঞতা হইতে সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, জাতিসংঘের সকল সভ্যরাষ্ট্র সমানভাবে সালিশ-ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ছিল না। জেনেভা খসড়ার ন্যায় সমগ্র জাতিসংঘের গ্রহণীয় চুক্তির পরিবর্তে কতকগুলি দ্বৈরাষ্ট্রিক ও বহুরাষ্ট্রিক সন্ধির ব্যবস্থার পক্ষে অনেকে মত প্রকাশ করিল। ইহার দ্বারা অপেক্ষাকৃত উন্নতরাষ্ট্রগুলি তাহাদের সকল বিবাদের জন্য সালিস ব্যবস্থা সংক্রান্ত চুক্তি করিবে; অপরপক্ষে, অপেক্ষাকৃত কম উন্নতরাষ্ট্রগুলি কেবলমাত্র আইন সংক্রান্ত বিবাদে সালিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য স্বীকৃত হইবে। যাহারা বাধ্যতামূলকভাবে সালিশ ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক তাহারা পারস্পরিক বোঝাপড়া দ্বারা বা অন্যপ্রকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিবে। এই কমিটি বিভিন্ন প্রকারের ১০টি আদর্শ-চুক্তির খসড়া ১৯২৭ সনের পরিষদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল।

অনেক মালমশলা হাতে পাইয়া পরিষদ আদর্শ চুক্তি (Model treaty) ও সাধারণ চুক্তির (general convention) ভাল অংশগুলি লইয়া একটি নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি করিল। তিনটি শ্রেষ্ঠ খসড়া লইয়া একটি 'আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য সাধারণ আইন'-এর প্রথম তিনটি অধ্যায় রচিত হইল। প্রথম অধ্যায়ে বলা হইল যে, এই আইন গ্রহণকারী এক একজোড়া রাষ্ট্র একটি স্থায়ী মিটমাটের কমিশন গঠন করিবে, যাহার কার্য হইবে তাহাদের বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা, তবে ইহা গ্রহণ করার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইল যে, আইন সংক্রান্ত সকল বিবাদ আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী আদালতের নিকট পেশ করা হইবে এবং এই আদালতের রায় মানিয়া লইতে উভয়পক্ষ বাধ্য থাকিবে। তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইল যে, আইন সংক্রান্ত বিবাদ ছাড়া অন্যান্য বিবাদ একটি সালিস-সভার নিকট আনীত হইবে, এবং মতভেদের ক্ষেত্রে ইহার সভাপতি আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী আদালত কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইল যে, জাতিসংঘের সভ্যগণ উপরোক্ত অধ্যায়গুলির একটি বা একাধিক অধ্যায় গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইচ্ছা করিলে তাহারা কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর বিবাদ এই আইনের আওতার বাহিরে রাখিতে পারিবে।

যদিও নূতন পরিকল্পনাটিকে সকলের গ্রহণযোগ্যরূপে নমনীয় করা হইয়াছিল তথাপি ইহা বিফল হয়। প্রথম অধ্যায়ের নিজস্ব কোন মূল্য ছিল না বলিয়া সকলে মনে করিল যুদ্ধের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের মধ্যে এবং লোকার্ণো সন্ধির দ্বারা জার্মানী ও তাহার প্রতিবেশীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত সন্ধিগুলিতে মিটমাটের সভা (Conciliation Commission) গঠনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ইহা কোন কাজে লাগান হয় নাই। স্থায়ী আদালতের আইনের (Statute) ঐচ্ছিক ধারাটি গ্রহণের দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। তৃতীয় অধ্যায়টি জেনেভা খসড়াটি গ্রহণের পথে একটি প্রধান অন্তরায়ের পুনর্সৃষ্টি করিয়াছিল মাত্র। ১৯২৮ সনের পরিষদ কর্তৃক 'সাধারণ আইন'টি অনুমোদিত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র বেলজিয়াম, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও ফিনল্যাণ্ড ইহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং হল্যাণ্ড ও সুইডেন মাত্র প্রথম অধ্যায় দুইটি মানিয়া লইয়াছিল।

প্যারিসের চুক্তি :

১৯২৮ সনের পরিষদের অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বে প্যারিস শহরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্যারিসের চুক্তি বা Briand Kellogg Pact স্বাক্ষরিত হয়। ইহা দুঃখের বিষয় যে, ইউরোপে এই চুক্তিটি যত উল্লাসের সহিত সম্বর্ধিত হইয়াছিল জাতি সংঘকে সেইরূপ সম্বর্ধনা কখনও জানান হয় নাই। ১৯২৭ সনেব পরিষদে, সমস্ত যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং ইহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। তবে ঐতিহাসিক দিক হইতে প্যারিসের চুক্তির উৎস ছিল ভিন্ন। ১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় নীতির অস্ত্রহিসাবে যুদ্ধকে বর্জন করিয়া একটি চুক্তি করিবার জন্য ব্রিয়াণ্ড যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা মোটেই ছিল না বলিয়া এইরূপ চুক্তির কোন কাযকরী অর্থ ছিল না, তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু হিসাবে এই চুক্তির সাহায্যে ফ্রান্সের সম্মান নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইতে পারিত এবং ঐজন্যই আমেরিকার মন্ত্রী কেলগ অনেক বিলম্বের পর উত্তর দিলেন যে এই চুক্তি সকল জাতির গ্রহণযোগ্য করিয়া রচিত হওয়া উচিত। কালক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯২৮ সনের ২৭শে আগষ্ট, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, জাপান, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লাভাকিয়া, বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলি ও ভারতের প্রতিনিধিগণ প্যারিসে মিলিত হইয়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলিকেও এই চুক্তি গ্রহণ করিতে বলা হয়। এই চুক্তিদ্বারা যুদ্ধের সময় অহিংস নীতি অবলম্বনের কথা বলা হয় নাই। চুক্তির আগেই রচয়িতারা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে এই চুক্তি বর্জন করে নাই। বৃটেন আরও জানাইল যে পৃথিবীর কতগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্বাধীনতা ও মঙ্গল তাহাদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এই অঞ্চলগুলি রক্ষা করিবার অধিকার তাহার আত্মরক্ষাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে Monroe নীতির লঙ্ঘণে বাধা দিবার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনকে তাহার আত্মরক্ষা অধিকার বলিয়াও মানিয়া লইতে হইবে। এই চুক্তির চেহারাটি এই সকল ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার নিজের কার্যের একমাত্র বিচারক হইল। এই চুক্তির আইনগত ব্যাখ্যা করার বা ইহাকে কার্যকরী করার জন্য কোনরূপ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় নাই।

অসম্পূর্ণ হইলেও প্যারিসের চুক্তি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রায় সমস্ত বিশ্বের গ্রহণযোগ্য প্রথম রাজনৈতিক চুক্তি ছিল ইহাই। Monroe নীতির পুনর্ঘোষণার ফলে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বোলাভিয়া এবং সালভাডর এই চুক্তি গ্রহণ করে নাই। কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল রাষ্ট্রই ইহা মানিয়া লয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন কিছুকাল ইতস্ততের পর অত্যন্ত উৎসাহের সহিত প্যারিস চুক্তির চরম অনুমোদনের পূর্বেই ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্য তাহার প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটি বিশেষ চুক্তি সম্পন্ন করে। মোট ৬৫টি রাষ্ট্র (জাতিসংঘের সভ্য সংখ্যা অপেক্ষা সাতটি অধিক) এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। সম্ভবতঃ, এই চুক্তির প্রয়োজনীয়তায় অবিশ্বাসী অথচ সকল রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক এরূপ কতগুলি দেশ ইহাকে মানিয়া লইয়াছিল। শীঘ্রই জাপান পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বনের মুখোস পরিয়া এবং ইটালী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অজুহাতে এই চুক্তি লঙ্ঘন করে। ইহা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতি আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার সহজ এবং আইনসঙ্গত উপায় হিসাবে যুদ্ধ-বর্জন নীতি ঘোষণা করিতে যে প্রস্তুত ছিল—চুক্তির এই তাৎপর্য অস্বীকৃত হইল না। চুক্তিটির আমেরিকান প্রস্তাবকগণ যুদ্ধকে বে-আইনী বলিয়া অভিহিত করার ফলে যুদ্ধকে অপরাধরূপে ঘোষণাকারী একটি সর্বজন-গৃহীত অলিখিত আইনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। যদিও চুক্তি-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দিবার জন্য অথবা চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না, তথাপি বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ-বিরোধী নীতিটি একটি বিশেষস্থান অধিকার করিল। প্যারিস-চুক্তির প্রতি সম্বর্ধনা জাতিসংঘের নিকট 'যুদ্ধং দেহি'-রূপে দেখা দিল। জাতীয় নীতির অস্ত্র হিসাবে যুদ্ধকে নিয়মপত্রে সম্পূর্ণ বে-আইনী ঘোষণা করা হয় নাই। কিন্তু যেহেতু এই চুক্তির দ্বারা জাতিসংঘের প্রায় সকল সভ্যই যুদ্ধবর্জন নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই হেতু এই নূতন দায়িত্বকে নিয়মপত্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য একটি দাবীর সৃষ্টি হইল। ফলে ১৯২৯ সনে বৃটিশ প্রতিনিধিগণ নিয়মপত্রের সংশোধনের জন্য পরিষদের নিকট কতকগুলি প্রস্তাব আনয়ন করেন।

কিন্তু ব্যাপারটি কঠিন ছিল। প্যারিসের চুক্তিটি ছিল একটি নৈতিক ঘোষণা, অপর পক্ষে নিয়মপত্রটি একটি রাজনৈতিক সন্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। চুক্তিটি সকল যুদ্ধকেই নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও শাস্তি

দিবার ব্যবস্থা করে নাই, অপরপক্ষে নিয়মপত্র কতকগুলি যুদ্ধকে স্বীকার করে, কতকগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে শাস্তিরও ব্যবস্থা করিয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির দুইটি ব্যবস্থাকে একত্রীভূত করা অসম্ভব ছিল। বৃটিশ প্রতিনিধিদের প্রস্তাব ছিল সকল যুদ্ধ নিষিদ্ধ করিয়া এবং প্যারিস চুক্তির লঙ্ঘণ শাস্তির যোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিয়মপত্রটি আরও শক্তিশালী করা। ফরাসী প্রতিনিধিরা সানন্দে ইহা মানিয়া লইল কারণ ইহার দ্বারা অধিকতর নিরাপত্তার সৃষ্টি হইবে। ইহার প্রধান অন্তরায় ছিল ২৭নং ধারার সাহায্যে অনিচ্ছুক রাষ্ট্রগুলির উপর যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়ার ভয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার এই অন্তরায় সমর্থন করিল না। সুতরাং সংশোধনের প্রস্তাবগুলি পাশ করিয়া লওয়া সহজসাধ্য বলিয়া মনে হইল।

১৯৩০ সনের পরিষদের অধিবেশন পর্য্যন্ত কমিটিতে ইহার আলোচনা স্থগিত রাখা হইল এবং ইতিমধ্যে সন্দেহের ধূম্রজাল ছড়াইয়া পড়িল। প্রধান আপত্তি আসিল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও জাপানের নিকট হইতে। তথাপি প্রস্তাবগুলি ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিত। কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত সংশোধনগুলির চরম অনুমোদনলাভ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এইজন্যই পরবর্তী পরিষদের অধিবেশনের সময় পর্য্যন্ত ইহার আলোচনা স্থগিত রাখা হইল। ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটেনে অর্থসঙ্কট ও সরকারের পরিবর্তন দেখা দেয়। আশাবাদের কাল শেষ হইল এবং সংশোধন প্রস্তাবগুলির কথা আর শোনা গেল না।

১৯২২ সনে অধিকতর নিরাপত্তার সন্ধানে জাতিসংঘের মাধ্যমে যে চেষ্টার আরম্ভ হয় ১৯৩৪ সনের বৃটিশ প্রতিনিধিদের নিয়মপত্র-সংশোধনের প্রস্তাবই ছিল ইহার শেষ অধ্যায়। ১৯৩৪ সনের গ্রীষ্মকালে বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সাধারণ আইনের (The General Act) অনুমোদন এবং 'যুদ্ধনিরোধের উপায় সংক্রান্ত চুক্তি' (Convention to Improve the Means of Preventing War) পরিষদে স্বাক্ষরিত হইলেও পূর্বের উৎসাহ আর ফিরিয়া আসিল না। ১৯৩০ সনের পরিষদের কার্য্যকালই ছিল নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশাবাদের শেষ সময়।

ইয়ং পরিকল্পনা (The Young Plan):

যুদ্ধোত্তর ইতিহাসে আশাবাদ ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল ডস্

পরিকল্পনা ও লোকার্ণো চুক্তির ফলে ফরাসী-জার্মান সম্পর্কের উন্নতির দ্বারা ষ্ট্রেসম্যান, ব্রিয়াণ্ড এবং চেম্বারলেন লোকার্ণো চুক্তির সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২৯ সন পর্যন্ত তাঁহাদের নিজ দেশে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ইউরোপের শান্তি বজায় রাখিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। জাতিসংঘ কাউন্সিল ও পরিষদের অধিবেশনের মাধ্যমে এই ত্রয়ীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিবার সুযোগ দিয়া যথার্থই প্রশংসার কার্য করিয়াছিল।

যদিও ফরাসী-জার্মান সমস্যা সেই সময়ের জন্য ধামাচাপা পড়িয়াছিল, কিন্তু ইহা কখনই বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া যায় নাই। ১৯২৬ সনের পরিষদে যখন জার্মানী জাতিসংঘে প্রবেশলাভ করে, সেই সময় থয়রী নামক স্থানে মিলিত হইয়া ব্রিয়াণ্ড ও ষ্ট্রেস্‌ম্যান তাহাদের উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ বিষয়গুলি লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়া একটি সাধারণ মীমাংসায় উপনীত হইবার চেষ্টা করেন। যদিও এই আলোচনার প্রকৃতি সম্বন্ধে সরকারীভাবে কিছুই ব্যক্ত করা হয় নাই, তথাপি ইহা বুঝা গিয়াছিল যে ষ্ট্রেস্‌ম্যান রাইন অঞ্চল হইতে অবিলম্বে সৈন্যাপসরণের জন্য ও জার্মানীকে সার অঞ্চল প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করেন; ইহার পরিবর্তে তিনি ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে স্বীকার করিলেন এবং ব্রিয়াণ্ড ব্যক্তিগতভাবে ইহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী সরকার ইহাতে রাজী হইল না। ইহা সত্ত্বেও ফরাসী-জার্মান সম্পর্কের তৎক্ষণাৎ কোন অবনতি ঘটিল না। ডিসেম্বর মাসে জার্মানীতে মিত্রপক্ষীয় সামরিক শাসনের অবসানের প্রস্তাবে সকলে একমত হইল এবং ১৯২৭ সনের ৩১শে জানুয়ারী আন্তমিত্র কমিশন উঠাইয়া লওয়া হইল।

পরবর্ত্তী দুই বৎসর কালের ফরাসী-জার্মান সম্পর্কের ইতিহাসে রাইন অঞ্চল ও ক্ষতিপূরণ সমস্যাই প্রধান বিষয় বস্তু ছিল। ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী রাইন অঞ্চলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল,—সন্ধিটি কার্য্যকরী হইবার পর যথাক্রমে ৫, ১০ ও ১৫ বৎসরের মধ্যে এই বিভাগগুলি অধিকার-মুক্ত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। প্রথম বিভাগটি নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মাস পরে, অর্থাৎ ১৯২৫ সনের শেষভাগে, মুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগদ্বয় যথাক্রমে ১৯৩০ ও ১৯৩৫ সনে মুক্ত হইবার কথা ছিল। কিন্তু সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় অবিলম্বে রাইন অঞ্চল মিত্রপক্ষের অধিকার

হইতে মুক্ত করিবার জন্য ও ১৯৩৫ সনে গণভোটের অপেক্ষা না করিয়া সার জার্মানীকে অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ফ্রান্সকে প্রভাবিত করা জার্মানীর প্রধান লক্ষ্য হইল। একটি নূতন ক্ষতিপূরণ-চুক্তির বিনিময়ে এই সকল সুবিধা লাভ করিবার আশা স্ট্রেস্ম্যান তখনও পোষণ করিতেছিলেন। ডস্ পরিকল্পনা সাময়িক ভাবে গৃহীত হইয়াছিল। উভয় পক্ষের স্বার্থেই জার্মানীর দায়ের একটি সুমীমাংসার একান্ত প্রয়োজন ছিল; এবং যখন দেয় টাকা নিয়মিতভাবে শোধ করা হইতেছিল, তখন ডস্ পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্মান অর্থব্যবস্থার উপর মিত্রপক্ষের যে অন্যায় কর্তৃত্ব ছিল তাহার অবসানের জন্য জার্মানী আশান্বিত ছিল।

কালে কালে বৃটেন রাইন অঞ্চলের অধিকারের অবসানের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, এবং এমন কি ফরাসীরাও রাইন অধিকারকে ক্ষতিমূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ১৯২৮ সনে, পরিষদের অধিবেশনের সময় জার্মানী ও পাঁচটি বৃহৎ শক্তির প্রতিনিধিগণ রাইন অঞ্চল শীঘ্র ত্যাগ করিবার জন্য আলোচনা আরম্ভ করিতে এবং ক্ষতিপূরণ সমস্যার একটি নিশ্চিত পূর্ণ সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি সভা গঠিত করিতে একমত হইলেন। ফরাসী সরকার অবশ্য ইহা প্রথমেই পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন যে, ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানের পরেই রাইন ত্যাগ করিবার প্রশ্ন আলোচিত হইবে।

১৯২৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিসে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সভা বসে। জেনেভা চুক্তি-স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রত্যেকটি হইতে এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে দুইজন করিয়া বিশেষজ্ঞ লইয়া এই সমিতি (Committee) গঠিত হইয়াছিল। Owen Young নামক আমেরিকান বিশেষজ্ঞকে সভাপতি করিয়া এই সমিতি গঠিত হয়; এবং তাঁহার নাম অনুযায়ী ইহা ইয়ং কমিটি নামে পরিচিতি লাভ করে। চারি মাস আলোচনা চালাইবার পর ১৯২৯ সনের ৭ই জুন ইহা 'ইয়ং পরিকল্পনা' নামে একটি ব্যবস্থা তাহাদের সরকারগুলির নিকট পেশ করে।

ইয়ং কমিটি স্থির করিয়াছিল যে ১৯৮৮ সনের মধ্যে ৩৭টি বাৎসরিক কিস্তিতে মোট ১০ কোটি পাউণ্ড এবং পরে ২২টি বাৎসরিক কিস্তিতে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া মিত্রদের নিকট যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য যুদ্ধ ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। ডস্ পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্মানীর উপর যে বৈদেশিক কর্তৃত্ব আরোপিত ছিল তাহা উঠাইয়া লওয়া হইল।

এই অর্থ স্থানান্তর করণের দায়িত্ব উত্তমর্ণদের পরিবর্তে জার্মানীর উপর ন্যস্ত হইল। মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত অসুবিধার বিরুদ্ধে স্থির হইল যে, প্রত্যেক বাৎসরিক কিস্তি-টাকার একতৃতীয়াংশ শর্তহীন দায় হিসাবে গণ্য করা হইবে, এবং বিনিময়ের অসুবিধা সৃষ্টি হইলে জার্মানী দুই বৎসর পর্যন্ত এই বাকী টাকার স্থানান্তরকরণ বন্ধ রাখিতে পারিবে। ইহা ছাড়া, ক্ষতিপূরণের অর্থের গ্রহণ ও বণ্টনের জন্য, শর্তহীন বাৎসরিক কিস্তির উপর আন্তর্জাতিক ঋণপত্র ছাড়ার জন্য, এবং একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ চালাইবার জন্য একটি "আন্তর্জাতিক নিষ্পত্তির ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হইয়াছিল।

বিশেষজ্ঞদের বিবরণী অনুমোদনের জন্য ১৯২৯ সনের আগষ্ট মাসে হেগে একটি সভা বসে। অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার পর ইয়ং পরিকল্পনা গৃহীত হয়। জার্মানীর পক্ষ হইতে এই পরিকল্পনা অনুমোদনের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করা হয় নাই: আপত্তি উঠিয়াছিল বৃটেনের পক্ষ হইতে। কিছু দিন যাবৎ, আন্তর্জাতিক প্রশ্নের ব্যাপারে বৃটিশ নীতি ফরাসী দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে যথেষ্টরূপে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল, এবং ইয়ং কমিটির বৃটিশ বিশেষজ্ঞগণ ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। পরিকল্পনাটি ফ্রান্সের নিকট গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য বৃটেনের ক্ষতি সত্ত্বেও ফ্রান্সকে দেয় (১৯২০ সনের Spa চুক্তির দ্বারা) ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বাড়াইয়া দিতে বৃটিশ বিশেষজ্ঞগণ রাজী হইয়াছিলেন। শর্তহীন বাৎসরিক কিস্তিগুলির তিন-চতুর্থাংশের বেশী ফ্রান্সকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়; এবং শর্তযুক্ত কিস্তির টাকা স্থানান্তর করা না হইলে বৃটেনের ত্যাগের বিনিময়ে যদিও কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তথাপি এই ব্যবস্থাগুলি জটিল ও অসন্তোষজনক ছিল। হেগ সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধি স্নোডেন্ ফরাসীদিগকে কোনরূপ সুবিধা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; তিনি Spa-চুক্তি অনুযায়ী চলিতে চাহিয়াছিলেন। এই বিরোধিতার ফলে তাঁহার অধিকাংশ দাবীই মানিয়া লওয়া হয়, এবং ইয়ং পরিকল্পনার সংশোধনের জন্য সুপারিশ করিয়া সম্মেলন ইহার কার্য্য শেষ করে।

ইতিমধ্যে সম্মেলনের রাজনৈতিক কমিশনের মাধ্যমে স্ট্রেসম্যান, ব্রিয়াণ্ড ও হেণ্ডারসন (বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী) রাইন অঞ্চলের মুক্তি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চালাইতে থাকেন। বৃটেনে শ্রমিক সরকার গঠিত হওয়ার ফলে রাইন অধিকার ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়, এবং বৃটিশ

সৈন্যদিগকে সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া হেণ্ডারসন্ যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার ফলে এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইল যে, ১৯৩০ সনের ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণকে রাইন অঞ্চল হইতে অপসারিত করা হইবে (সকলে ধরিয়া লইয়াছিল যে ঐ সময়ের মধ্যেই ইয়ং পরিকল্পনা চালু হইয়া যাইবে)।

ইহার পর আর কোন বিঘ্নের সৃষ্টি হয় নাই। ইয়ং কমিটির প্রধান জার্মান বিশেষজ্ঞ শাখ্ট এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, এত টাকা দেওয়া জার্মানীর পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু, ইহা তেমন আমল দেওয়া হয় নাই। ১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাসে, কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য, এবং হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত কয়েকটি ছোটখাট বিষয়ের মীমাংসার জন্য হেগে দ্বিতীয় অধিবেশন আহ্বান করা হইল। ১৭ই মে হইতে ইয়ং পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইল, এবং ইহার ৬ সপ্তাহ পরে, মিত্র সৈন্যদের শেষ দল জার্মানী পরিত্যাগ করিল।

শান্তি প্রতিষ্ঠার যুগে রাইন অঞ্চল ত্যাগ এবং ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানই ছিল শেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অষ্টিন চেম্বারলেন্ ১৯২৯ সনের মে মাসে রক্ষণশীল সরকারের সহিত পদত্যাগ করেন, এবং অক্টোবর মাসে স্ট্রেস্ম্যানের মৃত্যু হয়। প্রায় এই সময়েই নিউইয়র্কের স্টক্ এক্সচেঞ্জে ভীতির সৃষ্টি হয়। যে অর্থনৈতিক সংকটের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল তাহা ইউরোপে তখনও সকলের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এবং আরও কয়েক মাস যাবৎ সমস্ত বিশ্ব মূর্খের ন্যায় দিন কাটাইতে লাগিল। ১৯৩০ সনের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত লণ্ডনে একটি সফল নৌ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ঐ বৎসর গ্রীষ্মকালে ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার জন্য ব্রিয়াণ্ড একটি প্রস্তাব করেন, এবং জাতিসংঘের পরিষদ এই প্রস্তাবটি একটি কমিটির নিকট প্রেরণ করে ; কিন্তু শীঘ্রই সকলের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। ১৯৩০ সনে পরিষদের অধিবেশনকালে জার্মানীর লোক-সভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয় ; এবং এ্যাডলফ্ হিট্লার কর্তৃক পরিচালিত অজ্ঞাত 'নেশনাল সোসালিষ্ট' অথবা নাজি দল কর্তৃক ১০০টি আসন লাভের ফলে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইল। ডিসেম্বর মাসে নিরস্ত্রীকরণ সভার প্রস্তুতিকরণ সমিতির একটি খসড়া-চুক্তি প্রকাশ করা হইলে ইহার প্রায় সকল ধারা সম্পর্কেই তিক্ত মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। ১৯৩১ সনের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ এক বিরাট সংকটের কবলে পতিত হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

সংকট কাল (আবার শক্তির দ্বন্দ্ব)

(১৯৩০—৩৩)

অষ্টম অধ্যায়

অর্থনৈতিক সংকট

১৯৩১ সনে যে অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার কারণ লইয়া অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে এখনও মত বিরোধ আছে। ১৯১৯ সনের শরৎকালে ইউরোপকে আমেরিকা ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিলে এই সংকটের আন্তর্জাতিক প্রকাশ সকলের দৃষ্টিগোচর হয়; বিশ্বের সর্বত্র ক্রয়-ক্ষমতা দ্রুত গতিতে হ্রাস পাইতে থাকে, এবং ফলে দ্রব্য-মূল্য ভয়ানক ভাবে কমিয়া যায়। ইহার দ্বারা ইউরোপীয় দেশগুলি দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহারা আমেরিকার নিকট হইতে আর ডলার ঋণ লইয়া ধার শোধ করিতে পারিল না; উপরন্তু, যে সকল দ্রব্যের সাহায্যে তাহারা এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত সেইগুলির মূল্য অসম্ভবরূপে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩০ সনে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ ও ঋণের টাকা অধিকাংশ স্বর্ণের হস্তান্তরকরণ দ্বারা শোধ করা হইয়াছিল; কিন্তু ইহার ফলে অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। প্রথমতঃ, ইউরোপ হইতে আমেরিকায় এত স্বর্ণ রপ্তানী হওয়ার ফলে ইউরোপে স্বর্ণের ভয়ানক অভাব দেখা দেয়, এবং ফলে দ্রব্যাদির মূল্য আরও কমিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছিল সেই সকল দেশ স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইল; ১৯৩১ সনের মধ্যে ইউরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহা ছাড়া, এই দেশগুলি তাহাদের কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এবং সুবিধাজনক বাণিজ্য-উদ্‌বৃত্ত বজায় রাখিবার জন্য শুল্ক বৃদ্ধি, আমদানীতে বাধা, রপ্তানীতে সুবিধা দান ও বিনিময়ে বাধা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। ফলে, ব্যবসায়ে স্বাভাবিকগতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইল, বেকার সমস্যা দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি পাইল; ইউরোপের অর্ধেক দেউলিয়া হইল, এবং অপর অর্ধেক দেউলিয়া হওয়ার ভয়ে ভীত হইল।

জার্মানীর সংকট:

কয়েকটি কারণের জন্য জার্মানীর অবস্থা বিশেষরূপে সঙ্গীন হইয়াছিল।

জার্মানী ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণগ্রস্ত, এবং ইতিপূর্ব্বে পাঁচ বৎসরে এই রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। ডস্ পরিকল্পনার দ্বারা জার্মানী একটি মিতব্যয়ী ও সাবধানী আর্থিক নীতি অনুসরণ করিতে উৎসাহিত বোধ করে নাই; এবং অভাবের সময়ে অকুণ্ঠভাবে ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। ডস্ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে জার্মানী ৫০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিয়াছিল এবং ৯০ কোটি পাউণ্ড বিদেশী ঋণ পাইয়াছিল। ইহার উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্র, মিউনিসিপ্যালিটি এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ পুনর্গঠনের কাজে ব্যয় করে। যেহেতু স্বল্পকালীন ঋণের সাহায্যে ঘাটতির পূরণ সম্ভব ছিল, সেইজন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজেট তৈরী করিবার জন্য কোনরূপ বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় নাই। জার্মানীর সরকারী ও বেসরকারী অর্থ ব্যবস্থা ঋণের টাকার স্রোতে ভাসিতে ছিল।

সুতরাং, এই অর্থসংকট জার্মানীকে সহজেই ধরাশায়ী করিল। এই সর্বপ্রথম, বৈদেশিক ঋণের সাহায্য হারাইয়া জার্মানী বাৎসরিক ১০ কোটি পাউণ্ডের ক্ষতিপূরণ ঋণ, বিদেশের নিকট প্রায় ঐ অঙ্কের সরকারী ও বেসরকারী অন্যান্য দায়, এবং ৮ কোটি পাউণ্ডের বাজেট-ঘাটতির সম্মুখীন হইল। দেশে এমন কোন আভ্যন্তরীণ ধন-সংস্থান ছিল না যাহার উপর নির্ভর করা যাইত, কারণ ১৯২৩ সনের মুদ্রা-স্ফীতির ফলে দেশের সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষিত হইয়াছিল। সরকারের সাহায্যের জন্য আসিবার মত অবস্থা জার্মানীর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ছিল না। বিদেশী ক্রেডিট হারাইবার ফলে এবং বিশ্বব্যাপী মন্দা ও শুল্ক-প্রাচীর সৃষ্টির ফলে ইহাদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়াছিল। জার্মানীর রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ১৯২৯ সনে ৬৩ কোটি পাউণ্ড হইতে ১৯৩২ সনে ৫০ কোটি পাউণ্ডে নামিয়া আসিল, এবং আমদানী দ্রব্যের মূল্য ঐ সময়ের মধ্যে ৬৭ কোটি পাউণ্ড হইতে ২৩ কোটি পাউণ্ডে নামিয়াছিল। পঞ্জীভুক্ত বেকারদের সংখ্যা ১৯২৯ সনে ২০ লক্ষ হইতে ১৯৩২ সনের মার্চ মাসে ৬০ লক্ষে পরিণত হইল।

যে দেশে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল উদ্বেগকারক সেই দেশে এই অর্থনৈতিক সংকটের কতগুলি সাংঘাতিক ফল দেখা দিয়াছিল। ১৯৩০ সনের মার্চমাসে জার্মানীতে যে সরকার গঠিত হইল, Weimar প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম তাহাতে কোন Social Democrat (সমাজতন্ত্রী-গণতান্ত্রিক) ছিল না। পরের মাসে, মন্দা প্রতিরোধ করিবার জন্য সমস্ত

শুল্ক বৃদ্ধি করা হইল, এবং কৃষকদিগকে সাহায্য দেওয়া হইতে লাগিল। ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচনে নাজীরা Reichstag (লোকসভা)-এ তাহাদের আসনের সংখ্যা ১২ হইতে ১০৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিল। যদিও পূর্বের মন্ত্রীসভা অপরিবর্তিত রহিল, তথাপি গণতন্ত্রের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং Weimar শাসনতন্ত্রের মূলনীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রেসিডেন্টের অনুশাসনের সাহায্যে বহুমাস যাবৎ জার্মানীর শাসন ব্যবস্থা চলিতে লাগিল।

ব্রিয়াণ্ডের পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য ১৯৩০ সনে জাতিসংঘ কর্তৃক যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৩১ সনের জানুয়ারী মাসে। যদিও ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, তথাপি সেই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতা; এবং এই জন্যই এই কমিটি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবস্থিত বাণিজ্য প্রাচীরগুলিকে নীচু করিতে চেষ্টা কবিল। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। তথাপি এই আলোচনার ফলে অন্য একটি ক্ষেত্রে নূতন একটি চিন্তাধারার সৃষ্টি হইল। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী Curtius এবং অষ্ট্রীয়ার Chancellor তাহাদের উভয় দেশের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক Union গঠন করিবার জন্য গোপনে মত প্রকাশ করেন। ২১শে মার্চ সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ের সঙ্গে জানিল যে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী তাহাদের মধ্যে একটি শুল্ক union গঠন করিয়াছে এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ইহাতে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করা যাইবে।

যদিও ১৯৩০ সনের সাধারণ পরিষদে ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের সমর্থনকারীরা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক চুক্তি-নীতির প্রশংসা করিয়াছিলেন, তথাপি অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর এই শুল্ক ইউনিয়ন ফ্রান্স ও Little entente-র পক্ষে মোটেই আনন্দের ছিল না। একটি বৃহৎ ও একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শুল্ক ইউনিয়নের ফলে সাধারণতঃ ক্ষুদ্ররাষ্ট্রটি স্বাধীনতা হারাইয়া থাকে। সুতরাং অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। ইহা ছাড়া, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ায় চেকোস্লোভাকিয়ার বাজার ছিল বলিয়া তাহার পক্ষে এই ইউনিয়নের বাহিরে থাকা সম্ভব ছিল না। অন্যান্য দানিউবীয় শক্তিও এই পথ অনুসরণ করিতে পারিত এবং ফলে, জার্মানী সমগ্র দানিউবীয় অববাহিকায় উত্তর কালে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত। সুতরাং ইহাতে বাধা দিতে ফ্রান্স ও তাহার মিত্রবর্গ যথাসর্বস্ব পণ করিল। ইহার জন্য

আইনগত অজুহাত পাওয়া গেল ভার্সাইসন্ধিতে ১৯২২ সনের ঋণ গ্রহণের খসড়ার মধ্যে যেখানে উল্লেখ ছিল যে, অষ্ট্রিয়া এরূপ কোন অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে না যাহার ফলে তাহার স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইতে পারে।

বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি দুর্বোধ্য ছিল। সাধারণভাবে, দানিউবীয় অববাহিকায় শুল্ক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইলে বৃটেনের লাভই হইত। শুল্ক ইউনিয়নের ফলে তাহার স্বার্থের ক্ষতির কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে এই পরিকল্পনার দ্বারা মধ্য ইয়োরোপে যুদ্ধ না বাধিলেও অন্ততঃ রাজনৈতিক গোলযোগের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, এবং সন্ধির শর্তগুলিকেও অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইল না। মে মাসে, জাতিসংঘের কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে ব্যাপারটি (জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার শুল্ক ইউনিয়ন) শান্তিচুক্তি ও ১৯২২ সনের খসড়ার পরিপন্থী কিনা ইহা স্থির করিবার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী আদালতের নিকট পাঠাইল।

শেষপর্যন্ত আইনানুগ মীমাংসা দ্বারা ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হইল না। আইনের প্রশ্নটি সন্দেহাতীত ছিল না, এবং ফ্রান্স 'ইউনিয়নের' সপক্ষে রায়ের সম্ভাবনার ঝুকি লইতে প্রস্তুত ছিল না ; ইউনিয়ন ত্যাগ করিবার জন্য সে অষ্ট্রিয়াকে চাপ দিতে লাগিল, এবং এই সময়ে অষ্ট্রিয়া ভীষণ অর্থসংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল। ফলে ৩রা সেপ্টেম্বর অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ঘোষণা করিলেন যে, পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুইদিন পরে স্থায়ী আদালত ৮—৭ ভোটে গৃহীত রায়ে জানাইল যে, শুল্ক ইউনিয়নটি শান্তিচুক্তি ও প্রোটোকোলের পরিপন্থী ! বিচারকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে ছিলেন ফরাসী ইটালিয়ান, পোলিশ ও রুমানীয়ানগণ, এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে ব্রিটিশ, জার্মাণ ও আমেরিকান বিচারপতিরা ছিলেন বলিয়া রায়টি রাজনৈতিক প্রভাবদ্বারা প্রভাবিত ছিল ; এবং ফলে একটি স্বাধীন আইন সংক্রান্ত আদালতরূপে ইহার মর্যাদা ক্ষুন্ন হইল।

ইহা সমগ্র ইয়োরোপের দুর্ভাগ্যস্বরূপ ছিল। ইহার ফলে মধ্য ইয়োরোপে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক গোলোযোগের সৃষ্টি হইল। জার্মানীতে Weimar প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসের সূচনা হইল। ১৯২০ ও ১৯৩৩ সনের মধ্যে প্রত্যেক জার্মান সরকারের সম্মান ইহার বৈদেশিক নীতির সফলতা বা বিফলতার উপর নির্ভরশীল ছিল। শুল্ক ইউনিয়ন বাতিল হইয়া

যাইবার ফলে কার্টিয়াসকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়, এবং নাজীরা ভার্সাই সন্ধির অপমানের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রচারকার্যে আরও শক্তির সঞ্চার করিল।

১৯৩০ সনে সমস্ত বৎসরটি ধরিয়া সকলে ভাবিয়াছিল যে এই সকংট অস্থায়ী এবং শীঘ্রই পৃথিবী ইহার ধাক্কা সামলাইয়া লইবে। কিন্তু, ১৯৩০—৩১ সনের শীতকালে সমস্ত আশাবাদের সম্পূর্ণ নিরসন হইল, এবং অনেকেই বর্তমান সভ্যতার আসন্ন ধ্বংসের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। ১৯৩১ সনটি অত্যন্ত সংকটময় হইয়াছিল। ১৯৩১ সনের বসন্তকালে আন্তর্জাতিক দেনা—পাওনার ব্যবস্থা অচল হইল; এবং শুল্ক ইউনিয়নের বিবাদের সময়ে ইহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মে মাসে সর্বাপেক্ষা বড় অষ্ট্রিয়ান ব্যাঙ্কটি দেউলিয়া হইয়া গেল। সর্বসাধারণের ভয় নিবারণের জন্য সরকার এই ব্যাঙ্কের বিদেশী দায়গুলি সম্পর্কে গ্যারান্টি দিল; এবং ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড অবস্থার উন্নতির জন্য অষ্ট্রিয়ার স্টেট ব্যাঙ্ককে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিল।

জার্মানীতেও এই ভীতি প্রসারিত হইল। বিদেশী উত্তমর্ণগণ তাহাদের স্বল্পমেয়াদী ঋণ ফেরত নিতে লাগিল, এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে Reichsbank পাঁচকোটি পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ হারাইল। চেকোস্লোভাকিয়া ব্যতিরেকে মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে বিদেশী ঋণের টাকা পাঠানো বন্ধ হইয়া গেল। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ভয়ানকভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে ১৯২৯ সনের শেষভাগে অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেণ্টিনা স্বর্ণের প্রদান বন্ধ করিয়া দিল; এবং পরবৎসর কফির বাজারের মন্দার জন্য ব্রাজিল দেউলিয়া হইয়া ইহাদের পথ অনুসরণ করিল। এই তিনটি দেশে বৃটেনের বিরাট অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল বলিয়া ইহাদের দুর্ভাগ্যের ফল বৃটেনকেও ভোগ করিতে হইয়াছিল। পূর্বে কয়েকমাস যাবৎ ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড হইতে প্রচুর স্বর্ণ ফ্রান্সে রপ্তানী হয়, এবং ফ্রান্স সেই সময়ে ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৩১ সনের গ্রীষ্মকালে এই অবস্থা চরমে উঠে, এবং জুন মাসে দেখা গেল যে রাশিয়াকে বাদ দিয়া বিশ্বের মোট স্বর্ণের পরিমাণের শতকরা ৬০ ভাগ হয় যুক্তরাষ্ট্রে অথবা ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়াছে। আরও স্বর্ণের রপ্তানি অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইল।

এইরূপে যখন অর্থপ্রদানে সকল রাষ্ট্রেরই বাকী পড়িয়া গেল তখন মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হুভার ঘোষণা করিলেন যে, যদি বিভিন্ন সরকারের মধ্যে ঋণ-শোধ সংক্রান্ত দেনাপাওনা একবৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হয় তবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারও ইহার অধমর্ণদের নিকট হইতে সকল প্রকারের পাওনা টাকা একবৎসরের জন্য আদায় করিবে না। যদিও আমেরিকান হুণ্ডি-ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারীদিগের স্বার্থে জার্মানীর ও ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্রেডিট এবং ক্রয় ক্ষমতা পুনরায় ফিরাইয়া আনার জন্যই এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল, তথাপি হুভারের প্রস্তাবটি যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মিত্রশক্তি সরকারগুলি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার সত্যতা সহজেই মানিয়া লইতে রাজী হইল না। হুভারের প্রস্তাব সকলের মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করিল; কিন্তু ফ্রান্সই ছিল সমস্যা-সমাধানের পথে বাধা-স্বরূপ। অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ফ্রান্সের যুদ্ধ-ঋণ ছিল কম এবং ক্ষতিপূরণের আয় ছিল বেশী। জার্মানীর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পুনরুন্নয়ন অপেক্ষা ইহার ক্ষতিপূরণ প্রদান বজায় রাখার ব্যাপারে ফ্রান্সের আগ্রহ ছিল বেশী। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে একমাত্র ফ্রান্সই হুভারের প্রস্তাবে আপত্তি জানাইল। অবশেষে ফ্রান্স এই শর্তে প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছিল যে, ইয়ং পরিকল্পনার শর্তহীন বাৎসরিক কিস্তির টাকা আন্তর্জাতিক মীমাংসার ব্যাঙ্কের নিকট জার্মানী সরকারীভাবে দিবে এবং স্থগিত বাৎসরিক কিস্তিগুলির উপর সুদ হিসাব করা হইবে। এই মীমাংসায় আসিতে এক পক্ষকাল সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, এবং এই বিলম্বের ফলে হুভারের প্রস্তাব যে-আস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা কমিয়া গেল। ক্রমে সংকট আরও ভয়ানক আকার ধারণ করিল। ১৩ই জুলাই একটি বিখ্যাত জার্মান ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করিল। যদিও হুভারের ব্যবস্থা দ্বারা সেই সময়ের মত বিভিন্ন সরকারগুলির মধ্যে ঋণ পরিশোধ বন্ধ রাখা হইল, তথাপি বেসরকারী ঋণের ক্ষেত্রে কোন সমাধান পাওয়া গেল না। জার্মানীর অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, মার্কের আর হস্তান্তরকরণ হইলে কেবলমাত্র ১৯২৩ সনের বিপদেরই পুনরাবৃত্তি হইত। ফলে, বিদেশী উত্তমর্ণগণ সকল জার্মান ঋণের পরিশোধ স্থগিত রাখিলেন। ইহার জন্য লণ্ডনের অনেক বড় বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের টাকা স্বল্পমেয়াদী দায় হিসাবে জর্মানীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় ভয়ানক অসুবিধার সৃষ্টি হইল।

বৃটেনেও চরম অর্থ সংকট দেখা গেল। তেজী বাজারের দিনে, ১৯২৫ সনের

এপ্রিল মাসে বৃটেন যুদ্ধ-পূর্বহারের স্বর্ণের ভিত্তির উপর ষ্টার্লিং মুদ্রা-ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। কিছুদিন পরে ফ্রান্স, ইটালী ও আরও কয়েকটি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র তাহাদের মুদ্রার পূর্বতন স্বর্ণমূল্য হ্রাস করিয়া পুনরায় স্বর্ণমানে ফিরিয়া আসে। এইরূপে যে ফরাসী ফ্রাঙ্কের মূল্য যুদ্ধের পূর্বে ছিল ষ্টার্লিংএর $\frac{1}{25}$ ভাগ, তাহার মূল্য হইল ইহার $\frac{1}{125}$ ভাগ। ইহার ফলে এই সকল দেশ অত্যন্ত কম বিনিময়-হারে তাহাদের মুদ্রাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইউরোপের বেশীর ভাগ রাষ্ট্রে মজুরী ও উৎপাদনের অন্যান্য খরচের হার বৃটেন অপেক্ষা কম ছিল, এবং ইহাদের রপ্তানী-বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইল। বৃটেন ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্র বর্দ্ধিত শুল্কের সাহায্যে আমদানী হ্রাস করিল। ১৯২৭ সনের অর্থনৈতিক সম্মেলনে শুল্ক-বাধা দূর করিবার সুপারিশ এবং ১৯২৯ সনের বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত 'শুল্ক সন্ধি' (Tariff truce) বিশেষ কোন সমর্থন লাভ করিল না।

যতদিন সমৃদ্ধি স্থায়ী ছিল এবং বিশ্ববাণিজ্য বাড়িয়া যাইতেছিল ততদিন বৃটেনের ভালই চলিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৫-২৯ সনের তেজী বাজারে অন্যান্য বড় দেশ অপেক্ষা তাহার লাভ হইয়াছিল কম। তাহার অসুবিধাজনক বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অঙ্ক প্রতিবৎসর বাড়িয়া চলিল। ১৯৩০ সনে জার্মানী বৃহত্তম রপ্তানীকারক রাষ্ট্ররূপে সর্বপ্রথম তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল ; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অনেক বাজারে বৃটেনকে ছাড়াইয়া গেল। অর্থসংকটের সময়ে বৃটেনের অবস্থা সঙ্গীন হইল ; বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ফলে বৃটেনের বিশেষ ক্ষতি হইল, কারণ বৃটেন সর্বদাই অন্যান্য দেশকে টাকা ধার দিয়া এবং তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্য পরিবহন করিয়া প্রচুর অর্থ আয় করিত। ক্রমশই বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অসুবিধাজনক হইতে লাগিল। খাজনার আয় দ্রুতগতিতে কমিবার ফলে মানুষের আস্থা আরও কমিয়া গেল। ১৯৩১ সনের জুলাই মাসের মধ্যে বাজেটে ১০ কোটি পাউণ্ডের ঘাটতি দেখা গেল। বিদেশী উত্তমর্ণগণ ভীত হইলেন। জুলাই মাসের শেষভাগে এক সপ্তাহে বৃটেন হইতে ২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ উঠাইয়া লওয়া হইলে ফ্রান্স হইতে প্রদত্ত একটি বিরাট ঋণের সাহায্যে এই অবস্থা অল্প পরিমাণে রোধ করা হইল। ২৪শে আগষ্ট শ্রমিক সরকারের পতন হইল, এবং নবগঠিত জাতীয় সরকার করভার বৃদ্ধি করিয়া ও নানা উপায়ে খরচ কমাইয়া ৭ কোটি পাউণ্ডের বাজেট-ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য একটি পরি-

পূরক বাজেট পাশ করিল। কিন্তু নৌবাহিনীর বেতন হ্রাস করার ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় ও আবার আস্থা হ্রাস পায়; এবং ২১শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করে। কয়েকদিনের মধ্যেই ষ্টার্লিংএর মূল্য স্বর্ণের মূল্যের অনুপাতে শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়া গেল।

ষ্টার্লিং এর মূল্যহ্রাস বৃটেনের মূল্যমান বৃদ্ধি করিবার পরিবর্তে সমগ্র পৃথিবীর মূল্যমান কমাইয়া দিল। ইহার ফল বৃটেনে ভাল হইলেও বিদেশে নীচু ও লাভহীন মূল্যের দুরবস্থা আরও সঙ্গীন হইল। উপরন্তু ১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় বৃটেনের অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিত্যাগ, শিল্পজাতদ্রব্যের উপর শুল্ক আরোপণ ও বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের উপর 'Quota' ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত হইল। ১৯৩২ সনে, অটোয়া সম্মেলনে গ্রেট বৃটেন ও বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে পক্ষপাতমূলক শুল্ক ও আমদানী 'কোটা'র কতগুলি চুক্তি হয়, এবং এই চুক্তিগুলির সুবিধা বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে দেওয়া হয়না। বৃটিশ বাণিজ্যের পুনরুন্নতির জন্য এই সকল ব্যবস্থার সম্ভবতঃ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের পথে অন্যান্য জাতিগুলির ন্যায় বৃটেনের অগ্রসর হওয়ার ফলে পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সহজসাধ্য হইল না।

স্কেণ্ডিনেভিয়ার রাষ্ট্রগুলি, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক বৃটেনের প্রদর্শিত স্বর্ণমাণ পরিত্যাগের পথ অনুসরণ এই অর্থসঙ্কটের ইতিহাসের চরম অধ্যায়; ১৯১৮ সনের পরে ১৯৩১—৩২ সনের শীতকালই ছিল চরম বিপদ-কাল। ১৯ শে সেপ্টেম্বর জাপান যে সামরিক অভিযান আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার ফলে একবৎসরের মধ্যেই সে মাঞ্চুরিয়ার মালিক হইয়া বসিল। ১৯৩২ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী, জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হয়, কিন্তু ইহার সফলতা সম্বন্ধে অল্প লোকই আশা পোষণ করিয়াছিল।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাপ্তি।

ইউরোপীয় দেশগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল—(১) যে সকল দেশ অবাধে স্বর্ণ রপ্তানী করিত এবং স্বর্ণকেই মুদ্রা ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে রাখিয়াছিল, অর্থাৎ ফ্রান্স, ইটালী, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড (ইহাদিগকে স্বর্ণদল বলা হইত); (২) যে সকল দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছিল—বৃটেন, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড ও

এস্থোনিয়া (ইহাদিগকে স্টার্লিং দল বলা হইত), ও ইহাদের সঙ্গে স্পেন, পর্তুগাল ও গ্রীস ; (৩) এবং যে সকল দেশ স্বর্ণের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছিল।

জার্মানী ছিল এই শেষ শ্রেণীর। এই সময় Reichsbank-এর মাধ্যমে জার্মান সরকার জার্মানীর সকল বিদেশী মুদ্রার উপর একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছিল। ফ্রান্স দাবী করিয়াছিল যে অন্যান্য বৈদেশিক দেনা শোধ করিবার পূর্বে ইয়ং পরিকল্পনার শর্তহীন বাৎসরিক কিস্তির টাকা হস্তান্তর করিতে জার্মান সরকার বাধ্য ছিল। ইহার উত্তরে বৃটেন জানাইল যে, যেহেতু প্রয়োজনীয় আমদানী দ্রব্যের জন্য জার্মানীকে সর্বপ্রথম পয়সা দিতে হইবে, এবং যেহেতু শোধ করার পূর্বেই তাহার বাণিজ্যক ঋণ পরিশোধ করার প্রয়োজন ছিল সেই হেতু ফরাসী-দাবী অর্থহীন। ১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাসে Hoover Moratorium-এর মেয়াদ শেষ হইল, এবং ব্রুনিং ঘোষনা করিলেন যে, কোন অবস্থায়ই জার্মানী পুনরায় ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করিবে না। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রভাবের ফলেই ব্যাপারটি এইরূপ দাঁড়াইল। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে নাজীরা যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল তাহা ক্রমশই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল ; সুতরাং ক্ষতিপূরণ পরিশোধের প্রশ্নে কোন সরকারের পক্ষেই স্বদেশের স্বার্থের বিরোধিতা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং, এই অবস্থায় ১৯৩২ সনের ১লা জুলাই তারিখ Hoover Moratorium শেষ হইবার পূর্বে মীমাংসার একান্ত প্রয়োজন ছিল। যদিও ফরাসী সরকার ভিতরে ভিতরে অবশ্যম্ভাবীকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল, তথাপি ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার মৃত্যু সরকারীভাবে ঘোষনা করিতে সাহসী হইল না। পরে, জুনমাসে লুসান নামক স্থানে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইল যে, ১৫ কোটি পাউণ্ড শতকরা পাঁচটি খালাসী (Redeemable) হুণ্ডিতে এক কিস্তিতে জার্মানী কর্তৃক পরিশোধের বিনিময়ে সমস্ত ক্ষতিপূরণ দাবী নস্যাৎ করিয়া দেওয়া হইবে। উত্তমর্ণ সরকারগুলি নিজেদের যুদ্ধ-ঋণগুলি পৃথক চুক্তিদ্বারা মকুব করিয়াছিল, এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের ঋণের সন্তোষজনক নিষ্পত্তির শর্তেই তাহারা তাহাদের প্রধান চুক্তিটি অনুমোদন করিবে বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু লুসান চুক্তির অনুমোদনের প্রয়োজনও বিশেষ ছিল না, কারণ জার্মান নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করার কথা সেই সময়ের পরিস্থিতিতে কেহ

চিন্তাও করিতে পারিত না। সেই যুগের একটি প্রধান সমস্যার চিরন্তন সমাধান অবশেষে এইরূপভাবেই হইল।

Hoover Moratorium শেষ হইলে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট মিত্রশক্তিগুলির ঋণের প্রশ্ন আবার দেখা দিল। সুখের বিষয়, ১৫ই ডিসেম্বর ছিল পরবর্তী কিস্তির টাকা দেওয়ার তারিখ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নভেম্বর মাসেইআমেরিকায় প্রেসিডেন্ট-নির্বাচন হইল। ১৯৩২ সনের শরৎকাল পর্যন্তও ইউরোপের অর্থনৈতিক সংকট চরমে উঠে নাই। গভীর হতাশার মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হইয়া গেল। Hoover Moratorium দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের কোন লাভ হয় নাই; এবং যখন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটে ৮০ কোটি পাউণ্ডের ঘাটতি দেখা গেল তখন ইউরোপের ঋণগুলি মকুব করিবার কোন প্রশ্নই উঠিল না। সুতরাং, নির্বাচনের ফল যাহাই হউক না কেন ঋণ মকুবের আবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এই অবস্থায় কিছুকাল ইতস্ততঃ করিয়া বৃটেন ডিসেম্বরের কিস্তি শোধ করিয়া দেয়। আইন পরিষদের বিরোধিতার জন্য ফ্রান্স তাহার দেয় কিস্তি শোধ করিল না, এবং অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রও তাহাদের কিস্তির টাকা বাকী ফেলিল।

ইহার পর কোন অধমর্ণ রাষ্ট্রই তাহার কিস্তির টাকা পূরাপুরিভাবে শোধ করে নাই; এবং ক্রমশঃ যুক্তরাষ্ট্রও কিস্তি আদায়ের জন্য বিশেষ তৎপরতা দেখায় নাই। ফলে, লুসান চুক্তি ইউরোপের ঋণপরিশোধ—সমস্যাটিকে ক্ষতিপূরণ সমস্যার মত কবর দিল।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন (The World Economic Conference)।

লুসানে স্থির হইয়াছিল যে, পরবর্তী বৎসর একটি সাধারণ অর্থনৈতিক সম্মেলন আরম্ভ হইবে; এবং আন্তর্মিত্র-ঋণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইবে না এই শর্তে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই সম্মেলনে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হইল। এই সম্মেলনের পূর্বে আমেরিকায় অনেক কিছু ঘটিয়া গিয়াছিল। ১৯৩২-৩৩ সনের শীতকালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-সংকট চরমে উঠে, এবং দেড়কোটি লোক বেকার হইয়া পড়ে। ১৯৩৩ সনের মার্চ মাসে ফ্রাঙ্ক্লিন্ রুজ্‌ভেল্ট্ যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, এবং পরের মাসে যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমান ত্যাগ করিলে, ডলারের মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়া যায়। এই সংকটের পরিবেশের মধ্যে ১৯৩৩ সনের জুন মাসে লণ্ডনে বিশ্ব-অর্থনৈতিক

সম্মেলন বসে। এই বিরাট সম্মেলনে ৬৪টি দেশ যোগদান করিয়াছিল। ফ্রান্স যেমন কয়েক বৎসর ধরিয়া নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল সেইরূপে এই সম্মেলনেও ফ্রান্স ও তাহার বন্ধুরাষ্ট্রগুলি মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখিবার শর্তেই শুল্কহ্রাস বা 'quota'-ত্যাগ কবিতে রাজী ছিল। বৃটিশ ও আমেরিকান প্রতিনিধিরাও মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার নমনীয়মুদ্রা-ব্যবস্থার সুবিধা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অনমনীয় মুদ্রা ব্যবস্থার পক্ষে সমর্থন জানাইতে পরিল না। এই মর্মে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির একটি ঘোষণা প্রকাশিত হইলে সম্মেলনের কাজ বানচাল হইয়া গেল। মুদ্রাব্যবস্থা স্থায়ী করিবার চেষ্টা বিফল হইল। গমের বাজার এবং রৌপ্য-মূল্য সম্বন্ধে কয়েকটি ক্ষুদ্র চুক্তি ব্যতীত এই সম্মেলনে আর কিছুই হয় নাই। সম্মেলনের কার্যাবলী হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, কোন বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক নীতির দ্বারা অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করা যাইবে না।

অর্থসংকটের শেষ অধ্যায়

প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাহীন অতীতকে—স্বল্পশুল্ক ও স্থিতিশীল মুদ্রা ব্যবস্থা —ফিরাইয়া আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবার জন্য বিশ্বঅর্থনৈতিক সম্মেলন বিফল হয়। ফলে রাষ্ট্রনায়কগণ এই সম্বন্ধে নূতন পথের সন্ধান করিতে থাকেন। যদিও অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এবং বাণিজ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নূতন বিশ্বব্যবস্থার স্থায়ী অঙ্গহিসাবে দেখা দেয় তথাপি ধীরে ধীরে একটি আশার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বৃটেনে যুদ্ধকালীন জাতীয় ঋণের সুদ শতকরা ৫ হইতে শতকরা সাড়ে তিনভাগে হ্রাস করা হইল, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৩ সালের মার্চমাসে বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি দেখা দিল এবং দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইল; ডলারের মূল্য-হ্রাস ও রুজভেল্টের 'নবনীতি' (New Deal) চালু হওয়ার ফলে অবস্থার আরও উন্নতি হইল। যে সকল দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছিল কেবল মাত্র সেই সকল দেশেই এই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই দেশগুলি পৃথিবীর সমগ্র বাণিজ্যের অর্দ্ধেকের বেশীর মালিক ছিল বলিয়া ইহাদের উন্নতির দ্বারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ধীরে ধীরে প্রভাবিত হইল। দুইটি দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বৈরাষ্ট্রিক বাণিজ্য

চুক্তি সম্পাদিত হইল। মূলধনের আন্তর্জাতিক নিয়োগ প্রকৃতপক্ষে স্থগিত হইয়া গেল, প্রত্যেক রাষ্ট্র আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত রহিল, এবং জাতিসংঘের অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি দৈনন্দিন কার্য ও গবেষণায় রত থাকিল।

পরবৎসর, বৃটেন পারস্পরিক শুল্ক-হ্রাস ও পণ্যক্রয়ের জন্য আর্জেন্টিনা, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, বাল্‌টিক রাষ্ট্রগুলি, রাশিয়া এবং পোল্যাণ্ডের সহিত চুক্তি স্থাপন করিল। ফ্রান্স, জার্মানী, এবং হল্যাণ্ড যাহাতে বৃটিশ পণ্যের বিরুদ্ধে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ না করে সেইজন্য বৃটেন ইহাদের সহিতও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি করিল। ১৯৩৪ সনে যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা সমেত বিভিন্ন আমেরিকান রাষ্ট্র ও কতগুলি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সহিত শুল্কহ্রাসমূলক চুক্তি সম্পাদন করে। স্বর্ণমানে স্থিত রাষ্ট্রগুলির সমৃদ্ধি আরও বিলম্বে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ১৯৩৪-৩৫ সনে ইটালী, পোল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম 'স্বর্ণদল' ত্যাগ করে; এবং ১৯৩৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড তাহাদের মুদ্রামূল্য হ্রাস করিলে স্বর্ণমানে স্থিত মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইল।

যদিও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, ১৯৩৩ সনে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের অবসান ঘটে। কিন্তু এই বৎসরেই আবার রাজনৈতিক আকাশে কৃষ্ণমেঘের সঞ্চার হয়।

———

নবম অধ্যায়

দূর প্রাচ্যের সংকট

চীনের অবস্থা।

১৯১১ সনের বিপ্লবের পরে চীনে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়, এবং ১৯১৯ সনের মধ্যেই ক্যাণ্টন প্রদেশ পিকিং সরকারের নিকট হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া যায়। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে সান্‌-ইয়াৎ-সেন ক্যাণ্টন সরকারের প্রধান হইলেন। তিনি বোরোডিন্‌ নামক একজন রাশিয়ানকে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন, এবং এই বোরোডিনের মাধ্যমে চীনের জাতীয়তাবাদের সহিত সোভিয়েট আন্তর্জাতিকতার একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বৃহৎ শক্তিগুলি চীনের উপর কতগুলি অসম সন্ধি আরোপ করে এবং ইহার নিকট হইতে কতগুলি বিশেষ সুবিধা আদায় করিয়া লয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে, এই সকল সুবিধার বিরুদ্ধে চীনের শিক্ষিত যুবকগণের মনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের পরে জার্মানী ও রাশিয়া চীন দেশে তাহাদের বিশেষ সুবিধা ও অধিকারগুলি হারাইলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পন্ন অসম সন্ধিগুলিরও বিলোপ সাধনের জন্য একটি প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। ওয়াশিংটন সম্মেলনে (১৯২১) এই সকল বিদেশী সুবিধা শীঘ্রই প্রত্যাহার করিবার আশা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু চীনে গৃহযুদ্ধের অজুহাতে এই আশা কার্যে পরিণত করা হয় নাই। ইহার ফলে কুওমিণ্টাং দলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় ১৯২৫ সনের মার্চ মাসে সান্‌ইয়াৎ সেনের মৃত্যু হয়, এবং বিদেশী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চীনের জাতীয় বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবে তাঁহার নাম অমরত্ব লাভ করে। বোরোডিনের নির্দেশে চীনের বিদেশী-বিরোধী আন্দোলন প্রধানতঃ বৃটেনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। ১৯২৫ সনে সাংহাই নগরীতে জাপানী কাপড়ের মিলে শ্রমিকদের দুরবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী একদল চীনা ছাত্রের উপরে বৃটিশ পুলিশকর্মচারীরা গুলি বর্ষণ করিলে ও কয়েক সপ্তাহ পরে ক্যাণ্টনের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে

এইরূপ গুলিবর্ষণের আর একটি ঘটনা ঘটিলে সমগ্র চীন দেশে একটি বিরাট বৃটিশ-বিদ্বেষী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, এবং বৃটিশ পণ্য বয়কট করা হয়।

ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকার ক্যান্টনে অবস্থিত জাতীয়তাবাদী কুয়োমিণ্টাং সরকারকে চীনের একমাত্র সরকাররূপে স্বীকৃতি দিতে অগ্রসর হইল। পিকিং-এ যে অবস্থিত বৃটিশ দূত একটি ঘোষণা দ্বারা জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রতি বৃটিশ সরকারের সহানুভূতির কথা প্রকাশ করিলেন। ১৯২৭ সনের ১লা জানুয়ারী জাতীয়তাবাদী সরকার ক্যাণ্টন হইতে হ্যান্‌কাও-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করিল, এবং কয়েকদিন পরে হ্যান্‌কাওর বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল একদল চীনা কর্তৃক অধিকৃত হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ সরকার কয়েকটি শর্তে হ্যান্‌কাওর বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল জাতীয়তাবাদী সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য একটি সন্ধি করে। ফলে ১৯২৭ সালে অবস্থার পরিবর্তন হয়।

প্রথমতঃ, বোরোডিনের প্রতিপত্তি হঠাৎ হ্রাস পাইল। মস্কোর বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতা ও কুয়োমিণ্টাং জাতীয়তাবাদের মিত্রতা ছিল কৃত্রিম। যতদিন বিদেশীর কবল হইতে চীনের মুক্তির জন্য চেষ্টা চলিয়াছিল ততদিন পর্যন্ত এই মিত্রতা অটুট ছিল। কিন্তু, ১৯২৭ সনে জাতীয়তাবাদী সরকার হ্যান্‌কাও-এ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমগ্র চীনের কেন্দ্রীয় সরকাররূপে নিজেকে ঘোষণা করিলে কুওমিণ্টাং দল দুইভাগে বিভক্ত হইল; বামপন্থীরা বোরোডিনের সহযোগিতায় দলের বিপ্লবী ঐতিহ্য বজায় রাখিতে চাহিল, অপরপক্ষে দক্ষিণপন্থীরা বৃটেনের নূতন মনোভাবদ্বারা প্রভাবিত হইয়া বৃহৎ শক্তিগুলির সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপনে উদ্যোগী হইল। চিয়াং কাইশেক এই সময় দক্ষিণপন্থীদের নেতা হইলেন। কম্যুনিষ্টদের প্রতি বা রাশিয়ান পরামর্শ-দাতাদের প্রতি তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না। তিনি কুয়োমিণ্টাং সরকার গঠন করেন এবং বোরোডিন ও অন্যান্য কম্যুনিষ্টদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য হ্যান্‌কাও সরকারের নিকট দাবী জানান। জুলাই মাসে এই দাবী মানিয়া লওয়া হয়। বেরোডিন ও তাঁহার রাশিয়ান সহকারীদিগকে রাশিয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হয় ও অনেক চীনা কুম্যুনিষ্টকে কারারুদ্ধ করা হয়। হ্যান্‌কাও হইতে রাজধানী নান্‌কিং-এ স্থানান্তরিত করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৩৭ সনে চীনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে একটি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিগত দুই বৎসর বৃটেন চীনের বিদেশী-বিরোধী

আন্দোলনের লক্ষ্যস্থল ছিল। জাপান ওয়াশিংটন সম্মেলনের চুক্তি অনুযায়ী চীনের বিরুদ্ধে কোনরূপ কার্য করে নাই। কিন্তু চীনের রাজনৈতিক একতা দর্শনে জাপান তাহার নীতি পরিবর্তন করিল। বাণিজ্যের সুবিধা ও প্রসারের জন্য বৃটেনের কাম্য ছিল সমগ্রচীনে একটিমাত্র শক্তিশালী সরকারের স্থায়িত্ব, আর জাপান চাহিল চীনকে দুর্বল করিয়া রাখিতে। বিশেষতঃ, উত্তরচীন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আসিবে জাপান কোনমতে ইহা বরদাস্ত করিতে পারিল না।

জাপান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর ন্যায় জাপানও নিজেকে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মনে করিল। যুদ্ধের সময় চীনের যে সকল স্থান জাপান কুক্ষিগত করিয়াছিল ওয়াশিংটন সম্মেলনের চাপে সেই সকল স্থান সে ত্যাগ করে, এবং চীনের অখণ্ডতা মানিয়া লয়। ১৯২৩ সনের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের বিপুল ক্ষতির ফলে জাপানকে অদূর ভবিষ্যতে সামরিক বিজয়ের কল্পনা ত্যাগ করিতে হয়। ১৯২৪ সনের আমেরিকান ইমিগ্রেশন আইনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করিবার অধিকার হইতে জাপানীদিগকে বঞ্চিত করা হইলে জাপান অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। ১৯২৫ সনে বৃটিশ সরকার সিঙ্গাপুরে একটি প্রথম-শ্রেণীর নৌঘাটি নির্মাণ করিলে জাপানে আরও অশঙ্কার সৃষ্টি হয়। জাপানের প্রসারনের জন্য একমাত্র এশিয়াই উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে অবশিষ্ট রহিল।

১৯২৭ সনের মে মাসে জাতীয়তাবাদী সৈন্যরা উত্তরদিকে পীত নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইলে জাপান শানটুং প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করিয়া জাতীয়তা-বাদী সৈন্যদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করে। ইহার ফলে, চীনে জাপানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বন্যা বহিতে থাকে। এতদিন বৃটেনের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ জমিয়াছিল এখন তাহা জাপানের বিরুদ্ধে ধূমায়িত হইতে লাগিল। জাপানী পণ্যের বয়কট আরম্ভ হইল এবং পিকিং পর্যন্ত সমগ্র উত্তর চীন জাতীয়তাবাদী সরকারের কর্তৃত্ব মানিয়া লইল। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে জাপান অনমনীয় ছিল। ১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসে চ্যাং সো-লিন্ নান্‌কিং সরকারের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছুক হইলে তিনি রহস্যজনক অবস্থায় বোমা বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ইহা জাপানের ষড়যন্ত্র বলিয়া অনেকের সন্দেহ হয়।

১৮২৮ সনের মাঝামাঝি চীনের অবস্থা সঙ্কটময় হইয়াছিল। গৃহযুদ্ধ

অবিরামগতিতে চলিয়াছিল, মধ্যচীনের কয়েকটি প্রদেশে সাম্যবাদীরা কর্তৃত্ব করিতেছিল ; এবং প্রান্তীয় প্রদেশগুলিতে কোন সরকারী কর্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না। কেবল নামে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সমগ্র চীন একতা-বদ্ধ হইয়াছিল। জাপান চীনের প্রধান শত্রুরূপে কাজ করিতে আরম্ভ করিল (ফলে জাপানের ভয়ে চীন এই সময়ে অন্যান্য বিদেশীদের সহিত সম্পর্কের অবনতি ঘটাইতে ইচ্ছা করে নাই)।

মাঞ্চুরিয়া অধিকার।

জাপানে সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষদের মধ্যে অনেকদিন ধরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। বৃহৎশক্তিরূপে জাপানকে প্রতিষ্ঠা করা উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্য ছিল। বেসামরিক নেতারা বৃটিশও আমেরিকান জনমতের আনুকূল্য করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিল, অপর পক্ষে সামরিক নেতারা যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে জাপানকে বৃহৎশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছিল। ওয়াশিংটন সম্মেলনে বেসামরিক দলের নীতি জয়ী হইয়াছিল, এবং প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ সামরিক দলকে আক্রমণাত্মক কার্য আরম্ভ করিতে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৭ সন হইতে চীনের জাপান-বিরোধী নীতির ফলে জাপানের ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘিত হইল। ১৯২৯ সন হইতে ১৯৩১ সনের মধ্যে জাপানে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, জাপানে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া যায় এবং দেশে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯৩১ সনের গ্রীষ্মকালে মাঞ্চুরিয়ায় চীনা দস্যু কর্তৃক একজন জাপানী কর্মচারী নিহত হইলে জাপানে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের সামরিক বিভাগ ব্যাপারটি স্বহস্তে গ্রহণ করে। এই সময়েই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট চরমে উঠিয়াছিল।

রুশ-জাপান যুদ্ধের পরে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার দ্বারা স্থির হয় যে, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের রক্ষার জন্য জাপান মাঞ্চুরিয়ায় ১৫ হাজার সৈন্য রাখিতে পারিবে। এই সৈন্য বাহিনীর গতিবিধি রেলপথ-অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, ও মুক্‌দেন ছিল তাহাদের সদর কার্যালয়। ১৯৩১ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর জাপানী সৈন্যরা মুক্‌দেনের নিকট একটি চীনাবাহিনীকে প্রধান রেল লাইনটির ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত থাকিতে দেখে। ফলে

জাপানীরা আক্রমণ করে। একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে মুকদেনে ১০ হাজার চীনা সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ৪ দিনের মধ্যে, মুকদেনের উত্তরে দুইশত মাইলের মধ্যে সকল চীনা শহরগুলি জাপানীরা অধিকার করে। চীনের প্রাদেশিক সরকারকে মুকদেন হইতে বিতাড়িত করা হয়। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি স্বল্প-বসতিপূর্ণ সমগ্র উত্তর মাঞ্চুরিয়া জাপানীদের অধিকারে আসে। ইহার পরে জাপানীরা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং এই সময়ে বোমাবর্ষণকারী উড়োজাহাজও যুদ্ধে ব্যবহার করে। ১৯৩২ সনের ৪ঠা জানুয়ারী, চীন ও মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তবর্তী চীনের প্রাচীর পর্যন্ত জাপানীরা অগ্রসর হয়, এবং মাঞ্চুরিয়া বিজয় সম্পূর্ণ করে। এই সময়ে জাতিসংঘের কাউন্সিল ঘনঘন অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিল, কিন্তু জাপান কাউন্সিলকে অগ্রাহ্য করিয়াই মাঞ্চুরিয়া-অভিযান চালায়। চীন সরকার নিয়মপত্রের ১১নং ধারা অনুযায়ী জাতিসংঘের নিকট আবেদন করে। জাপানী প্রতিনিধি উত্তর দিলেন যে, চীনের রাজ্য অধিকার করিবার জন্য জাপান সরকারের কোন অভিপ্রায় নাই; কেবলমাত্র চীনা দস্যুদের হাত হইতে জাপানীদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এই পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি জাপানীদের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জাপানী সৈন্যদের অপসারণের জন্য কাউন্সিলে ১৯৩১ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে একপক্ষকালের জন্য কাউন্সিলের অধিবেশন স্থগিত রহিল।

প্যারিসের সন্ধির দ্বারা যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়; এবং ওয়াশিংটনের নব-শক্তির চুক্তির দ্বারা স্বাক্ষরকারীরা চীনের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা মানিয়া লইয়াছিল বলিয়া জাপান যুক্তি দেখাইল যে, মাঞ্চুরিয়ায় তাহার কার্যকলাপ পুলিশী ব্যবস্থা মাত্র, যুদ্ধ নহে। কিন্তু ক্রমশঃ এই অজুহাত ধরা পড়িয়া গেল। কাউন্সিলের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইল যে, জাপান জাতিসংঘের নিয়মপত্র, প্যারিসের সন্ধি ও নবশক্তির চুক্তি লঙ্ঘন করিতেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগদান করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আগ্রহান্বিত হইল। কাউন্সিল যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘে যোগদানের সম্ভাবনায় অত্যন্ত উচ্ছসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কাউন্সিলে প্রতিনিধি প্রেরণ করার প্রস্তাবে জাপানী প্রতিনিধি বিরোধিতা করিলেন। নিয়মপত্রের ১৭নং ধারা অনুযায়ী

যে অবস্থায় জাতিসংঘের বে-সভ্যদিগকে কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগদান করিতে আহ্বান করা যাইতে পারে সে অবস্থার তখন উদ্ভব হয় নাই বলিয়া জাপানী প্রতিনিধি যুক্তি দেখাইলেন। দীর্ঘ বিতর্কের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটাধিক্যের সাহায্যে এই আপত্তি অমান্য করা হইল এবং যুক্তরাষ্ট্রকে কাউন্সিলে যোগ দিবার আমন্ত্রণ জানান হইল। ১৬ই অক্টোবর আমেরিকান প্রতিনিধি কাউন্সিলে যোগদান করিয়া জানাইলেন যে, কেবলমাত্র প্যারিসের সন্ধি বজায় রাখা সংক্রান্ত আলোচনায়ই তিনি অংশগ্রহণ করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ-বিরোধী জনমতের ভয়ে আমেরিকান সরকার তাহার প্রতিনিধিকে কাউন্সিলের কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে দিতে সাহসী হয় নাই। কাউন্সিলের সভ্যগণের সহিত ব্যক্তিগত ও বেসরকারীভাবে আমেরিকান প্রতিনিধি আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন মাত্র।

ইতিমধ্যে আমেরিকার যোগদানের ব্যাপার লইয়া জাপান ও কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে মতানৈক্য ক্রমশঃ গভীর হইল। সৈন্যাপসারণের পূর্বে চীনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার জন্য জাপান দাবী করিল; অপর পক্ষে, ২৪শে অক্টোবর, অন্যান্য সভ্যরা ১৬ই নভেম্বরের পূর্বে জাপানী সৈন্যাপসারন সমাপ্ত করিবার জন্য একটি প্রস্তাব আনে। কিন্তু একমাত্র জাপানের বিরোধিতার জন্য ইহা প্রত্যাখ্যাত হয়। এইরূপে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বোঝাপড়ার আর সম্ভাবনা রহিল না, এবং ১১নং ধারা অনুযায়ী চেষ্টার শেষ হইল।

যদিও অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল, তথাপি কাউন্সিল স্বীয় অকৃতকার্যতা ঘোষণা করিল না। সর্বসম্মতিক্রমে, চীন ও জাপানের মধ্যে শান্তি-নষ্টকারী কোন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করার জন্য জাতিসংঘের একটি কমিশনকে দূর প্রাচ্যে প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইল। গ্রেট-বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালী—এই পাঁচটি বৃহৎ শক্তির প্রতিনিধিদের লইয়া এই কমিশন গঠিত হয়; লর্ড লিটন্ ইহার সভাপতি ছিলেন।

লিটন কমিশনের কার্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই কতগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। চীন জাপানী পণ্য বয়কট করিল। ১৯৩২ সনের জানুয়ারীমাসে সাংহাই সহরে একদল জাপানী সন্ন্যাসী আক্রান্ত হন এবং তাঁহাদের একজন নিহত হন। ফলে একটি বিরাট জাপানী বাহিনী সাংহাইতে অবতরণ করিয়া চীনা বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং বিমান হইতে

বোমা বর্ষণ করিয়া তাহাদের সদর দপ্তর ভস্মীভূত করে। লিটন কমিশন মার্চমাসে চীনে উপস্থিত হইলে জাপান দীর্ঘ আলোচনার পর মে মাসে সাংহাই হইতে তাহার সৈন্য অপসারণ করে। ইতিমধ্যে, মাঞ্চু বংশের শেষ বংশধর 'পু-ঈ'কে সভাপতি নিযুক্ত করিয়া জাপান মাঞ্চুরিয়ায় "মাঞ্চুকুও প্রজাতন্ত্র" নামে একটি তাঁবেদার সরকার গঠন করিয়াছিল। জাপানী পরামর্শদাতাদের দ্বারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে এই প্রজাতন্ত্র শাসিত হইতে লাগিল।

এদিকে সাংহাই যুদ্ধের সময় চীন সরকার নিয়মপত্রের দশম ও পঞ্চদশ ধারা কার্য্যকরী করিবার জন্য এবং সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য দাবী জানাইল। ক্ষুদ্র শক্তিগুলি স্বভাবতই বহিরাক্রমনের ভয়ে ভীত ছিল বলিয়া প্রথম হইতেই তাহারা জাপানকে সংযত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল; এবং পরিষদে তাহাদের বিরাট সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল বলিয়া চীন পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশনের দাবী করে। মার্চমাসে এই বিশেষ অধিবেশন বসে, কিন্তু লিটন্ কমিশনের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত তাহারা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

সেপ্টেম্বরের শেষে লিটন্ কমিশনের রিপোর্ট জেনেভায় প্রেরিত হয়, এবং নভেম্বর মাসে কাউন্সিলে পেশ করা হয়। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের বিভিন্ন অজুহাত এই রিপোর্টে প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং মাঞ্চুকুও প্রজাতন্ত্রকেও একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অপরপক্ষে, অতীতে জাপানের প্রতি চীনের ব্যবহার অন্যায় বলিয়া স্বীকার করা হয়। পূর্বাবস্থার পুনঃপ্রবর্তন বা কাল্পনিক মাঞ্চুকুও রাষ্ট্রকে বজায় রাখার দ্বারা বিবাদের মীমাংসা হইবে না বলিয়া চীন ও জাপানের মধ্যে আলোচনার পর জাতি-সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন মাঞ্চুরিয়ায় একটি স্বায়ত্বশাসনশীল সরকার গঠনের সুপারিশ করা হয়।

লিটন্ রিপোর্ট কাউন্সিল, পরিষদ এবং পরিষদের একটি কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয়। পরিষদের কমিটির রিপোর্ট লিটন্ রিপোর্টের সুপারিশগুলির প্রতি সমর্থন জানায়। মাঞ্চুকুও সরকারকে এই রিপোর্টে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। ১৯৩৩ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী রিপোর্টের উপরে পরিষদে ভোট গ্রহণ করা হয়। শ্যাম ভোট দানে বিরত থাকে এবং জাপান রিপোর্টের বিরুদ্ধে ভোট দেয়; ইহা ছাড়া অবশিষ্ট ৪২টি সভ্যদেশ রিপোর্টের পক্ষে

ভোটদান করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রিপোর্টটি গৃহীত হইলে জাপানী প্রতিনিধিরা সভাগৃহ ত্যাগ করেন; এবং একমাস পরে জাপান জাতিসংঘ ত্যাগ করিবার জন্য সরকারীভাবে বিজ্ঞপ্তি দেয়।

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য পরিষদ একটি কমিটি নিযুক্ত করিল। সোভিয়েট সরকার তখন পর্যন্তও জাতিসংঘের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত কোনরূপ সহযোগিতা করে নাই। যুক্তরাষ্ট্র সরকার পরিষদের এই কমিটিতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। কমিটির কাজ ছিল দূর প্রাচ্যে অস্ত্র-রপ্তানী ও মাঞ্চুকুও সম্বন্ধে আলোচনা করা। প্রথম প্রশ্নটির কোন সমাধান হইল না। আদর্শবাদী বৃটেন স্বীয়দেশ হইতে চীন ও জাপানে অস্ত্র রপ্তানী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিল। কিন্তু যখন অন্য কোন রাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করিল না, তখন বৃটেন তাহার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিল। দ্বিতীয় প্রশ্নের ব্যাপারে একটি স্বীকৃতি-বিহীন রাষ্ট্রের সহিত স্থাপিত ডাক সংক্রান্ত ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধের জটিলতা এবং সেই রাষ্ট্রে অবস্থিত বিদেশী কন্‌সালদের মর্যাদা সম্পর্কিত সন্দেহ এই কমিটি দূর করে। যদিও জাপান ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্র মাঞ্চুকুওকে সরকারীভাবে স্বীকার করিয়া লয় নাই, তথাপি বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সকল প্রকার কার্যকরী সুবিধা মাঞ্চুকুও ভোগ করিয়াছিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এই প্রথম শক্তি-রাজনীতির (power politics) পুনরাবর্তন ঘটে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে শক্তি-প্রতিযোগিতা ওয়াশিংটন সম্মেলন বন্ধ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পুনরারম্ভ হইল। একটি শক্তিশালী রাজ্য আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিলে জাতিসংঘের সভ্যরাষ্ট্রগুলি তাহাকে বাধা দিতে যে প্রস্তুত ছিল না—ইহাই জাতিসংঘের কার্যকলাপ হইতে প্রতীয়মান হইল। অবশ্য, জাতিসংঘের অকৃতকার্যতার জন্য কতকগুলি অজুহাত দেখান হইল। যুক্তি দেখান হইল যে, জাপানের সহিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করা হইলে তদানীন্তন অর্থনৈতিক সংকট আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। দ্বিতীয়তঃ, জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের উত্তরে জাপান যদি অপর পক্ষের অঞ্চলগুলি আক্রমণ করে, তাহা হইলে অপর পক্ষীয় একমাত্র প্রথম শ্রেণীর নৌশক্তি বৃটেন তাহার সুদূরবর্তী ঘাঁটি হইতে সাহায্য পাঠাইয়া এই অঞ্চলগুলি রক্ষা করিতে পারিবে না। ব্যাপারটি অস্বাভাবিক-

রূপে গণ্য করার স্বপক্ষে একটি মতের সৃষ্টি হইল, এবং ইহাকে ভবিষ্যতে নজীররূপে গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। নিয়মপত্রের ২১নং ধারাটির ও লোকার্ণো সন্ধির রচয়িতাগণ আঞ্চলিক নিরাপত্তাকেই বুদ্ধিমানের মত স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং সুদূর চীনকে সাহায্য না করায় জাতিসংঘের আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারে না। যেহেতু দূরপ্রাচ্যে নিয়মপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই, সেই হেতু নিকটবর্তীস্থানে ইহা কার্যকরী হইবে না বলিয়াও সিদ্ধান্ত করা যায় না।

অবশ্য মাঞ্চুরিয়ার বিবাদে এইলাভ হইয়াছিল যে, জাতিসংঘ আমেরিকার সহানুভূতি লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। মাঞ্চুরিয়ার বিবাদের সময় জাতিসংঘ দক্ষিণ আমেরিকার দুইটি যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত থাকে, এবং এই ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের কার্যকে সমর্থন করে। প্রথম যুদ্ধটি আরম্ভ হয় ১৯৩২ সনে বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের মধ্যে চাকো নামক স্থান লইয়া। জাতিসংঘ নিয়মপত্রের ১১নং ও ১৫নং ধারা অনুযায়ী বিবাদটি মীমাংসা করিতে চেষ্টা করে। জাতিসংঘের প্রায় সকল সভ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধমান উভয় রাষ্ট্রে যুদ্ধদ্রব্যাদি রপ্তানী নিষিদ্ধ করে। কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। ১৯৩৫ সন পর্যন্ত যুদ্ধ চলিবার পর প্যারাগুয়ে জয়লাভ করে।

লেটিসিয়া নামক কলম্বিয়ার ক্ষুদ্র একটি অঞ্চল পেরু কর্তৃক অধিকৃত হইলে দ্বিতীয় বিবাদটির সৃষ্টি হয়। কলম্বিয়া ১৫নং ধারা অনুযায়ী কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিলে, ১৯৩৩ সনের মার্চ্চ মাসে কাউন্সিল পেরুকে পশ্চাদপসরণ করিতে বলে। প্রথমতঃ, পেরু ইহা মানিতে অস্বীকার করিলেও পরে আভ্যন্তরীণ ঘটনা প্রবাহের ফলে পেরুর মত পরিবর্তিত হয়; এবং জাতি সংঘের একটি কমিশন লেটিসিয়া অঞ্চলটি কলম্বিয়া কর্তৃক পুনরধিকার ব্যবস্থা তদারকের জন্য লেটিসিয়া পরিদর্শন করে। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও, মাঞ্চুরিয়া ও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সম্পর্কে জনসাধারণের উদ্বেগ প্রশমিত হইল না।

———

দশম অধ্যায়

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন

(The Disarmament Conference).

১৯২৫ সন হইতে ১৯৩০ সনের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করা হইলে ইহা সফল হইত কিনা বলা বড়ই কঠিন। তবে ১৯৩২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে চরম অর্থসঙ্কটের মধ্যে এবং জাপান কর্তৃক সাংহাই আক্রমণের সময় যখন এই সম্মেলন আরম্ভ হয় তখন ইহার সফলতার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। ১৯৩০ সনে যে সঙ্কটাবস্থার সূচনা হয় এই সম্মেলনের বিফলতা তাহাকে চরমে লইয়া আসে।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা।

নিয়মপত্রের ৮নং ধারা অনুযায়ী জাতিসঙ্ঘ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল যে জাতীয় রক্ষা ব্যবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যথাশক্তি জাতীয় সমরোপকরণের পরিমাণ হ্রাস করার উপর বিশ্বশান্তি নির্ভরশীল। সুতরাং, মিত্র সরকারগুলি একদিকে যেমন জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণের পর নিজেদের নিরস্ত্রীকরণের জন্য জার্মানীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল; সেইরূপ অন্যদিকে, নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে জাতীয় আত্মরক্ষা নীতিও তাহারা একান্ত প্রয়োজনীয় রূপে মানিয়া লইয়াছিল। সুতরাং এই দুই নীতির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাটি জটিল হয়।

নিয়মপত্রের ৮নং ধারা অনুযায়ী জাতিসঙ্ঘের কাউন্সিলের দায়িত্ব ছিল সমরোপকরণের পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। ১৯২০ সনের নভেম্বর মাসে সামরিক ও বেসামরিক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি অস্থায়ী মিশ্র কমিশন এই ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত হন। ওয়াশিংটন সম্মেলনই নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে প্রথম জয়মাল্য লাভ করে। এই সময়ে প্রধান নৌশক্তিগুলির নৌবল সীমিত করা হয়। স্থলবাহিনীর শক্তি-হ্রাসের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য কিনা এই প্রশ্নটি এখন বড় হইয়া দেখা দেয়। ১৯২২ সনে অস্থায়ী মিশ্র কমিশনে বৃটিশ প্রতিনিধি

স্থলবাহিনীগুলির সংখ্যা হ্রাসের একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। সমস্ত সৈন্যদিগকে ৫০ হাজার সৈন্যের এক একটি বাহিনীতে ভাগ করা হইবে, এবং এইরূপ কয়েকটি বাহিনী প্রত্যেক রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হইবে। এইরূপে ফ্রান্স ৬টি, ইটালী ৪টি, গ্রেটব্রিটেন ৩টি বাহিনী পাইবে। দুঃখের বিষয়, ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশের সামরিক বিশেষজ্ঞগণ এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। যুক্তি দেখান হইল যে, ৩০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীর শক্তি ইহার অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ ও কার্যাক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং এই পরিকল্পনা আর কার্যকরী হয় নাই। এই সময়ে ফরাসী প্রতিনিধিগণ নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে অধিকতর নিরাপত্তার প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলে ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণও তাহাতে সায় দিলেন। পরবর্ত্তী তিনটি বৎসর পারস্পরিক সাহায্যের খসড়া চুক্তি, জেনেভা খসড়া এবং লোকার্ণো সন্ধির যুগ। এই সময়ে ওয়াশিংটন চুক্তির ভিত্তি অনুযায়ী ক্ষুদ্র শক্তিগুলির নৌবল সীমিত করিবার একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টা এবং অস্ত্র-শস্ত্রের আন্তর্জাতিক লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিফল চুক্তি ছাড়া নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কিছুই করা হয় নাই।

লোকার্ণো সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার ও জার্মানী জাতিসংঘে যোগ দিবার ফলে নিরস্ত্রীকরণ যন্ত্রটি আবার তৎপর হইয়া উঠিল। লোকার্ণো সম্মেলনের শেষ খসড়ায় স্বাক্ষরকারীগণ নিয়মপত্রের ৮নং ধারায় বর্ণিত নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করেন এবং এই সময় হইতে জার্মানী অন্যান্য রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণের উপর জোর দিতে থাকে। ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কাউন্সিল নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের জন্য একটি প্রস্তুতিকরণ কমিশন নিয়োগ করে, এবং ইহার প্রথম বৈঠক ১৯২৬ সনের মে মাসে বসে। জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াকে এই কমিশনের সভ্য হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। প্রথম রাষ্ট্রদ্বয় তৎক্ষণাৎ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, এবং রাশিয়া পর বৎসর ইহাতে যোগ দেয়।

কাজ খুব ধীরে হইতেছিল। ১৯২৬ সনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল যে সকল অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করা হইবে তাহার প্রকৃতি নির্দ্ধারণের জন্য দুইটি বিশেষজ্ঞ সাব কমিশনের কার্য্যে। ১৯২৭ সনের মার্চ মাসে বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিগণ নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির একটি খসড়া পেশ করেন। এই খসড়ায় কোন সংখ্যার উল্লেখ ছিল না; কোন্ কোন

সমরোপকরণের পরিমাণ কিভাবে হ্রাস করা হইবে কেবলমাত্র তাহারই অবতারণা ছিল। কিন্তু, তথাপি ইহাতে মতের মৌলিক পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইয়াছিল। সামরিক লোকজনের প্রশ্নে ফরাসীপ্রতিনিধিগণ কেবলমাত্র সামরিক কার্যে নিযুক্ত জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, অপরপক্ষে বৃটিশ, জার্মান ও আমেরিকান প্রতিনিধিরা সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত ব্যক্তিসংখ্যাই সীমিত করিতে চাহিলেন। আবার, সামরিক দ্রব্যাদির ব্যাপারে ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী জার্মানীকে যেরূপভাবে নিরস্ত্রীকৃত করা হইয়াছিল জার্মাণ প্রতিনিধিগণ ঠিক সেইরূপে প্রধান প্রধান সকল শ্রেণীর সমরোপকরণের পরিসাংখ্যিক নিয়ন্ত্রণের দাবী জানাইলেন; অপর-পক্ষে ফরাসী প্রতিনিধিবর্গ প্রত্যেক রাষ্ট্রের বাজেটের সামরিক ব্যয়বরাদ্দ কমাইয়া পরোক্ষভাবে সমরোপকরণের পরিমাণ হ্রাস করিতে চাহিলেন; এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান প্রতিনিধিরা সমরোপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ-করণ সম্ভব নয় বলিয়া মতপ্রকাশ করিলেন। নৌবাহিনীর ব্যাপারে ফরাসী ও ইটালীয়ান প্রতিনিধিরা যুদ্ধ জাহাজগুলির মোট টনেজ (tonnage) সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু অপর পক্ষে বৃটিশ ও আমেরিকান প্রতিনিধিরা প্রত্যেক শ্রেণীর জাহাজের সংখ্যা পৃথকভাবে সীমাবদ্ধকরণের উপর জোর দিলেন। বাজেটের প্রশ্নে, ফরাসী প্রতিনিধিরা সামরিক ব্যয় হ্রাসের জন্য দাবী করিলেন; ব্রিটিশ ও ইটালিয়ান প্রতিনিধিরা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত একটি ব্যবস্থা অনুযায়ী সামরিক ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণী প্রচারের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন; এবং আমেরিকান ও জার্মাণ প্রতিনিধিরা বাজেট সম্বন্ধীয় কোন বিধিব্যবস্থারই প্রয়োজন স্বীকার করিলেন না। কমিশন এই বিভিন্ন মত লিপিবদ্ধ করিয়া অধিবেশন স্থগিত রাখিল।

ইতিমধ্যে আমেরিকান সরকার অধিক বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ওয়াশিংটন নৌসন্ধির অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদিগকে যে-শ্রেণীর জাহাজ সম্বন্ধে ঐ সন্ধিতে কোন বিধি নিষেধ আরোপিত হয় নাই ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি সম্মেলনে মিলিত হইতে আহ্বান করিল। ফ্রান্স ও ইটালী এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু বৃটেন ও জাপান ইহা গ্রহণ করে। ইহার ফলে ১৯২৭ সনের জুন মাসে জেনেভায় একটি সম্মেলন আরম্ভ হয়।

আমেরিকা ও বৃটেন উভয়েই ক্ষুদ্র যুদ্ধজাহাজগুলির (non—capital

ships) ক্ষেত্রেও ওয়াশিংটন সম্মেলনে গৃহীত পরিমাণ-সীমা প্রয়োগের বাধাগুলি ছোট করিয়া দেখিয়াছিল। আমেরিকান প্রতিনিধিগণ 'ওয়াশিংটন অনুপাত' (৫: ৫: ৩) ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও ডুবোজাহাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সেই অনুযায়ী রণতরীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করার জন্য প্রস্তাব করেন। বৃটিশ প্রস্তাবটি আরও জটিল ছিল। বৃটিশ সরকার যুক্তি দেখাইল যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিক বিস্তৃতির ফলে অন্ততঃপক্ষে ৭০টি ক্রুজার বৃটেনের একান্ত প্রয়োজন। তাহাদের মতে ক্রুজারগুলিকে টনেজ ও কামানের শক্তি অনুযায়ী দুই শ্রেণীতে ভাগ করা উচিত,—ইহাদের মধ্যে বৃহৎ শ্রেণীর ক্রুজার সম্বন্ধে ওয়াশিংটন অনুপাত প্রযোজ্য হইবে এবং ক্ষুদ্র ক্রুজারগুলি সম্বন্ধে কোন সংখ্যাসীমা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। ইহা ছাড়া তাহারা কেপিটাল শিপের অবয়ব ছোট করার জন্যও প্রস্তাব করে। জাপানী প্রতিনিধিরা এই দুই বিরোধী মতের অন্তর্বর্তী দৃষ্টিভঙ্গীর পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিল; দুইটি বিরোধীদল কর্তৃক গৃহীত একটি সাধারণ মীমাংসা মানিয়া লইতেও তাহারা রাজী ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ক্রুজার সমস্যার কোন মীমাংসা হইল না, এবং সম্মেলন ব্যর্থ হইল। নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে ইহাই ছিল প্রথম পরাজয়।

জেনেভা নৌসম্মেলনের ব্যর্থতা ১৯২৭ সনের পরিষদের উপর একটি নৈরাশ্যের ছায়া ফেলিয়াছিল। পরিষদ নিরাপত্তার প্রশ্নটি আরও বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য সুপারিশ করিল। প্রস্তুতিকরণ কমিশনের শরৎকালীন অধিবেশনে লিটভিনভের নেতৃত্বে রাশিয়ার প্রতিনিধিগণ যোগদান করিলে নূতন আশার সঞ্চার হয়। লিট্‌ভিনভ্ পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কেহই সাড়া দিল না। বসন্তকালীন অধিবেশনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় কাজে কোনরূপ অগ্রগতি দেখা গেল না। কমিশন 'সালিস ও নিরাপত্তার একটি কমিটি' নিযুক্ত করিল; দুইবৎসর যাবৎ নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারটি আবার ধামাচাপা পড়িয়া গেল।

১৯২৯ সনে আবার আশার আলোক দেখা গেল। মার্চমাসে হুভার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলেন, এবং মাত্র তিনমাস পরে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌এর শ্রমিক দল বৃটেনে আবার ক্ষমতা লাভ করিল। এই পরিবর্ত্তনের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি বোঝা-পড়ার পরিবেশ সৃষ্ট হয়। শরৎকালে ম্যাকডোনাল্ড্‌এর আমেরিকা সফরের ফলে ১৯৩০-সনের

জানুয়ারীতে লণ্ডনে একটি নৌসম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হয়। এবার ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, তবে ফ্রান্স নৌ, স্থল ও বিমান অস্ত্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার পুনরুল্লেখ করে।

লণ্ডন নৌসম্মেলনের গতি ছিল ভিন্ন। বৃটেন তাহার ক্রুজারের প্রয়োজন ৭০ হইতে ৫০ পর্যন্ত হ্রাস করিয়াছিল এবং ফলে মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু ফ্রান্স বাদ সাধিল। ফরাসী প্রতিনিধিগণ ফ্রান্সের উপনিবেশগুলির স্বার্থে একটি বৃহৎ ক্রুজার বাহিনীর একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বলিলেন এবং ক্ষুদ্র জাহাজের (non-capital ship) প্রতি 'ওয়াশিংটন অনুপাত' প্রয়োগ করার ইঙ্গ-আমেরিকান প্রস্তাব ও ফ্রান্সের সহিত ইটালীর সমানুপাতের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। জাপানও এই সর্বপ্রথম ওয়াশিংটন অনুপাতের বৈষম্যের ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সকল ক্ষেত্রে সমানুপাতের দাবী জানায়। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টের পর জাপানকে বৃহৎ ক্রুজার সম্বন্ধে ওয়াশিংটন অনুপাত এই শর্তে মানিয়া লইতে রাজী করান হয় যে, আমেরিকার বা বৃটেনের ক্ষুদ্র ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারের ৭০% এবং ডুবো জাহাজের ক্ষেত্রে সমানুপাতিক অধিকার জাপান লাভ করিবে। এই ভিত্তিতে এপ্রিল মাসে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ফরাসী-আপত্তি দুরপনেয় ছিল বলিয়া বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এই চুক্তি গ্রহণ করে। অবশ্য এই পঞ্চশক্তি ওয়াশিংটন সন্ধিটি আরও পাচবৎসর কাল স্থায়ী করিতে রাজী হইল।

এই আংশিক সফলতা জাতিসংঘকে যথেষ্টরূপে উৎসাহিত করিল। রাইন অঞ্চল পুনরধিকার করায় জার্মানী নিরস্ত্রীকরণের উপর অধিকতর মনোযোগ দিতে পারিল। স্থির হইল যে, ১৯৩০ সনের শরৎকালে প্রস্তুতি-করণ কমিশন ইহার শেষ বৈঠকে মিলিত হইবে এবং ইহার ফল যাহাই হউক না কেন, ইহার পরেই দীর্ঘকালব্যাপী স্থগিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করা হইবে। কিন্তু শেষ বৈঠকেও পূর্বের মতানৈক্য দূর হইল না; তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটাধিক্যের সাহায্যে একটি নিষ্ক্রিয় খসড়া চুক্তি (এখানেও কোনরূপ সংখ্যার উল্লেখ ছিল না) পাশ করা হইল। এইপ্রকারের দলিলের কোন কার্যকরী মূল্য থাকিতে পারে না; এবং সম্মেলন আরম্ভ হইলে ইহার ব্যবহারও হয় নাই। ইহা নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত মতবৈষম্যের

প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল মাত্র। ১৯৩২ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী সম্মেলনের তারিখ ধার্য হইল।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন:

এই সম্মেলনে ৬১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন এবং হেণ্ডারসন্ ছিলেন ইহার সভাপতি। সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইবার সময় ১৯৩১ সনের গ্রীষ্মকালে হেণ্ডারসন্ বৃটিশ শ্রমিকসরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু আগষ্ট মাসে শ্রমিক সরকার পদত্যাগ করে এবং পরবর্ত্তী সাধারণ নির্বাচনে হেণ্ডারসন্ পার্লামেণ্টের আসন লাভে অসমর্থ হন। সুতরাং একজন বেসরকারী লোক হিসাবেই হেণ্ডারসন্ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তবে ইহা দুর্ভাগ্যস্বরূপ হইয়াছিল। সম্মেলনের সভাপতি বৃটিশ সরকারের উচ্চ পদাধিকারী হইলে তাঁহার মতামত সভ্যরা নিশ্চয়ই অধিকতর শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করিতেন। ফরাসী ও বৃটিশ সরকারসমূহ তাহাদের মন্ত্রী-প্রতিনিধিদিগকে জেনেভায় স্থায়ীভাবে না রাখার ফলে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাও সম্মেলনের পক্ষে অনুকূল ছিল না; কারণ, ১৯৩২ সনের মে মাসে দুর্বল ও মীমাংসায় বিশ্বাসী ব্রুনিং সরকারের পতন ঘটে এবং ধূর্ত ও কলহপরায়ণ প্যাপেনের সরকার ক্ষমতা লাভ করে। এই সকল ক্ষুদ্র বাধার সঙ্গে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ যুক্ত হইয়া সম্মেলনের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল।

প্রস্তুতিকরণ কমিশন নিরস্ত্রীকরণের জন্য কতকগুলি অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছিল মাত্র। সুতরাং, যদিও সম্মেলন কমিশনের খসড়া চুক্তিকে ইহার আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, কার্যতঃ ইহা সম্পূর্ণ একটি পৃথক পন্থা অবলম্বন করে। ফরাসী প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘের অধীনে একটী পুলিশবাহিনী সৃষ্টি করার প্রস্তাব করেন: যে সকল রাষ্ট্র বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ, বৃহৎ ডুবোজাহাজ, ভারী কামান ও বোমাক্ষেপনকারী উড়োজাহাজের মালিক তাহারা ঐগুলি জাতিসংঘ বাহিনীর অধীনে রাখিবে। কতগুলি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় রাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করে। কিন্তু বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফ্রান্স তাহার প্রস্তাব লইয়া কোনরূপ জেদ করে নাই, তবে যখনই সম্মেলন নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত কোন সঠিক উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ফরাসী প্রতিনিধিগণ তখনই ফ্রান্সের অধিকতর নিরাপত্তার প্রয়োজনের কথা উত্থাপন করিয়াছে।

বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাইমন প্রস্তাব করেন যে, সম্মেলনের উচিত সমরোপকরণের সাংখ্যিক হ্রাসের পরিবর্তে গুণবাচক সীমাবদ্ধকরণ (qualitative limitation), অর্থাৎ যে সকল অস্ত্র রক্ষামূলক না হইয়া আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার সম্পূর্ণভাবে বর্জন, লইয়া আলোচনা করা। যদিও প্রস্তাবটি বিপুল সমর্থন লাভ করে, তথাপি ইহা যখন নৌ, পদাতিক ও বৈমানিক বিশেষজ্ঞদের তিনটি কমিশনের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয় তখন ইহা প্রতীয়মান হয় যে, অস্ত্রশস্ত্রকে রক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক এই দুই শ্রেণীতে যে কোন প্রকারে ভাগ করা হউক না কেন তাহা সাধারণভাবে গৃহীত হইবে না। এইরূপে বৃটিশ ও আমেরিকান প্রতিনিধিরা ডুবোজাহাজকে আক্রমণাত্মক ও যুদ্ধজাহাজকে রক্ষামূলকরূপে বর্ণনা করিলে অন্যরা ঠিক বিপরীত মত প্রকাশ করিলেন। অনেক প্রতিনিধি সকল ট্যাঙ্ককে (tank) আক্রমণাত্মক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ফরাসী প্রতিনিধিগণ মাত্র ৭০ টনের অধিক ও বৃটিশ প্রতিনিধিরা ২৫ টনের অধিক ভারী ট্যাঙ্ককে আক্রমণাত্মক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। জার্মান প্রতিনিধিদল প্রস্তাব করেন যে, ভার্সাই চুক্তিতে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র আক্রমণাত্মক বলিয়া বলা হইয়াছে তাহা এখন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত এবং অন্যান্যগুলিকে রক্ষামূলক বলিয়া স্বীকার করা উচিত। কিন্তু তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবটিতে ত্রুটি রহিয়া গেল। কারণ, তাঁহারা যদিও সকল জঙ্গী বিমানকে আক্রমণাত্মক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, বেসামরিক বিমানের নিয়ন্ত্রণের তাঁহারা বিরোধিতা করেন। (ভার্সাই সন্ধিতে বেসামরিক বিমানের বিষয়টি আলোচিত হয় নাই।) কেবল মাত্র রাসায়নিক যুদ্ধসংক্রান্ত কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধে মারাত্মক গ্যাস ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেন (অবশ্য ১৯২৫ সনের একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা ইহা পূর্বেই করা হইয়াছিল)। কিন্তু এইসকল গ্যাসের প্রস্তুতিকরণ নিষিদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই।

জুন মাসের পূর্বে বিভিন্ন কমিশন তাহাদের বিবরণী দাখিল করিতে পারে নাই। সকল সশস্ত্রবাহিনী ও সমস্ত সমরোপকরণের এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করিবার জন্য আমেরিকা এই সময়ে যে প্রস্তাব দিয়াছিল বৃটেন তাহার ক্রুজার সংখ্যা হ্রাসের ভয়ে ইহাতে সায় দিতে পারিল না। ২০শে জুলাই সম্মেলনের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করা হয় যে, (১) আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ নিষিদ্ধ করা হউক, উড়োজাহাজের সংখ্যা সীমিত করা ও বেসামরিক

বিমান-চালনা নিয়ন্ত্রণ করা হউক, (২) একটি নির্দিষ্ট আকার অপেক্ষা বৃহৎ, ভারী কামান ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না, এবং (৩) রাসায়নিক যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হইবে। ৪১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদান করেন, ৮টি রাষ্ট্র (ইটালী সমেত) ভোটদানে বিরত থাকে এবং জার্মানী ও রাশিয়া বিপক্ষে ভোট দেয়। জার্মাণ প্রতিনিধি বরাবরই এই দাবী করেন যে, অন্যান্য রাষ্ট্র হয় ভার্সাই সন্ধিতে উল্লিখিত নিরস্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করিবে নতুবা জার্মানীকে পুনরায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার অধিকার দিতে হইবে। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, জাতিগুলির মধ্যে সমান অধিকার সুস্পষ্টরূপে স্বীকার করা হইলেই সম্মেলনের কার্যে জার্মানী অংশ গ্রহণ করিবে।

অন্তর্বর্তীকালীন আলোচনা নিষ্ফল হইল এবং অক্টোবর মাসে সম্মেলনের কার্য পুনরায় আরম্ভ হইলে জার্মানীর প্রতিনিধিকে ইহাতে অনুপস্থিত দেখা গেল। দুইমাস যাবৎ সম্মেলনের কার্য প্রকৃতপক্ষে বন্ধ রহিল; একটি নূতন ফরাসী নিরাপত্তা-পরিকল্পনা ও সকল প্রকার অস্ত্র-নির্মাণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফরাসী প্রস্তাবই এই অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১১ই ডিসেম্বর বৃটেন, ফ্রান্স ও ইটালী সকলজাতির নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় জার্মানীর সমানাধিকার স্বীকার করিলে জার্মানী সম্মেলনে পুনরায় যোগ দিতে রাজী হয়।

১৯৩৩ সনের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে সম্মেলনের কাজ আবার আরম্ভ হয়। কিন্তু ফরাসী সরকারের নিরাপত্তা-দাবী ও জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ দাবীর মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। মার্চ মাসে এই বিরোধ চরমে উঠিলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জেনেভায় আসিয়া ম্যাকডোনাল্ড পরিকল্পনা পেশ করেন। এইবার সর্ব্বপ্রথম সম্মেলনের নিকট এমন একটি খসড়া চুক্তি উপস্থাপিত করা হইল যাহাতে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশের সামরিক জনগণের সংখ্যা ও যুদ্ধপোকরণের পরিমাণ সীমিত করিয়া দেখান হইয়াছিল। ম্যাকডোনাল্ড পরিকল্পনা সকলেই গ্রহণ করে। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণচুক্তির সম্ভাবনায় কেহই বিশ্বাসী ছিল না। এই পরিকল্পনা লইয়া পরবর্তী চারি সপ্তাহকাল যে বিতর্ক হয় তাহাদ্বারা বিভিন্ন মতের মূলগত পার্থক্যই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। জুনমাসে মীমাংসার উদ্দেশ্যে বেসরকারী আলাপ আলোচনার সুপারিশ করিয়া সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত রাখা হইল।

জানুয়ারীর শেষভাগে হিটলার জর্মানীর চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন এবং

এইসময়ে নাজী দলের ক্ষমতা দৃঢ়মূল হইয়াছিল। ইহার ফলে ফরাসী সরকার জার্মান দাবী স্বীকার করিতে নারাজ হইল। তথাপি অবিলম্বে জার্মানীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৯৩৩ সনের গ্রীষ্মকালীন অবকাশে যে একটিমাত্র ফরাসী পরিকল্পনা রচনা করা হয় তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিটি দুইটি সময়কালের জন্য করা উচিত। প্রথমটিতে অর্থাৎ পরীক্ষামূলক চারিবৎসর সময়ে অস্ত্র ও সমরোপকরণের উপর একটি আন্তর্জাতিক খবরদারীর ব্যবস্থা ও জাতীয় বাহিনীগুলির পুনর্গঠন আরম্ভ হওয়া উচিত এবং দ্বিতীয় মিয়াদে প্রকৃত সীমায়িতকরণ-ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা হইবে। বৃটিশ ও ইটালী সরকার এই প্রস্তাবে রাজী হয় এবং ১৪ই অক্টোবর সাইমন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের Bureauতে ইহা সমর্থন করেন; জার্মানীও সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ-সম্মেলন ও জাতিসঙ্ঘ ত্যাগের ঘোষণা করে।

জার্মানীর এইরূপে বাহির হইয়া আসার ফলে ছয় মাসের জন্য সম্মেলনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং জার্মানী সমেত প্রধান শক্তিসমূহ কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে তাহাদের মত বিনিময় করে। ১৯৩৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ইডেন প্যারিস, বার্লিন ও রোম পরিদর্শন করেন। বার্লিনে অবস্থানকালে হিটলার প্রস্তাব করেন যে, ফ্রান্স, ইটালী ও পোলাণ্ডের বাহিনীগুলির প্রতি সমভাবে প্রয়োগ করা হইলে জার্মানী তাহার সশস্ত্রবাহিনীর যে কোন প্রকারের সঙ্কোচন মানিয়া লইবে; অবশ্য জার্মানীর বিমানশক্তি তাহার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির সমষ্টিগত বিমানশক্তির শতকরা ৩০ ভাগ অথবা ফরাসী বিমানশক্তির শতকরা ৫০ ভাগ ধার্য করিতে হইবে। ইহার উত্তরে ফরাসী সরকার জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানায় এবং নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির অচ্ছেদ্য অংশরূপে অঙ্গীকার ও চুক্তি অমান্য করার অপরাধে শাস্তির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। ১৭ই এপ্রিল ফরাসী সরকার জানায় যে, সদ্যঃ প্রকাশিত জার্মান সামরিক বাজেটে তাহার পুনরস্ত্রীকরণের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বলিয়া ফ্রান্স জার্মাণ প্রস্তাব বিবেচনা করিতে অক্ষম।

ফ্রান্সের এই মত সম্মেলনের সমাপ্তি সূচনা করে। যদিও আরও কয়েকমাস যাবৎ সম্মেলন স্থায়ী হইয়াছিল, এবং ইহার কমিটিগুলি অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবসা, সামরিক বাজেটের প্রকাশ প্রভৃতি অপ্রধান বিষয় লইয়া বিবেচনা করে, ইহার অধিবেশন ঘনবিরতিপূর্ণ ছিল ও ইহার অস্তিত্ব অর্থহীন বলিয়া

মনে হইল। ১৯৩৪ সনের পরে ইহার আর কোন অধিবেশন হইল না, যদিও ইহা আনুষ্ঠানিক ভাবে বন্ধ করা হয় নাই। ১৯৩৫ সনের শরৎকালে সম্মেলনের সভাপতির মৃত্যু হয়। মিত্রশক্তিবর্গ নিরস্ত্রীকরণমূলক প্রতিজ্ঞা পালন করে নাই বলিয়া জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ ঘটিয়াছিল। আবার এই পুনরস্ত্রীকরণের ফলে অন্যান্য দেশে ভীতির সৃষ্টি হয় এবং অধিকতর সমরোপ-করণ-উৎপাদন আরম্ভ হয়। দূরপ্রাচ্যে ১৯৩১ সনে যে শক্তি-রাজনীতির পুনঃপ্রকাশ দেখা দেয় ১৯৩৩ সনে সমগ্র পৃথিবীতে ইহার বিস্তার হয়।

১৯৩৩ সনে ম্যাকডোনাল্ড্ যখন জেনেভায় আসেন তখন তিনি সাইমনকে সঙ্গে লইয়া রোমে উপস্থিত হইয়া মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মুসোলিনী নিরস্ত্রীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না, সুতরাং তিনি অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইটালী, বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে একটি চতুঃশক্তি চুক্তির খসড়া অতিথিদের নিকট উপস্থাপিত করা হইল। অতীত দশকে ইটালীর বৈদেশিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের সহিত সমানাধিকার অর্জন করা। বিশেষতঃ, ইটালী ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শ্রেষ্ঠত্বে এবং পোল্যাণ্ড ও Little Entente এর সহিত মিত্রতার মাধ্যমে অর্জিত শক্তিতে উষ্মা প্রকাশ করে। ফ্রান্সের উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধিত বাধা দিবার জন্য সে মধ্য ইয়োরোপে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রত্রয়ের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীকে এবং বল্কান অঞ্চলে যুগোশ্লভিয়ার বিরুদ্ধে বুলগেরিয়াকে সমর্থন করে। এই দুইটি রাষ্ট্রের সন্ধি (ভার্সাই সন্ধি)-পরিবর্তন-নীতির সমর্থন করিয়া ইটালীও 'পরিবর্তন' নীতির একটি প্রধান ধারক হইল। অন্য 'পরিবর্তন'-সমর্থক প্রধান রাষ্ট্র জার্মানীর সহিত এইরূপে ইটালীর উদ্দেশ্যের মিল হইল। সুতরাং, ১৯৩৩ সনে ইটালীর উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য বৃহৎশক্তির সমান পর্যায়ে জার্মানীকে উন্নীত করা, ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে দুর্বল করা, এবং শান্তি চুক্তিগুলির পরিবর্তন করা।

চতুঃশক্তি চুক্তি (The Four-Power Pact)।

বৃটিশ মন্ত্রীদের নিকট উপস্থাপিত খসড়াচুক্তিটিতে এই উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট ছিল। এই খসড়া অনুযায়ী চতুঃশক্তি তাহাদের ইউরোপীয় নীতি সহযোগিতার মনোভাব লইয়া এইরূপে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল যাহাতে প্রয়োজন হইলে অন্যশক্তিগুলিও ইহা গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে তাহারা

ইউরোপের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রাখিবার ব্যবস্থা করিল, এবং ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্রগুলিকে একটি অপ্রধান ভূমিকা দেওয়া হইল। ইহা ছাড়া চতুঃশক্তি ঘোষণা করিল যে, তাহাদের সাধারণনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইবে শান্তিচুক্তির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিবেচনা করা। পোল্যাণ্ড ও Little Entente এর প্রতি ইহা ছিল আর একটি আঘাত। চতুঃশক্তি আরও স্থির করিল যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অকৃতকার্য্য হইলে, তাহারা পর্য্যায়ক্রমে জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের অধিকার মানিয়া লইবে। বিশেষতঃ উপনিবেশ এবং অ-ইউরোপীয় প্রশ্নসমূহের ক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের নীতির সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলিবে।

ঔপনিবেশিক ধারাটি ব্যতিরেকে এই খসড়ায় এমন কিছু ছিল না যাহা বৃটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। তবে বৃটিশ মন্ত্রীরা বুঝিতে পারিলেন যে, ফরাসী সরকারের নিকট ইহা অত্যন্ত আপত্তিকর বলিয়া মনে হইবে। সুতরাং তাঁহারা বুদ্ধিমানের মত এই খসড়া সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ফ্রান্সে এই খসড়া সম্বন্ধে যথেষ্ট বিরোধিতার সৃষ্টি হইল, এবং পোল্যাণ্ড ও Little Entente ও প্রবল প্রতিবাদ জানাইল। অবশ্য, ফরাসী সরকার প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান না করিয়া ইহার অসন্তোষজনক অংশগুলি বাদ দিবার চেষ্টা করিল। দুইমাস ধরিয়া কূটনৈতিক আলোচনার পর পরিবর্তিত খসড়ায় স্থির হইল যে, চতুঃশক্তি জাতিসংঘের কাঠামোর মধ্যে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করিবে। নিয়মপত্রের ১০ নং ও ১৬ নং ধারা (স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্পর্কে) এবং ১৯ নং ধারা (যাহাতে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত শান্তিচুক্তির পরিবর্তনের কথা বলা হইয়াছে) মানিয়া লইতে তাহারা পুনরায় সম্মতি জানায়। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে তাহাদের কোন প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিলে তাহারা যৌথভাবে ইহা আলোচনা করিবে। ঔপনিবেশিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হইল না। পরিবর্তিত খসড়াদ্বারা কাহারও কোন ক্ষতি হইল না। ১৯৩৩ সনের ৭ই জুন চতুঃশক্তির প্রতিনিধিগণ রোমে এই খসড়ায় স্বাক্ষরদান করেন।

Little Entente পরিবর্তিত খসড়ার যুক্তিযুক্ততায় সন্তোষ প্রকাশ করে, তবে তাহাদের এইরূপ অপ্রিয় ধারণা হয় যে, ইটালী তাহাদের স্বার্থে আঘাত করিয়াছিল এবং ফ্রান্সও তাহাদের স্বার্থরক্ষায় যথেষ্ট তৎপরতা দেখায়

নাই। কিন্তু, পোল্যাণ্ডকে ইয়োরোপীয় নেতৃত্বপদ হইতে বাহিরে রাখিতে ইটালীর কৃতকার্যতায় পোল্যাণ্ড অত্যন্ত রুষ্ট হয়। তাহাদের রোষ ফ্রান্সের উপরে পরে, কারণ ফ্রান্স মুসোলিনীর অহংকারের নিকট পোল্যাণ্ডের সম্মান বিসর্জন দিয়াছিল। যদিও চতুঃশক্তি চুক্তি কখনও কার্যে পরিণত হয় নাই (ফ্রান্স ও জার্মানী ইহা অনুমোদন করে নাই), তথাপি ইহা ফ্রান্স ও তাহার মিত্রদের মধ্যে কলহের সূচনা করিয়া তাহাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরাইয়া দিয়াছিল। ফলে, জার্মান-নীতি নূতন পথে চালিত হইলে নূতন নূতন শক্তিগোষ্ঠীর সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হইল।

একাদশ অধ্যায়

জার্মানীর পুনরভ্যুত্থান : সন্ধির সমাধি (১৯৩৩-'৩৯)

১৯৩৩ সনের ৩০শে জানুয়ারী, হিট্‌লার তিন জন নাজী ও আটজন জাতীয়তাবাদী সভ্য লইয়া গঠিত জার্মান সরকারের চ্যান্সেলর হইলেন। নূতন নির্বাচনের জন্য পরিষদ (Reichstag) ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। নির্বাচনের পূর্বে, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, পরিষদ ভবনটি রহস্যজনক ভাবে ভস্মীভূত হয়, এবং ইহার অজুহাতে সাম্যবাদী ও তাহাদের সমর্থনকারীদিগকে পুলিশ ও নাজী স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার ফলে নূতন নির্বাচনে পূর্বাপেক্ষা ৯২টি অধিক সভ্যপদ নাজীরা লাভ করে এবং এই সময় হইতে আইন ও শাসনতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা লোপ পায়। ইহুদী, সমাজতন্ত্রীগণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদীদিগকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। তাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোককে গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হয়, শ্রমিক শিবিরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, অথবা কায়িকভাবে কষ্ট দেওয়া হয়। বহু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, কিন্তু হত্যাকারীদিগের বিচারের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের যে সব লোক নবপ্রতিষ্ঠিত একনায়কতন্ত্রের সমালোচনা-কারী তাহাদের প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৩ সনের মধ্যভাগে, প্রকৃতপক্ষে নাজীদল ব্যতীত অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। এখন হইতে পরিষদের অধিবেশন বিরল ভাবে আহূত হইত; এবং ইহাতে চ্যান্সেলারের ঘোষণাগুলির তারিফ করা ছাড়া আর কোনও কর্ত্তব্যের সম্পাদন হইত না। ১৯৩৪ সনের আগষ্ট মাসে হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যু হইলে হিট্‌লার সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইলেন; অবশ্য যুগপৎ তিনি চ্যান্সেলারও রহিয়া গেলেন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই নূতন শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক ঘোষণাগুলি শান্তিকামী ছিল। শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সন্ধি ব্যবস্থার পরিবর্তন করিবেন না বলিয়া হিট্‌লার জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার Mein Kampf নামক আত্মজীবনীতে (১৯২৪ সনে লিখিত) হিট্‌লার ফ্রান্সকে প্রধান শত্রু রূপে বর্ণনা করেন, জার্মানীর বাহিরে বিচ্ছিন্ন ভাবে

বসবাসকারী সকল জার্মান সংখ্যালঘুদিগকে জার্মানীর মধ্যে আনয়ন করার ও পূর্ব ইয়োরোপকে জার্মানীর উপনিবেশে পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উপরন্তু, জার্মানী গোপনে পুনরস্ত্রীকরণের পথে অগ্রসর হইতেছিল, এবং সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করিয়া খোলাখুলি ভাবেই সে তাহার বিমান বাহিনী গঠন করে। কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রেই হিট্‌লার সংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন। বৃটেন যাহাতে শত্রু না হয় সেইজন্য তিনি বৃটেনের সহিত নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা হইতে জার্মানীকে বিরত রাখেন।

সমগ্র সভ্যজগতে এই নাজী বিপ্লব গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। প্রথমতঃ, কতগুলি দেশে নাজী একনায়কত্বের নিষ্ঠুরতা ও হিংসামূলক আচরণের ফলে নৈতিক ঘৃণার সৃষ্টি হয়, এবং ১৯১৯ সনের শান্তি চুক্তির উপর আক্রমণের জন্য অন্যত্র বিশেষ উদ্বেগ দেখা দেয়। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে ভয় অপেক্ষা ঘৃণার মনোভাবই বিশেষরূপে দেখা দেয়, এবং জার্মানীর প্রতি তাঁহাদের নীতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। ইটালী ও রাশিয়ায় বল-প্রয়োগের সাহায্যে সরকারী ক্ষমতা অধিকৃত হইয়াছিল বলিয়া এই দুইটি দেশে জার্মান আচরণের বিরুদ্ধে কোন নৈতিক নিন্দাভাব দেখা যায় নাই। তথাপি, হিট্‌লারের ক্ষমতালাভের আন্তর্জাতিক ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ইহারা নিজেদের নীতির পরিবর্তন করে।

পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়া :

১৯১৯ সনের পরবর্তীকালে জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে যেরূপ তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল ইয়োরোপের অন্য কোন দেশে সেইরূপ হয় নাই। জার্মানী হইতে পূর্ব প্রাশিয়াকে পৃথককারী আসমুদ্র Polish Corridor লইয়াই এই তিক্ততার সূত্রপাত; এবং ইহার জন্যই ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষোভ ছিল। পোল্যাণ্ডের সংখ্যালঘু জার্মানগণ তাহাদের প্রতি অবিচার প্রদর্শনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিকট বার বার আবেদন করে। পোল্যাণ্ড ও ডান্‌জিগের বিবাদ লইয়া কাউন্সিলকে বহুবার আলোচনা করিতে হয়। নাজী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ডান্‌জিগ বন্দরে যখন দুইশত পোল সৈন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে তখন একটি গুরুতর বিবাদের সৃষ্টি হয়। তথাপি কয়েক মাসের মধ্যেই বিবাদের মীমাংসায় প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, এবং ১৯৩৪ সনের জানুয়ারী মাসে জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের

মধ্যে একটি চুক্তির ফলে পোল্যাণ্ডের বৈদেশিক নীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই চুক্তির দ্বারা স্থির হয় যে, গত ১৫ বৎসর যাবৎ জার্মান ও পোলিশ সংবাদপত্র সমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করিতেছিল তাহা বন্ধ করা হইবে, এবং জাতিসংঘের নিকট হইতে পোল্যাণ্ডের সংখ্যালঘু জার্মানদের অভিযোগ ও ডানজিগ-সংক্রান্ত বিবাদগুলি উঠাইয়া লওয়া হইবে।

যে কারণে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, হিট্‌লারের কার্যকলাপে পশ্চিম ইয়োরোপ শত্রুভাবাপন্ন হইয়াছিল এবং কমিউনিষ্টদিগের উপর অত্যাচার করার ফলে হিটলার সোভিয়েট রাশিয়ার সহিতও মিত্রতা করিতে পারিলেন না। একাকীত্বের ভয়ে এবং দক্ষিণমুখী অভিযান সর্বপ্রথমে আরম্ভ করার প্রয়োজনে জার্মানীর পূর্ব-পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সহিত সন্ধি স্বাক্ষরিত করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আগামী ১০ বৎসরের জন্য পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনরূপ কার্যকলাপ বা প্রচারকার্যে জার্মানী লিপ্ত হইবে না এই শর্তে হিট্‌লার পোল্যাণ্ডের বন্ধুত্ব লাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ, ১৫ বৎসর যাবৎ পোল্যাণ্ড ২টি শত্রু রাজ্যের মধ্যস্থলে অস্বস্তির সহিত কাল কাটাইতেছিল; তাহার মিত্র ফ্রান্স ছিল অনেক দূরে, লোকার্নো সন্ধি দ্বারা ফ্রান্স তাহার নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে পোল্যাণ্ডের স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দিয়াছিল, এবং কিছুদিন পূর্বে চতুঃশক্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের বিরাগ-ভাজন হয়। ইহা ছাড়া, একটি বৃহৎ শক্তিরূপে জার্মানীর পুনরভ্যুত্থান বিপদের সময়ে ফরাসী-সাহায্যের সম্ভাবনাকে অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে, প্রতিবেশী উভয় বৃহৎ শক্তির সহিত শত্রুতা করা পোল্যাণ্ডের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। দুই এর মধ্যে একটির সহিত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার প্রয়োজন হইল, পোল্যাণ্ড (তাহার বিচারে) অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও বিশ্বাসী রাষ্ট্রটির সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। জার্মান-পোলিশ চুক্তিটি তাহাকে যে কেবল মাত্র ১০ বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহাই নহে, ইহার স্থায়িত্বেরও সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং ব্যাপারটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পোল্যাণ্ডের ইচ্ছা হইল।

সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্য প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। ১৯২৭ সনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য প্রধান শক্তিগুলির সহিত সোভিয়েট সরকারের সম্পর্ক সরকারীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং ঐ বৎসরে সোভিয়েট প্রতিনিধিগণ সর্বপ্রথম জেনেভায় উপস্থিত হন। আবার ঐ

বৎসরই ষ্ট্যালিনের একরাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রবাদী নীতির জয় হইল। ১৯২৮ সনের ১লা অক্টোবর রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ হইলে রাশিয়ার কর্ণধারগণ বিপ্লবের নীতিতত্ত্ব অপেক্ষা ইহার ব্যবহারিক স্বার্থের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। ১৯২৯ সনে রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে সরকারী সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে অবস্থা ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া আসিল। কেবল মাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের সহিত রাশিয়ার সম্পর্ক-স্থাপন বাকী থাকিল।

পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে অবস্থার আর কোন উন্নতি হয় নাই। কিন্তু ১৯৩২ সনের শরৎকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ফ্রান্স ও ইটালীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, এবং পরবর্তী বৎসরের প্রথম দিকে জার্মানীতে হিট্‌লারের অভ্যুত্থান ঘটিলে ও জাপান জাতিসংঘ পরিত্যাগ করিলে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৩৩ সনের গ্রীষ্মকালে জার্মানী সম্পর্কে সাধারণ ভীতি রাশিয়াকে ফ্রান্সের সন্নিকটে লইয়া আসিল, এবং সোভিয়েট সংবাদপত্রে শান্তিচুক্তি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। উপরন্তু, জাপান সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা আতঙ্কিত শক্তিদ্বয়—রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র—পরস্পরের নিকটে সরিয়া আসিল। ১৯৩৩ সনের নভেম্বর মাসে লিট্‌ভিনভ্‌ যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রচার কার্য বন্ধ করিতে এবং রাশিয়ায় অবস্থানকারী আমেরিকানদিগকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন, এবং ফলে যুক্তরাষ্ট্রও সরকারীভাবে সোভিয়েট সরকারকে স্বীকৃতি দিলেন। এইরূপে সোভিয়েট কূটনীতি জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে দুইটি শক্তিশালী মিত্র সংগ্রহ করিল।

১৯৩৪ সনের জুলাই মাসে ফ্রান্স রাশিয়ার জাতিসংঘে প্রবেশ লাভের ব্যাপারে বৃটেন ও ইটালীকে তাহার সহিত যুক্ত হইয়া অন্যান্য সভ্যদের সমর্থন লাভের জন্য প্রচার কার্য চালাইতে রাজী করিল। ফলে সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে কেবলমাত্র সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও পর্তুগালের বিরোধী ভোট ব্যতীত অন্যান্য সভ্যদের ভোটে রাশিয়া জাতিসংঘে প্রবেশ লাভ করে। পোল্যাণ্ড দুইপ্রকারের সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রথমতঃ, পোলাণ্ড সোভিয়েট সরকারের নিকট হইতে এই মর্মে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, পোল্যাণ্ডের রুশ সংখ্যালঘুগণ কর্তৃক জাতিসংঘের

নিকট কোনরূপ আবেদন করা হইলে সোভিয়েট সরকার তাহা সমর্থন করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ পোল্যাণ্ড পরিষদে ঘোষণা করিল যে, সে পোল সংখ্যালঘু-সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন জাতিসংঘ কর্তৃক বিবেচনা করার অধিকারকে স্বীকার করিবে না—এইরূপে সংখ্যালঘু সংক্রান্ত সন্ধিটিকে অস্বীকার করা হইল।

জাতিসংঘের সভ্যপদলাভ রাশিয়ার হিট্‌লার-ভীতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে পারে নাই। ফলে রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত একটি প্রত্যক্ষচুক্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। অবশ্য ইহাতে ফ্রান্সেরও আপত্তি ছিল না। তবে সে বুঝিল যে, জার্মানীকে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে স্থাপিত চুক্তিতে যোগদান করিবার অধিকার দিলে বৃটেন এইরূপ চুক্তিতে কোন আপত্তি করিবে না। ইহার ফলে ফরাসী ও সোভিয়েট সরকারদ্বয় এইরূপ খসড়া প্রস্তুত করিল যাহার দ্বারা ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে যেমন পরস্পরকে সাহায্য করিবে, তেমনি জার্মানীর উপর উভয়ের একজন আক্রমণ করিলে অপরজন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জার্মানীকে সাহায্য করিবে। যদিও খসড়াটি বস্তুতঃ কৃত্রিম ছিল, তথাপি বৃটেন ১৯৩৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহা অনুমোদন করিলে অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত ইহা জার্মানীর নিকট প্রেরিত হয়। জার্মানী এমন কতগুলি আপত্তি উত্থাপন করে যাহা খসড়াটি প্রত্যাখানের সমতুল ছিল। ফলে ফ্রান্স ও রাশিয়া যাহা কামনা করিয়াছিল তাহাই ঘটিল। ১৯৩৫ সনের মে মাসে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হয়। নাজী বিপ্লবের ফলে যুদ্ধ-পূর্ব রুশ-ফরাসী বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপিত হয়।

অষ্ট্রিয়া ও ইটালী।

জার্মান বৈদেশিক নীতির প্রথম লক্ষ্য হিসাবে অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ হিটলারের পক্ষে নানাদিক হইতে দুর্ভাগ্য-জনক হইয়াছিল। ১৯১৯ হইতে ১৯৩৩ সন পর্যন্ত অধিকাংশ অষ্ট্রিয়াবাসী জার্মানীর সহিত সংযুক্তিকরণ কামনা করিত; এবং এই সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে 'ভেটো' প্রয়োগ তীব্র সমালোচনার কারণস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নাজী বিপ্লবের ফলে বহু অষ্ট্রিয়ান জার্মান-বিরোধী হইয়া উঠিল। অষ্ট্রিয়ান পার্লামেণ্টের সংখ্যা-গরিষ্ঠ সমাজবাদী—গণতন্ত্রীদল (Social Democrats), অথবা ভিয়েনা নগরীর

প্রভবিশালী ও সংখ্যাবহুল ইহুদীগণ জার্মানীতে বসবাসকারী তাহাদের বন্ধুদের ন্যায় দুর্দশা ভোগ করিতে প্রস্তুত ছিল না। ইহা ছাড়া, ক্যাথলিকদের প্রতি জার্মান নাজীদের দুর্ব্যবহার অষ্ট্রিয়ান রাজনীতিতে প্রভাবশালী ক্যাথলিকদিগকে শক্রতে পরিণত করিয়াছিল। উপরন্তু, জার্মানীর নবশাসনব্যবস্থার নির্মম দক্ষতা সরলভাবাপন্ন অষ্ট্রিয়ানদিগের পক্ষে অস্বস্তিকর মনে হইয়াছিল।

প্রথম দিকে অষ্ট্রিয়া নাজী বিপ্লবের অনুকরণ করিয়া চলিয়াছিল। ১৯৩৩ সনের মার্চ মাসে অষ্ট্রিয়ার চেন্সেলর ডল্‌ফাস শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া চেম্বারের সমাজবাদী—গণতন্ত্রীদলের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করিলেন। এই সময় হইতে অষ্ট্রিয়ান সরকার Heimwehr নামক একটি বেসরকারী সৈন্যদলের সমর্থনের উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল ছিল। এবার জার্মান সরকার তাহার কাজ আরম্ভ করিল। অষ্ট্রিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে রেডিওর সাহায্যে প্রচার কার্য আরম্ভ হইল, নাজীদের প্রচারপত্রগুলি হাওয়াই জাহাজ হইতে অষ্ট্রিয়ায় নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, অষ্ট্রিয়ান নাজীদিগের জন্য অর্থ ও অস্ত্র চোরাইভাবে প্রেরিত হইল, এবং জার্মানদিগকে অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিতে বাধা দিবার জন্য ভিসা ফিঃ (Fee) অস্বাভাবিক ভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ফলে, ১৯৩৩ সনের জুন মাসে অষ্ট্রিয়ান সরকার অষ্ট্রিয়ার নাজীদলকে দমন করিতে বাধ্য হইল।

বৃহৎশক্তিগুলির হস্তক্ষেপ না ঘটিলে Heimwehr ও কয়েক শ্রেণীর লোকের বাধাদান সত্ত্বেও জার্মানীর রাজনৈতিক চাপের নিকট অষ্ট্রিয়াকে মাথা নোয়াইতে হইত। নাজী শাসনের অত্যাচারের প্রতি জন সাধারণের ঘৃণা ক্রমে চরমে উঠিয়াছিল, এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণের জন্য এই ঘৃণা আরও প্রবল হইল। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ফরাসী জনমতের ন্যায় বৃটিশ জনমতও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল। বার্লিনে কূটনৈতিক উপায়ে প্রতিবাদ পেশ করা হইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। আগষ্ট মাসে বৃটেন ফ্রান্স, ইটালী এবং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্রশক্তিকর্তৃক অঙ্গীকৃত আরও একটি আন্তর্জাতিক ঋণ অষ্ট্রিয়া লাভ করিল। এই সময় হইতে ইটালী অষ্ট্রিয়ার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইল। পূর্বে, কয়েকবৎসর যাবৎ ইটালী একটি সন্ধি-পরিবর্তনকামী এবং অসন্তুষ্ট রাষ্ট্র ছিল; এবং অল্প কিছুদিন যাবৎ সে সকল প্রশ্নে জার্মানীকে সমর্থন করিতেছিল; কিন্তু নাজী বিপ্লব ইটালীর বৈদেশিক নীতিতেও

পরিবর্তন আনিয়াছিল। তবে জার্মানী অষ্ট্রিয়া অধিকার করিলে, দক্ষিণ টাইরল নামক জার্মান-অষ্ট্রিয়ান প্রদেশ-অধিকারকারী রাষ্ট্রের সন্নিকটে এক ভয়ানক প্রতিবেশীর আবির্ভাব হইত। ১৯৩৩—'৩৪ সনের শীতকালে ইটালীয়ান সরকার গোপনে গোপনে Heimwehr কে সাহায্য পাঠায় এবং প্রতিদানে মুসোলিনী অষ্ট্রিয়ার সমাজবাদী-গণতন্ত্রীদের (ইহারা তখনও ভিয়েনার মিউনিসিপ্যালিটির উপর কর্তৃত্ব করিত) সকল প্রকার ক্ষমতা হইতে অপসারণ ও অষ্ট্রিয়ায় ফেসিষ্টপন্থী সরকার গঠনের দাবী করিলেন। ১৯৩৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে এইদাবা অনুযায়ী কার্য করা হইল, এবং ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন বাধা সৃষ্ট হয় নাই। কয়েকশত সমাজবাদী-গণতন্ত্রী নেতকে কারারুদ্ধ করা হয়, এবং সকল সমাজবাদী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অষ্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি ইটালীর অধীনস্থ হইল।

এই সকল ব্যাপারের ফলে অষ্ট্রিয়া বৃটেনের জনসাধারণের সহানুভূতি বহুলাংশে হারাইয়াছিল। ১৯৩৪ সনের ২৫শে জুলাই অষ্ট্রিয়ান নাজীদের একটি দল চ্যান্সেলরের মহাধিকরণ দখল করে ও ডলফাস্‌কে মারাত্মকভাবে আহত করে। অবশ্য, বিদ্রোহীরা সেনাবাহিনী বা জনসাধারণের অধিকাংশের সহানুভূতি লাভ করিতে অক্ষম হয়, এবং দিনের শেষে সরকার ভিয়েনার অবস্থা নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে সক্ষম হয়। ইহা সাধারণ ভাবে অনুমিত হইল যে, এই বিদ্রোহ জার্মানীর সাহায্যেই সংঘটিত হইয়াছিল, এবং ডলফাসের মৃত্যুর জন্য হিট্‌লারকে অনেকেই দায়ী করে। ইতিমধ্যে ইটালীয়ান বাহিনী অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে প্রেরিত হয় এবং অনেকের ধারণা, বিদ্রোহীরা কৃতকার্য্য হইলে এই বাহিনী বিদ্রোহীদের দমনের জন্য অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিত।

এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলে হিটলার তাঁহার কর্মপন্থার পরিবর্তন করেন। অষ্ট্রিয়ান নাজীদের কার্যকলাপে তিনি আর উৎসাহ দিলেন না এবং অষ্ট্রিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে জার্মাণ প্রচারকার্যও প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। হিটলার অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে বা তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে জার্মানীর কোনরূপ অভিপ্রায় নাই বলিয়া একাধিকবার ঘোষণা করিলেন। দুই বৎসর এই নীতি বলবৎ ছিল। ১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে ইটালীর আবিসিনীয়া অভিযানের ফলে মধ্যইয়োরোপে ইটালীর কর্তৃত্ব হ্রাস পাইলে অষ্ট্রিয়া জার্মানীর সহিত একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত করে এবং ইহার অত্যল্পকাল পরেই Heimwehrকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় (এই

সময় এই বাহিনীকে ইটালী আর সাহায্য পাঠাইতে পারিতেছিল না।) এইসকল ঘটনার ফলে অষ্ট্রিয়ার উপর একটি জার্মান-ইটালীয়ান দ্বৈত কর্তৃত্বের সৃষ্টি হইল এবং ক্রমে জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হইল।

ফ্রান্স, ইটালী ও ক্ষুদ্র শক্তিত্রয়:

১৯৩৩-'৩৪ সনের শীতকালে জার্মানীর সহিত ইটালীর সম্পর্কের অবনতির প্রভাব মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি ঘটিল। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার সাধারণ প্রয়োজনে রাষ্ট্রদ্বয় পরস্পরের আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু সহজেই ইহাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হইল না। মধ্য ইয়োরোপে উভয় পক্ষেরই তাঁবেদার ছিল। চেকোশ্লাভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়া ফ্রান্সের মিত্র ছিল, আবার ইটালী বহুদিন যাবৎ হাঙ্গেরীর সমর্থন করিয়া আসিতেছিল এবং ১৯৩৪ সনের মার্চমাসে রোমে ইটালী, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যে আংশিকভাবে রাজনৈতিক ও আংশিকভাবে অর্থনৈতিক কতগুলি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং উভয়ে তাহাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে পরিত্যাগ করিতে রাজী না হইলে ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করিবার পূর্বে মধ্য ইয়োরোপের এই প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুইটির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির প্রয়োজন ছিল। ইটালীর পক্ষে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে এই বিষয়ে চাপ দেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রত্রয় সম্পর্কে ফ্রান্স কতদূর কি করিতে পারিত এখানে তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র শক্তিত্রয় চতুঃশক্তি চুক্তিতে ফ্রান্সের অংশ গ্রহণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এবং ইটালী-সম্পর্কে তদানীন্তন ফরাসী নীতি তাহাদিগকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল। অবশ্য এই সন্দেহ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রত্রয়ের সমান পরিমাণে ছিল না। বস্তুতঃ, অষ্ট্রিয়ার উপর হিটলারের হুমকির ফলে ইহাদের মধ্যে প্রথম বিবাদের সূত্রপাত হয়। জার্মানী কর্তৃক অষ্ট্রিয়া অধিকৃত হইলে চেকোশ্লাভাকিয়ার চতুর্দিকে শত্রুর বেষ্টনী সৃষ্টি হইবে বলিয়া ইহার প্রতিরোধের জন্য ইটালী ও ফ্রান্সের সকল প্রকার ব্যবস্থাকেই চেকোশ্লাভাকিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জার্মানী কর্তৃক অষ্ট্রিয়া অধিকৃত হইলে যুগোশ্লভিয়ার কোন ভয়ের কারণ ছিল না; ইটালী অষ্ট্রিয়ায় কর্তৃত্ব লাভ করিলে যুগশ্লোভিয়ার ইটালী কর্তৃক বেষ্টনীবদ্ধ হওয়ার ভয় ছিল, এবং এই জন্য ফ্রান্স ও ইটালীর

মধ্যে বন্ধুত্বের মাধ্যমে অষ্ট্রিয়ায় ইটালীর প্রাধান্য স্থাপনের পরিকল্পনায় যুগোশ্লাভিয়া সম্মতি দিতে পারে নাই। রুমানিয়া অনেক দূরে ছিল বলিয়া জার্মানী বা ইটালী কর্তক অষ্ট্রিয়া অধিকৃত হইলে তাহার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না; সে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রত্রয়ের একতা বজায় রাখা লইয়াই ব্যস্ত ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রত্রয় কেবলমাত্র মুখেই অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্পর্কে ঔৎসুক্য দেখাইত। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে অষ্ট্রিয়া অন্যকোন রাষ্ট্রের অধিকারে আসিলে চেকোশ্লভাকিয়া চাহিত যে, এই অধিকার-কারী ইটালী হইলেই তাহার পক্ষে ভাল, আবার যুগশ্লভিয়ার পক্ষে জার্মানী এইরূপ অধিকার-কারী হইলেই ভাল হইত।

১৯৩৪ সনের অক্টোবর মাসে যুগোশ্লভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ফরাসী সরকারের সহিত আলাপ আলোচনার জন্য ফ্রান্সে আগমন করিলে তিনি এবং ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বার্থো একজন ক্রোট সন্ত্রাসবাদী কর্তৃক নিহত হন। ইহা সকলেই জানিত যে, ইটালী ও হাঙ্গেরী উভয়েই ভবিষ্যতে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য অসন্তুষ্ট যুগোশ্লাভদিগকে পোষণ ও সাহায্য করিত। এই হত্যা-কাণ্ডে ইটালী বা হাঙ্গেরীর প্রত্যক্ষ যোগসাজসের কোন সঠিক প্রমাণ ছিল না; কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া জাতিসংঘের নিকট প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত করিল; এবং ফ্রান্স ও ইটালী তাহাদের উভয়ের সম্পর্কের উন্নতিকল্পে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত না হইলে ব্যাপারটি গুরুতর আকার ধারণ করিত। শেষ পর্য্যন্ত এইরূপে বোঝাপড়া হইল যে, যুগোশ্লভিয়া একমাত্র হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ করিবে; বিনিময়ে ইটালী হাঙ্গেরীকে সেই পরিমাণ শাস্তি গ্রহণ করিতে রাজী করাইবে যাহা দ্বারা যুগশ্লাভিয়ার ক্রোধের উপশম হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জেনেভায় অভিযোগটি পেশ করা হয়, এবং দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করিল যে, এই হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতি সংক্রান্ত দায়িত্ব আংশিকভাবে হাঙ্গেরী সরকারের গ্রহণ করা উচিত এবং কোন হাঙ্গেরীয় কর্মচারীর দোষ প্রমাণিত হইলে সরকার কর্তৃক তাহার শাস্তি বিধান হওয়া উচিত।

আলেকজাণ্ডারের হত্যার ফলে ইটালী সম্পর্কে যুগোশ্লভিয়ার সন্দেহ বৃদ্ধি পায়, যুগোশ্লভিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে বন্ধুত্ব কিছু পরিমাণে শিথিল হয় এবং ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে সৌহার্দ্যের পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৩৫ সনের জানুয়ারী মাসে নূতন ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব লাভাল রোমে আগমন করিয়া মুসোলিনীর

সহিত কতগুলি চুক্তি সম্পাদন করেন। এইরূপে দীর্ঘকালীন ফরাসী-ইটালীয়ান বিরোধের অবসান ঘটে। জার্মানী সম্পর্কে স্থির হয় যে জার্মানী পুনরস্ত্রীকরণ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলে এই দুই শক্তি তাহাদের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবে; মধ্য ইয়োরোপ সম্বন্ধে স্থির হয় যে অষ্ট্রিয়া ও (সুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত) তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি তাহাদের পরস্পরের কার্যকলাপে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না, একে অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে না, অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে প্রয়াসী হইবে না বলিয়া একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে। (অবশ্য এইরূপ চুক্তি সম্পাদনের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই।) অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার আশংকা দেখা দিলে চুক্তিবদ্ধ এই দুই রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়া ও তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত আলাপ আলোচনা করিবে। লণ্ডন সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইটালীর দাবী পুরণার্থে ফ্রান্স লিবিয়া নামক ইটালীয়ান প্রদেশ-সংলগ্ন ফরাসী ইকোয়েটারিয়াল আফ্রিকার একটি অংশ এবং এরিট্রিয়ার সংলগ্ন ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের একটি অংশ ইটালীকে অর্পণ করে, টিউনিস-এ ইটালীয়ানদের মর্যাদা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, এবং লাভাল মুসোলিনীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ইটালী আবিসিনীয়ায় কোনরূপ সুবিধা লাভ করিলে ফ্রান্স তাহাতে আপত্তি করিবে না। অবশ্য পরে ফ্রান্স জানাইয়াছিল যে, ইহা দ্বারা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সুবিধাই বুঝিতে হইবে।

ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন হিটলারের ক্ষমতালাভ দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল। পোল্যাণ্ড ফ্রান্সের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায় ও জার্মানীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সন্ধি-পরিবর্তনকারী মনোভাবের পরিবর্তন করিয়া ভার্সাই ব্যবস্থা বজায় রাখার ফরাসী-নীতি গ্রহণ করে। ইটালী জার্মান-বিরোধীদলে যোগ দেয়, যদিও মধ্য ইউরোপে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে সে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে থাকে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া ফ্রান্স ও ইটালীর পথ অনুসরণ করিয়া অষ্ট্রিয়ার নিকটে আসিল; অপরপক্ষে যুগোশ্লভিয়া ফ্রান্সের নিকট হইতে দূরে সরিয়া ইটালীর নিকটবর্তী হইল এবং ক্রমে দ্রুতগতিতে জার্মানীর সামীপ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৯৩৫ সনের মে মাসে সোভিয়েট-ফরাসী সন্ধি অনুযায়ী চেকোশ্লভাকিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হইলে শক্তিগোষ্ঠিগুলির পুনর্বিন্যাস সমাপ্ত হইল এবং Little Entente-এর মধ্যে পার্থক্য বিরাট

আকার ধারণ করিল। রুমানিয়া এইরূপ চুক্তি সম্পাদনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল, এবং যুগোশ্লাভিয়া সোভিয়েট সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করিল।

বল্‌কান রাষ্ট্রগুলির বন্ধুত্ব :

১৯৩৪ সনে বল্কান অঞ্চলেও নূতন শক্তিগোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল। যুগোশ্লভিয়া, রুমানিয়া ও গ্রীস বুলগেরীয়ার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হইয়া নিজদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিল। তুরস্ক বল্কান রাজনীতি হইতে যুদ্ধোত্তরকালে বহুদিন যাবৎ নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখে এবং রাশিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু ১৯৩০ সনে সে গ্রীসের সঙ্গে শত্রুতা মিটাইয়া ফেলে এবং ১৯৩২ সনে জাতিসংঘে যোগদান করে। ১৯৩৪ সনে তুরস্ক, যুগোশ্লভিয়া, রুমানিয়া ও গ্রীস পরস্পরের সহিত তাহাদের বল্কান সীমান্ত সম্পর্কে অঙ্গীকারমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বুলগেরিয়া এই জাতীয় চুক্তিতে বিশ্বাসী ছিল না, কারণ তাহার প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে সে সর্বদাই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিল। আলবেনিয়াকে এই চুক্তিতে যোগ দিতে আমন্ত্রিত করা হয় নাই।

কিন্তু বল্কান রাষ্ট্রগুলির এই মিত্রতার বন্ধন দুর্বল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। কারণ, যুগোশ্লাভিয়া বল্কান সমস্যায় ইটালীর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিজেকে শক্তিশালী করিবার জন্যই এই চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল, আবার গ্রীস ইটালীর নৌশক্তির সহিত সংঘর্ষের ঝুঁকি লইতে রাজি ছিল না বলিয়া ঘোষণা করিল যে, এই চুক্তির দ্বারা বল্কান-বহির্ভূত কোন শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার কোন দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে না এবং ইহার ফলে গ্রীস ও যুগোশ্লভিয়ার বন্ধুত্বে কিছুটা ভাটা পড়িল। ইতিমধ্যে, যুগোশ্লভিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিল। যুগোশ্লভদের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি নূতন বুলগেরীয় সরকার ইটালীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া যুগোশ্লভ সীমান্তের মেসিডোনীয় সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। ইহার পরে বল্কানদের অবস্থা অনিশ্চিত রহিয়া গেল। তবে বল্কান রাষ্ট্রগুলির মিত্রতা টিকিয়া থাকিল। কিন্তু, যুগোশ্লাভিয়া গ্রীস অপেক্ষা বুলগেরিয়ার সঙ্গেই অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ১৯৩৫ সনের মার্চমাসে গ্রীসে গৃহযুদ্ধের পরে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ইহার দ্বারা সাধারণ রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

১৯৩৬ সনের জুন মাসে, মণ্ট্রুক্সের সম্মেলনে লুসান-সন্ধি-স্বাক্ষরকারীগণ তুরস্কের অনুরোধে প্রণালীগুলির (The Straits) নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সন্ধিটির ধারাগুলি পরিবর্তন করিতে সম্মত হইল। ইহার ফলে তুরস্ক প্রণালীগুলিকে দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করার অধিকার লাভ করে এবং শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে প্রণালীগুলির মধ্য দিয়া যুদ্ধজাহাজ চলাচলের নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

সন্ধি-লঙ্ঘন

(The Repudiation of Treaties)

জার্মানীর সন্ধি লঙ্ঘন :

১৫৩৫ সনের মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পনর মাসের মধ্যে বহু আন্তর্জাতিক সন্ধি প্রত্যক্ষভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছিল। এযাবৎ শান্তিচুক্তিগুলি কখনও কখনও পারস্পরিক মতৈক্য, মৌন সম্মতি, বা গোপন ছলনার সাহায্যে অমান্য করা হইয়াছিল। কিন্তু শক্তিশালী জার্মানী এখন সরকারী ভাবেই ভার্সাই সন্ধি মানিয়া লইতে অস্বীকার করে এবং লোকার্ণো সন্ধিটিও অমান্য করে। ইতিমধ্যে আর একটি বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তি কোন অজুহাত ব্যতিরেকেই জাতিসংঘের আর একটি সভ্যরাষ্ট্রের রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। এইরূপে শান্তিব্যবস্থা ও নিয়মপত্রের উপর দুইদিক হইতে প্রবল আঘাত হানা হয়।

ভার্সাইসন্ধির বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্বে হিটলারকে একটি পুরাতন সমস্যার সমাধানের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সান্ধি-অনুযায়ী স্থির হইয়াছিল যে, সন্ধি চালু হইবার ১৫ বৎসর পর 'সার'এর ভাগ্য গণভোট দ্বারা নির্ধারিত হইবে ; ১৯৩৫ সনের জানুয়ারী মাসে এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। গণভোট সুচারুরূপে গৃহীত হয়। সার-এর অধিবাসী-গণকে জার্মানীর সহিত পুনর্মিলন, ফ্রান্সের সহিত সংযুক্তি-করণ বা জাতি-সংঘ-শাসন বজায় রাখা—এই তিনটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হয়। পাঁচলক্ষ প্রদত্ত ভোটের মধ্যে শতকরা ৯০টি ভোট জার্মানীর পক্ষে এবং শতকরা প্রায় ৯টি ভোট রাষ্ট্রসংঘ শাসনের পক্ষে পড়ে। ফলে ১লা মার্চ এই অঞ্চল জার্মানীকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ইহার পর হিট্‌লার ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমে জার্মানীর আর কোন অঞ্চল অধিকার করার লোভ নাই।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বৃটেন ও ফ্রান্সের মন্ত্রীগণ লণ্ডনে মিলিত হইয়া জার্মান ও অন্যান্য সরকারের অবগতির জন্য তাঁহাদের নীতির ঘোষণা প্রসঙ্গে এইরূপ আশা প্রকাশ করিলেন যে, প্রস্তাবিত পূর্ব ও মধ্য ইউরোপীয়

চুক্তিগুলিতে জার্মান সরকার সহযোগিতা করিবে ; উপরন্তু তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, লোকার্ণো সন্ধির পরিপূরক হিসাবে এরূপ একটি বিমান-চুক্তি সম্পাদিত হওয়া উচিত যাহা দ্বারা লোকার্ণো শক্তিগুলির একটির উপর অন্যকোন শক্তি আক্রমণ করিলে আক্রান্ত রাষ্ট্রটির সাহায্যের জন্য সকল লোকার্ণো শক্তি তাহাদের বিমান বাহিনী নিয়োগ করিবে। এই প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই ছিল যে, বৃটেন লোকার্ণো—সন্ধি অনুযায়ী কেবলমাত্র গ্যারান্টি দাতাই হইবে না, তাহার উপর জার্মান বিমানের আক্রমণ ঘটিলে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক, এবং ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের আক্রমণের বিরুদ্ধে জার্মানী কর্তৃক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি সে পাইবে।

জার্মান সরকার বৈমানিক চুক্তিটির প্রতি স্বাগত জানাইল, অন্যান্য প্রস্তাব সম্পর্কেও চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রতিশ্রুতি দিল, এবং সমস্ত বিষয়টি আলোচনা করিবার জন্য বৃটিশসরকারের সঙ্গে মিলিত হইবার প্রস্তাব করিল। বৃটিশ সরকার ইহাতে সম্মত হইল, এবং পররাষ্ট্র সচিব সাইমন্ ও জাতিসংঘ সংক্রান্ত মন্ত্রী ইডেন বার্লিন পরিদর্শনের একটি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই পরিদর্শনের পূর্বে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল। একটি স্মারকলিপি প্রকাশ করিয়া বৃটিশ সরকার পার্লামেন্টের নিকট ইহার পুনরস্ত্রীকরণের কারণগুলি ব্যাখ্যা করে ; এবং এই স্মারকলিপিতে জার্মান-আক্রমণের ভীতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ইহার বিরুদ্ধে জার্মানীতে ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। অসুস্থতার অজুহাতে হিটলার বৃটিশ মন্ত্রীদের বার্লিনে আগমনের নির্দিষ্ট তারিখ বাতিল করিয়া দিলেন। এই সময় ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বৃদ্ধি কল্পে ফরাসী পরিষদে বিতর্ক চলিতেছিল। ইহার সুযোগ লইয়া ১৯৩৫ সনের ১৬ই মার্চ হিটলার ঘোষণা করিলেন যে, ভার্সাই সন্ধির সামরিক ধারাগুলি মানিয়া চলিতে জার্মানী আর বাধ্য থাকিবে না, তাঁহার শান্তিকালীন সৈন্য সংখ্যা ভবিষ্যতের জন্য ৩৬ ডিভিশন অথবা সাড়ে পাঁচ লক্ষে নির্দিষ্ট হইবে, এবং বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করা হইবে।

এই ঘোষণার ফলে ফ্রান্সে ভয়ানক দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। বৃটেনের জনমত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ফলে জার্মানীর পুনস্ত্রীকরণের সম্ভাবনাকে বহুদিন যাবৎ আমল দেয় নাই। এবার হিট্লার সাইমন ও ইডেনকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং বৃটিশ সরকারও ইহা প্রত্যাখ্যান করিবার

মত কোন কারণ দেখিল না। ইহার ফলে ফরাসী, ইটালিয়ান ও সোভিয়েট শক্তি-গোষ্ঠির মধ্যে যে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল ইডেনের ওয়ারশ, মস্কো এবং প্রাগ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত তাহা কিছু পরিমাণে প্রশমিত করে। ২৫শে মার্চ বার্লিন পরিদর্শন ঘটিয়াছিল, কিন্তু ইহার কার্য্যকরী ফলাফল উল্লেযোগ্য হয় নাই। হিটলার বৈমানিক চুক্তিটির প্রতি পুনরায় স্বাগত জানাইলেন, এবং পূর্ব ও মধ্য ইউরোপীয় চুক্তিগুলি সম্পর্কে তাঁহার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহার শান্তিপ্রিয় উদ্দেশ্যের পুনরুল্লেখ করিলেন, এবং জার্মানবাহিনীর নির্দিষ্ট সংখ্যার পরিবর্তন করিতে রাজী হইলেন; তবে স্থলসৈন্যের পরিমাণ অন্যান্য শক্তি সীমাবদ্ধ করিতে চাহিলে জার্মানীও ইহা মানিয়া লইবে বলিয়া মত প্রকাশ করা হয়; বৈমানিক শক্তিতে জার্মানী ফ্রান্সের সহিত সমতা দাবী করে, যদিও সোভিয়েট বিমান শক্তির দ্রুত উন্নতির ফলে এই দাবী সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা হইতে পারিবে; নৌশক্তিতে সমস্ত শ্রেণীর জাহাজের ক্ষেত্রে সে বৃটিশ নৌশক্তির শতকরা ৩৫ ভাগ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে।

ইতিমধ্যে জার্মানীর কার্যধারা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ফ্রান্স জাতিসংঘের কাউন্সিলে একটি বিশেষ অধিবেশনের দাবী করে, এবং ইহার প্রস্তুতির জন্য বৃটিশ, ফরাসী ও ইটালীয়ান রাষ্ট্রনায়কগণ ষ্ট্রেসা নামক স্থানে মিলিত হন। এই ষ্ট্রেসা সম্মেলন প্রস্তাবিত পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপীয় চুক্তিগুলির পুনরনুমোদন করে, এবং প্রাক্তন ক্ষুদ্র শত্রুরাষ্ট্রগুলিকে পুনরস্ত্রীকরণের অনুমতি দেওয়ার প্রশ্ন লইয়া একটি সিদ্ধান্তহীন আলোচনা চালায় (অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া ইটালী পুনরস্ত্রীকরণের পক্ষে এবং Little Entente কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া ফ্রান্স ইহার বিপক্ষ মত প্রকাশ করে)। কিন্তু এই সম্মেলনের প্রধান কার্য হইল জার্মানী কর্তৃক ভার্সাই সন্ধির দায়িত্ব অস্বীকার করার বিরুদ্ধে কাউন্সিলের নিকট পেশ করার জন্য একটি প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করা। এই ত্রিশক্তি কর্তৃক প্রস্তাবটি কাউন্সিলে পেশ করা হইলে ডেনমার্ক ব্যতীত অন্যসকল সভ্যের সমর্থনক্রমে ইহা পাশ হইয়া যায়। তবে এই প্রস্তাবের উপর কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই, এবং জার্মানীতে ভয়ানক উষ্মার সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ, বৃটেন তাহার পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে বার্লিনে প্রেরণ করিয়া জার্মানীর কার্যাবলীতে মৌন সমর্থন জানাইয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে জেনেভায় জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণে বৃটেন নেতৃত্ব করিলে জার্মানী বিমূঢ় হইয়া পড়িল।

ইহা অপেক্ষা আরও একটি চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটিল। কাউন্সিলের অধিবেশন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বার্লিনে খবর পাঠান হইল যে, বৃটিশ নৌশক্তির শতকরা ৩৫ ভাগ জার্মানীর জন্য নির্দিষ্ট করার জার্মানী প্রস্তাবটি বৃটেন মানিতে প্রস্তুত, এবং এই মর্মে একটি চুক্তি করিতে আগ্রহান্বিত। জার্মান প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন, এবং জুন মাসে একটি এ্যাংলো-জার্মান নৌচুক্তি সম্পাদিত হয়। এইরূপে বৃটিশ সরকার জার্মানী কর্তৃক ভার্সাই সন্ধির নিরস্ত্রীকরণীয় ধারাগুলি অমান্য করার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করিলেও, ঐ সন্ধির নৌসংক্রান্ত বাধা-নিষেধ জার্মানী কর্তৃক অবহেলা করার অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। এই চুক্তিটি ইংরেজদের প্রখর সাধারণ বুদ্ধির প্রমাণ-সূচক। কারণ ফ্রান্স যখন প্রত্যেকটি মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করিয়া জার্মান স্থলবাহিনীর সীমাহীন পুনরস্ত্রীকরণে ইন্ধন যোগাইয়াছিল, বৃটেন তখন চুক্তিতে রাজী হইয়া জার্মান নৌশক্তিকে সীমায়িত করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু, এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স, ইটালী ও রাশিয়া পরম বিস্মিত হইল।

১৯৩৫ সনের প্রথমার্দ্ধে জার্মানীর প্রতি বৃটিশ নীতির পরিবর্তনশীলতার কারণ ছিল দুইটি বিরোধী নীতির অস্তিত্ব। নাজী বিপ্লবের পরবর্তী দুই বৎসর নাজীদের বাড়াবাড়ি বৃটিশ জনমতকে জার্মান ক্ষোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল করে; এবং বৃটিশ সরকার স্থিতাবস্থা, বিশেষতঃ মধ্য ইউরোপের শান্তি বজায় রাখিবার জন্য ফরাসী, ইটালীয়ান ও সোভিয়েট সরকার সমূহের আত্মরক্ষা মূলক মিত্রতা স্থাপনের প্রয়াসে উৎসাহ দেয়। কিন্তু ১৯৩৫ সনের জানুয়ারী মাসে যখন ফরাসী-ইটালীয়ান সৌহার্দ্য স্থাপনের দ্বারা এই মৈত্রীমূলক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইতে চলিল, তখন নাজী শাসনের বিরুদ্ধে বৃটেনের ঘৃণা হ্রাস পাইল। অনেকের বিশ্বাস হইল যে, ফ্রান্সের সহিত ইটালী ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বন্ধুত্বের ফলে জার্মানী নিঃসঙ্গ ও চারিদিক হইতে বেষ্টনীবদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং ভার্সাই সন্ধির বৈশিষ্ট্য-গুলি অপরিবর্তিত থাকিয়া নাজী বিপ্লবের কারণগুলিকে বলবৎ রাখে। তাহাদের মতে জার্মানীর চতুর্পার্শ্বস্থ বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া, তাহার অভিযোগ সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করা, এবং তাহাকে জাতিসংঘে ফিরাইয়া আনা বৃটিশ সরকারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাইমন কর্তৃক বার্লিন পরিদর্শন এইরূপ চিন্তাধারার প্রতি সহানুভূতি সূচক। কিন্তু বৃটেনে

আবার অনেকে তখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিত যে, জার্মান বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বৃটিশ সরকারের উচিত অন্যান্য শক্তিকে সমর্থন করা, এবং ষ্ট্রেসা ও জেনেভায় উপস্থিত বৃটিশ প্রতিনিধিদের দৃষ্টি ভঙ্গীতে এই মতের আনুকূল্য দেখা যায়। ইহার পরে, ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তি সম্পাদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানীর সহিত বোঝাপড়ার নীতি আবার প্রাধান্য লাভ করে। ফলে, বৃটিশ নীতি সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা প্রকাশ পাইল তাহার দ্বারা ফ্রান্স ও তাহার বন্ধু মহলে বৃটিশ অভিপ্রায় সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং বৃটিশ নীতির পরিবর্তনের আশায় জার্মানী উৎসাহিত বোধ করে ; অবশ্য এই আশা কার্যে পরিণত হয় নাই।

ইটালী কর্তৃক সন্ধিলঙ্ঘন :

লণ্ডনসন্ধি অনুযায়ী ইটালীর দাবী সম্পর্কে মীমাংসা হইয়া গেলেও ইটালীর ঔপনিবেশিক আশার তখনও নিরসন হয় নাই। বৃটেন বা ফ্রান্সের নিকট হইতে আর কিছু পাইবার আশা ছিল না বলিয়া মুসোলিনী স্বীয় চেষ্টার উপর ভরসা করিলেন। ১৯৩৫ সনের প্রথমদিকে ইয়োরোপে ফ্রান্সের পক্ষে ইটালীর বন্ধুত্বের প্রয়োজন এত বেশী হইয়াছিল যে, সে আফ্রিকায় ইটালীকে যে কোন সুবিধা দিতে প্রস্তুত ছিল। মুসোলিনীও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে দেরী করিলেন না, এবং রোমের একটি বৈঠকে আবিসিনিয়ায় ইটালীর অগ্রগমন-নীতির পক্ষে লাভালের অনুমোদন আদায় করিলেন।

কয়েকটি কারণের জন্য আবিসিনীয়াকে ইটালীর ঔপনিবেশিক আকাঙ্খা পরিতৃপ্তির জন্য নির্বাচিত করা হইয়াছিল। লাইবেরিয়া ব্যতীত আবিসিনীয়াই আফ্রিকায় একমাত্র স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ছিল। সোমালিল্যাণ্ড ও এরিট্রিয়া নামক দুইটি ইটালীয় উপনিবেশের মধ্যে ইহা অবস্থিত ছিল ; এবং খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধিও ছিল। উপরন্তু, ১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে ওয়ালওয়াল গ্রামের নিকট আবিসিনীয় বাহিনীর সঙ্গে ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ডের একটি সেনাদলের সহিত সংঘর্ষে কয়েকজন ইটালীয়ান নিহত হইলে ইটালীয়ান সরকার আবিসিনীয়ার নিকট ক্ষতিপূরণ ও দুঃখ-প্রকাশোক্তি দাবী করে। ইহার ফলে আবিসিনীয়া জাতিসংঘের নিকট আবেদন করে এবং নিয়মপত্রের ১১নং ধারানুযায়ী এই বিবাদটি জাতি-সংঘের আলোচ্যবিষয় রূপে অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুরোধ করে।

নিয়মপত্র ও প্যারিসের সন্ধি ব্যতীত ইটালীর যুদ্ধপরায়ণ কার্যের আরও দুইটি অন্তরায় ছিল। ১৯০৬ সনে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইটালী আবিসিনীয়ার অখণ্ডতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি করিয়াছিল; ১৯২৮ সনে ইটালী ও আবিসিনীয়ার মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির দ্বারা উভয় রাষ্ট্র উভয়ের মধ্যে শান্তি ও স্থায়ী বন্ধুত্ব রক্ষার অঙ্গীকার করিয়া ছিল; এবং তাহাদের সকল প্রকার বিবাদ বোঝাপড়া বা সালিসীর দ্বারা মীমাংসিত হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইহা ছাড়া, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘে আবিসিনীয়ার প্রবেশের সময় ইটালীও ইহাতে সমর্থন করিয়াছিল, সুতরাং, ১৯৩৫ সনের জানুয়ারীতে কাউন্সিলের সম্মুখে আবিসিনীয় আবেদন উপস্থিত হইলে নিয়মপত্রের ১১নং ধারানুযায়ী বিবাদটির আলোচনায় ইটালিয়ান প্রতিনিধি আপত্তি করেন, যেহেতু তাঁহার মতে ইহার দ্বারা দুই দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; এবং তিনি ১৯২৮ সনের সন্ধি অনুযায়ী বিষয়টি আলাপ-আলোচনা ও সালিসীর দ্বারা মীমাংসা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে, কাউন্সিল প্রশ্নটির আলোচনা স্থগিত রাখিলেন।

পরবর্তী তিনমাসে ইটালীয় সরকার সালিস নিয়োগে বিলম্ব করে এবং ইটালীয় সৈন্য ও রসদ ইটালী হইতে এরিট্রিয়া ও ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ডে প্রেরণ করা হয়। ফলে, ১৬ই মার্চ আবিসিনীয় সরকার নিয়মপত্রের ১৫নং ধারানুযায়ী আবেদন করেন। তিন সপ্তাহ পর বৃটিশ, ফরাসী ও ইটালীয়ান মন্ত্রীগণ মিলিত হইলেন, কিন্তু আফ্রিকার অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ করিলেন না। এই বৈঠকের এক ঘোষণায় প্রকাশ করা হইল যে, ইয়োরোপের শান্তি বিঘ্নিত করিয়া তাঁহারা এককভাবে কোন সন্ধি বাতিল করিতে পারিবেন না। বৃটেন ও ফ্রান্স আবিসিনিয় সমস্যা সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করায় মুসোলিনী ভাবিলেন যে, তাঁহার আফ্রিকান অভিযানে ইহারা সহৃদয়, অথবা, অন্ততঃপক্ষে উদাসীন ছিল।

কাউন্সিলের পরবর্তী অধিবেশনে ইটালীয় সরকার সালিসী ব্যবস্থা মানিয়া লইবার পুনরায় প্রতিশ্রুতি দিলে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা আবার স্থগিত রাখা হয়। এইবার অবশ্য সালিসদিগকে নিযুক্ত করা হইল এবং ৩রা সেপ্টেম্বর সালিসগণ সর্বসম্মত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ওয়ালোয়াল ঘটনাটির জন্ম কোন সরকারকেই দায়ী করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটির কোন

বিশেষ গুরুত্ব ছিল না; ইহার অজুহাতে ইটালী সৈন্যবাহিনী সন্নিবিষ্ট করিয়াছিল মাত্র।

এদিকে অন্যত্র প্রকৃত বিষয়টি অর্থাৎ আবিসিনীয়ার উপর ইটালীর আক্রমণাশঙ্কা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা হইল। ১৯৩৫ সনের জুন মাসে রোম পরিদর্শনকালে ইডেন প্রস্তাব করেন যে, বৃটেন আবিসিনীয়াকে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে অবস্থিত জেইলা বন্দরটি অর্পণ করিবে এবং বিনিময়ে আবিসিনীয়া ইটালীকে ওগাডেন নামক প্রদেশটি ছাড়িয়া দিবে। সমুদ্রে প্রবেশের পথ পাইয়া আবিসিনিয়া শক্তিশালী হইবে বলিয়া এবং ওগাডেন ইটালীর পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে না বলিয়া মুসোলিনী এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। আগষ্ট মাসে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইটালীর প্রতিনিধিগণ প্যারিসে মিলিত হইয়া একটি ফরাসী-বৃটিশ প্রস্তাবদ্বারা আবিসিনীয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের নিকট সাহায্যের আবেদন করিবার জন্য আবিসিনীয়াকে অনুরোধ জানাইবার পরামর্শ দেয় এবং এই প্রকারের সাহায্যপ্রদানে জাতিসংঘ কর্তৃক ইটালীর বিশেষ স্বার্থগুলি সম্পর্কে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তারও উল্লেখ করা হয়। ইটালী সরকার এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং, অবশেষে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, আবিসিনীয়া কর্তৃক প্রেরিত আবেদনপত্রটি লইয়া জাতিসংঘের কাউন্সিল বিবেচনা আরম্ভ করিলে ব্যাপারটি জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। নূতন বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার স্তেমুয়েল হোর নিয়মপত্র অনুযায়ী বৃটিশ সরকারের দায়িত্ব পালিত হইবে বলিয়া পরিষদে একটি বলিষ্ঠ ঘোষণা করেন। কাউন্সিল আবিসিনীয়াকে সাহায্যের জন্য একটি পরিকল্পনা এবং আবিসিনীয়া ও ইটালীর মধ্যে আঞ্চলিক রদবদলের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এদিকে ২রা অক্টোবর ইটালী আবিসিনীয়া আক্রমণ করে।

পরিষদে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা, জেনেভায় ক্ষুদ্রশক্তিগুলি কর্তৃক ইহার প্রতি উৎসাহপূর্ণ অভিনন্দন এবং বৃটিশ জনমতের গতির দ্বারা ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা গিয়াছিল যে, ইটালীর আক্রমণাত্মক অভিযানে জাতিসংঘ নিষ্ক্রিয় থাকিবে মনে করিয়া মুসোলিনী ভুল করিয়াছিলেন। আবিসিনীয়ার উপর আক্রমণ আরম্ভ হইলে জাতিসংঘের বিলম্বহীন হস্তক্ষেপ ও প্রকৃত বিষয়টি সম্পর্কে ইহার পূর্বকালীন এড়াইয়া যাইবার চেষ্টার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ৭ই অক্টোবর কাউন্সিলের একটি কমিটি একটি

বিবরণীতে প্রকাশ করে যে, নিয়মপত্রের ১২নং ধারা অনুযায়ী চুক্তিভঙ্গ করিয়া ইটালী যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে এবং পরের দিন ইটালী ব্যতীত কাউন্সিলের সকল সভ্য এই বিবরণী গ্রহণ করে। দুই দিন পরে পরিষদ জাতিসংঘের সভ্যগণকে ১৬নং ধারানুযায়ী তাহাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি সংযোগকারী কমিটি নিয়োগ করে। ১৯শে অক্টোবরের মধ্যে এই কমিটি সকল সভ্যকে (১) ইটালীকে সকলপ্রকার ঋণ বা হুণ্ডি দান করিতে, (২) ইটালীতে সকলপ্রকার যুদ্ধ দ্রব্য ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্য রপ্তানি করিতে এবং (৩) ইটালী হইতে সকল প্রকারের দ্রব্য আমদানী করিতে নিষেধ করে। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও আলবেনিয়া ব্যতীত সকল ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র এবং ইয়োরোপের বাহিরের জাতিসংঘের প্রায় সকল সভ্য এই ব্যবস্থাগুলির অনুমোদন করে। ১৯৩৫ সনের ১৮ই নভেম্বর জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্বপ্রথম (অর্থনৈতিক) শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

যুদ্ধের প্রথম তিনমাস ইটালীর পক্ষে আশানুরূপভাবে ফলদায়ক হয় নাই। ইটালী বাহিনী জঙ্গীবিমানের সহায়তায় আবিসিনীয় প্রতিরোধ ধ্বংস করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইল; কিন্তু প্রধান আবিসিনীয় বাহিনীগুলির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল, এবং বর্ষাকাল আরম্ভ হইবার পূর্বে ইটালীয় সৈন্য-বাহিনীদ্বয় এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড হইতে অগ্রসর হইয়া আবিসিনীয়ার একমাত্র রেলপথে পৌঁছিতে ও সম্মিলিত হইতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে সামরিক বিশেষজ্ঞগণ সন্দেহ প্রকাশ করিলেন।

ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্স আশঙ্কা করিল যে, আবিসিনিয়ায় ইটালী অকৃতকার্য্য হইলে মধ্য ইউরোপে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। বৃটিশ সরকারেরও এই ভয় হইল, কারণ, মুসোলিনী ক্রুদ্ধ হইয়া অর্থনৈতিক শাস্তি-ব্যবস্থার প্রধান রচনাকারী হিসাবে বৃটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিতে পারেন। হোর লাভালের সহিত প্যারিসে মিলিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, ইটালী কর্তৃক আক্রান্ত অঞ্চল অপেক্ষা আরও অধিক অবিসিনীয় স্থান ইটালীকে দেওয়া হইবে, এবং বিনিময়ে আবিসিনিয়াকে বৃটিশ সোমালি-ল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত একটি করিডর (corridor) ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে বৃটেনে অসন্তোষের ঝড় উঠে;

আক্রমণকারী-সমর্থনকারী হোর পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন; এবং হোর-লাভাল পরিকল্পনার কথা আর শোনা যায় না।

১৯৩৬ সনের মার্চ মাস হইতে আবিসিনিয়ায় ইটালীর অগ্রগতি অধিকতর দ্রুত হইল। ১লা মে আবিসিনীয়ার সম্রাট দেশ ত্যাগ করেন, এবং কয়েকদিন পরে আড্ডিস্ আবাবা ইটালী কর্তৃক অধিকৃত হয়। ৯ই মে, ইটালীর রাজাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হয়, এবং সমস্ত আবিসিনিয়া সরকারীভাবে ইটালীর অধিকারে আসে।

ইটালীর এই বিজয় জাতিসংঘের উপর একটি প্রবল আঘাতরূপে ও বৃটেনের নিকট সংকটরূপে দেখা দিয়াছিল। যদিও অর্থনৈতিক শাস্তি-ব্যবস্থার ফলে ইটালীর বানিজ্য অচল হইয়াছিল এবং সংরক্ষিত স্বর্ণ দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, তথাপি ইটালীর সামরিক অভিযান ইহা দ্বারা যথেষ্টরূপে দুর্বল করা যায় নাই। পরিষ্কাররূপে বুঝা গেল যে, যুদ্ধ ব্যতীত ইটালিকে আবিসিনিয়া হইতে অপসারিত করা যাইবে না। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স কেহই ইটালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে রাজী ছিল না। পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে বৃটেন শাস্তিব্যবস্থা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করে। আবিসিনীয়ার প্রাক্তন সম্রাটের ব্যক্তিগত আবেদন সত্ত্বেও এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়; এবং কি উপায়ে উত্তমরূপে নিয়মপত্রের নীতি প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে পরিষদে মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য জাতিসংঘের সভ্যগণকে আহ্বান জানাইয়া একটি প্রস্তাবও পাশ করা হয়

লোকার্নোর সমাধি (The End of Locarno)

আবিসিনীয় যুদ্ধের পর্যায়ে জার্মানী কর্তৃক পুনরায় চুক্তি লঙ্ঘন ইটালীর প্রতি অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলির দুর্বল আচরণের আংশিক কারণস্বরূপ ছিল। প্রথম হইতেই জার্মানী ১৯৩৫ সনের ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তিটিকে তাহার বিরুদ্ধে সংগঠিত একটি সামরিক মিত্রতারূপে গণ্য করিয়াছিল, এইং ইহা লোকার্নো সন্ধির সহিত সংগতিহীন বলিয়া মনে করা হইয়াছিল; অবশ্য ফরাসী ও বৃটিশ সরকার এই মতে বিশ্বাসী ছিল না। জার্মানী ইহার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রতিবাদ করিতে থাকে; এবং ১৯৩৬ সনের প্রথম ভাগে ইহা ফরাসী পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইলে হিট্লার পাল্টা জবাব হিসাবে ৭ই মার্চ বৃটিশ, ফরাসী এবং বেলজিয়ান সরকারদিগকে জানাইলেন যে, ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তিটি লোকার্নো সন্ধির দায়িত্ব পালনের

পরিপন্থী বলিয়া ঐ চুক্তির দ্বারা সন্ধিটির ভিতরের তাৎপর্য্য নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং জার্মানী ঐ সন্ধির শর্ত দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিল না; এবং ঐ দিনই জার্মান সৈন্যগণ রাইন অঞ্চল দখল করে। জার্মানী প্রস্তাব করে যে, সীমান্তের দুইপার্শ্বে সমান দূরত্ব-সম্পন্ন একটি নূতন নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত করা হউক, রাইন অঞ্চল-সংক্রান্ত ধারাগুলি বাদ দিয়া লোকার্নো-সন্ধির অনুরূপ একটি নূতন চুক্তি স্থাপনের জন্য আলোচনা করা হউক; জার্মানী তাহার পূর্বদিকস্থ প্রতিবেশীদের সহিত (পরবর্তী কালে হিট্‌লার অষ্ট্রীয়া ও চেকোশ্লভাকিয়ার সহিতও) অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদন করিতে এবং জাতিসংঘে প্রত্যাবর্তন করিতেও প্রস্তাব করে।

ফ্রান্সে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হইল, কিন্তু প্রতিশোধাত্মক প্রস্তাব উত্থাপিত হইল না। বৃটেনের জনমত স্বাধীনভাবে সম্পাদিত একটি সন্ধির এইরূপে লঙ্ঘনের জন্য মর্মাহত হয়; কিন্তু হিট্‌লারের অতীত কার্যাবলী অপেক্ষা তাহার ভবিষ্যৎ প্রস্তাবগুলি সম্পর্কেই বেশী ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। মার্চ মাসে বৃটিশ, ফরাসী এবং বেলজিয়ান সরকারদিগের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। লণ্ডনে, জাতিসংঘের কাউন্সিল একটি বিশেষ বৈঠকে ঘোষনা করে যে, নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া জার্মানী ভার্সাই সন্ধি লঙ্ঘন করিয়াছে। ফরাসী ও বেলজিয়ান দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের উপর জার্মান আক্রমণ হইলে কি উপায় অবলম্বন করা হইবে তাহা লইয়া সেনাপতিমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনা করিতে বৃটিশ সরকার রাজী হইল। জার্মানী ও ফ্রান্স দুইটি শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। কিন্তু উভয় পরিকল্পনাই এরূপ অস্পষ্ট ও ব্যাপক ছিল যে, ইহাদের বিশেষ কোন কার্যকরিতা ছিল না। মে মাসের প্রথমে, ফরাসী সরকারের সহিত আলোচনা করিবার পর জার্মান প্রস্তাবগুলি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া লইবার জন্য বৃটিশ সরকার জার্মানীর নিকট কতগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত করিল। কিন্তু বৃটেনের পত্রের রচনা ভঙ্গীর দ্বারা হিট্‌লার অসন্তুষ্ট হন, এবং প্রশ্নগুলির কোন জবাব দেওয়া হয় না। সেপ্টেম্বর মাসে যখন পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয় তখন জার্মানী পশ্চিমের জন্য একটি গ্যারাণ্টি-চুক্তিতে রাজী হয়, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নর সহিত কোনরূপ চুক্তি করিতে অসম্মতি জানায়। আবার ফ্রান্স পূর্ব ইউরোপীয় চুক্তি ব্যতিরেকে কোন পশ্চিমী চুক্তিতে রাজী হইল না।

অধিকাংশ ক্ষুদ্র শক্তির ন্যায় বেলজিয়াম সমষ্টিগত নিরাপত্তা-ব্যবস্থার বিফলতায় এবং জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধিতে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। সে মনে করিল যে, ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তির ফলে ফ্রান্স জার্মানীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ফরাসী-বেলজিয়ান মিত্রতা এবং লোকার্নো সন্ধি অনুযায়ী ফ্রান্সের প্রতি তাহার কর্তব্য রক্ষামূলক না হইয়া বিপদের কারণস্বরূপ হইবে। ফলে ১৯৩৬ সনের ১৪ই অক্টোবর, বেলজিয়াম ঘোষণা করে যে, ভবিষ্যতে সে একটি স্বাধীন নীতি অনুসরণ করিবে, কাহারো সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হইবে না, এবং সুইজারল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের ন্যায় প্রতিবেশীদিগের বিবাদে সম্পূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ থাকিবে। এইরূপে বেলজিয়াম গ্যারাণ্টি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু সে স্বয়ং কাহাকেও কোন গ্যারাণ্টি দিবে না। নভেম্বর মাসে ইডেন্ সরকারী ভাবে ঘোষণা করিলেন যে, বেলজিয়াম অন্যায় ভাবে আক্রান্ত হইলে তাঁহারা তাহাকে সাহায্য করিবেন; কয়েক দিন পরে ফ্রান্সকেও তিনি এইরূপ একটি প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরে জানাইলেন যে, অনুরূপ অবস্থায় ফ্রান্সও বৃটেন ও বেলজিয়ামকে সাহায্য করিবে। প্রস্তাবিত পশ্চিমী চুক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল এই সকল ঘোষণা।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইউরোপের বাহিরের জগৎ।

নিকট ও মধ্য প্রাচ্য :

১৯১৯ সনের পরে পূর্ব ভূমধ্য সাগর ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মধ্যবর্তী মধ্যপ্রাচ্য নামক অঞ্চলে কতগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। তুরস্ক স্বেচ্ছায় ইসলামের ধর্ম ও ঐতিহ্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুসলিম জগত হইতে বাহির হইয়া আসে, এবং নিজেকে মধ্যপ্রাচ্য বা এশিয়ার শক্তি হিসাবে পরিচয় না নিকট প্রাচ্য ও ইউরোপীয় শক্তি হিসাবে প্রচার করে। তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ ইরান রেজাখানের শাসনাধীন বিশেষ উন্নতি লাভ করে। রাশিয়া ও বৃটিশ ভারতের মধ্যবর্তী আফগানীস্তান কোনমতে তাহার স্বাধীনতা বজায় রাখে; তবে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘে প্রবেশ লাভের পর আফগানীস্তানের স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় হয়।

আরব দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ-সমস্যা প্রধানরূপে দেখা দেয়। বৃটেন ও ফ্রান্সের অধীনস্থ Mandate রূপে প্রধান আরব দেশগুলি বণ্টিত হইলে সংযুক্ত আরব রাজ্য গঠনের আশায় আশান্বিত আরব নেতাগণ নিরাশ হইলেন। এই নিরাশা দূর করিবার জন্য বৃটিশ সরকার হেজাজের রাজা হাসেনের একজন পুত্রকে ইরাকের রাজা রূপে এবং অন্য একটি পুত্রকে ট্রান্স্ জর্ডানিয়ার আমীররূপে মনোনীত করে। কিন্তু আরবদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহ্য, সভ্যতা ও উন্নতির বিরাট ব্যবধানের ফলে তাহাদের সমস্যা অত্যন্ত জটিল ছিল। আরব জগতের রাজনৈতিক একতা ভবিষ্যতের স্বপ্নস্বরূপ ছিল। তুরস্কের অসুবিধা সৃষ্টির জন্য আরব জাতীয়তাবাদ মিত্রশক্তিগুলির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, যুদ্ধের পরে তাহা আরবগণ এবং ম্যাণ্ডেটরী শক্তি ও অ-আরব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বহু সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইরাকের রাজনৈতিক মর্যাদা ছিল অনির্দিষ্ট। সরকারী ভাবে ইরাক সম্পর্কে কোন Mandate দেওয়া হয় নাই; বৃটেন ও ইরাকের মধ্যে স্থাপিত ও জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত একটি সন্ধি অনুযায়ী বৃটেন ইরাকের জাতীয়

সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ না করিয়া ইরাককে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। ইউরোপ ও ভারতের মধ্যবর্তী বিমান পথে অবস্থিত এবং তৈল-সম্পদে সমৃদ্ধ বলিয়া ইরাক বৃটেনের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অবশ্য বৃটেনের জনমতের একটি অংশ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইরাকে বৃটিশ শাসন চালু রাখিতে অনিচ্ছুক ছিল। ফলে ১৯৩২ সনে ইরাকের Mandate-ব্যবস্থার শেষ হয়, এবং বৃটেনের সহিত ২৫ বৎসরের একটি মিত্রতা সূচক সন্ধি স্থাপন করিবার পর ইরাক জাতিসংঘেয় সভ্যপদ লাভ করে। ইহার পর কুর্দ, এসিরিয়ান, প্রভৃতি অ-আরব সংখ্যালঘুদিগের সমস্যা স্বাধীন ইরাকের প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ইরাক কর্তৃক জাতিসংঘের সভ্যপদ লাভ করার এক বৎসরের মধ্যেই এসিরিয়ানগণ বিদ্রোহ করিলে তাহাদের পাঁচ-শতজন ইরাকী সৈন্যগণ কর্তৃক নিহত হয়। এই নব-প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রটির শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইরাকের শাসন-ব্যবস্থার প্রায় প্রত্যেক বিভাগে অভিজ্ঞ বৃটিশ পরামর্শদাতাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইতে লাগিল।

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃটিশ Mandateটি জর্ডান নদীর দ্বারা প্যালেষ্টাইন ও ট্রান্স-জর্ডানিয়া নামক দুইটি ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। ট্রান্স-জর্ডানিয়া সম্পূর্ণরূপে একটি আরব দেশ ছিল; ইহার আন্তর্জাতিক ইতিহাস প্রতিবেশীদের সহিত দুই চারিটি সীমান্ত-বিবাদে সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু প্যালেষ্টাইনের সমস্যা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যালেষ্টাইন-Mandate-এর শর্ত অনুযায়ী এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপযুক্ত রূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহুদী জাতির একটি পিতৃভূমি প্রতিষ্ঠা করার এবং সঙ্গে সঙ্গে প্যালেষ্টাইনের সকল অধিবাসীর নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল Mandate-প্রাপ্ত শক্তিটির। কিন্তু ইহুদিদিগকে মিত্রশক্তিগুলি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও আরবদিগের জাতীয়তাবাদের প্রতি প্রদর্শিত সহানুভূতির মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাহার ফলে ভবিষ্যতে ভয়ানক অসুবিধার সৃষ্টি হইল। ১৯১৯ সনে প্যালেষ্টাইনের প্রায় ৭ লক্ষ জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল আরব। কিন্তু প্যালেষ্টাইনে Mandate ব্যবস্থা চালু হইবার পর বহু ইহুদী এই স্থানে আগমন করে। ইউরোপের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য এবং বিশেষতঃ নাজী বিপ্লবের পরে জার্মানী হইতে ইহুদীদিগকে বিতাড়ন করিবার ফলে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের

অনুপ্রবেশ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৪ সনের শেষদিকে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা ৩ লক্ষ হইল, এবং ইহা অনুপ্রবেশ-কর্তৃপক্ষের দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলে ইহুদীদের এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইত। আগমনকারী ইহুদীগণ এই পশ্চাদ্‌পদ্ প্রাচ্য দেশে পাশ্চত্ত্য সভ্যতা আমদানী করে। ইহাদের চেষ্টায় আধুনিক প্রণালীতে বিস্তীর্ণ ভাবে কমলালেবুর চাষ আরম্ভ হয়, প্যালেষ্টাইন মধ্যপ্রাচ্যে একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়; এবং তেল-আভিভ নামক ইহুদী নগরীর সৃষ্টি ও হাইফা নামক বন্দরের উন্নতি আধুনিক জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে। বিশ্বব্যাপী অর্থসংকটের যুগে একমাত্র প্যালেষ্টাইনেই আন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করে।

এই সমৃদ্ধিতে ইহুদী ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়গুলিও লাভবান হইয়াছিল। ১৯১৯ সন ও ১৯৩৪ সনের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা ৯ লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এবং ইহুদীদের সহিত তাহাদের অনুপাত ৩ : ১ হইয়াছিল। কিন্তু অশিক্ষিত, অর্থহীন আরব কৃষক উন্নত ইহুদীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া স্বদেশে অনুন্নত রহিয়া গেল। ক্ষুদ্র ঘটনাবলী বাদ দিলেও ১৯২৩, ১৯২৯ ও ১৯৩৬ সনে আরবরা ইহুদিদিগকে আক্রমণ করে ও বৃটিশ সৈন্যগণকে শান্তি রক্ষায় নিয়োগ করা হয় এবং এই সব বিশৃঙ্খলায় কয়েক শত লোকের প্রাণনাশ হয়। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের আবাসভূমি নির্মাণের নীতির বিরুদ্ধেই এই দাঙ্গার সৃষ্টি।

১৯৩৬ সনের শেষভাগে আরবদের দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি রাজকীয় কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে প্রকাশিত বিবরণীতে এই কমিশন দেশটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া পবিত্র স্থানগুলি স্থায়ীভাবে বৃটিশের অধীনে রাখা, গেলিলী ও সমুদ্রতীরস্থ সমতল অঞ্চলগুলি লইয়া একটি সার্বভৌম ইহুদী রাষ্ট্র গঠন এবং বাকী অংশ ট্রান্স-জর্ডানিয়ার সহিত যুক্ত করিয়া একটি আরব রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করে। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সকলেই—এমন কি ম্যাণ্ডেট কমিশনও প্রতিবাদ করে। ইতিমধ্যে, এখানে গোলযোগ চলিতেই থাকে; কেবলমাত্র ইহুদী বা বৃটিশ নহে, মীমাংসাকামী আরবগণেরও প্রাণনাশ হইতে থাকে। এই পরিকল্পনাটি বিবেচনা করিবার জন্য আরও একটি কমিশন নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু ১৯৩৮ সনে ইহাও দেশবিভাগের বিরুদ্ধে এরূপ প্রবলভাবে মত

প্রকাশ করে যে, পরিকল্পনাটি পরিত্যাগ করা হয় এবং লণ্ডনে একটি সম্মেলন আহূত হয়। আরব ও ইহুদিদের প্রতিনিধিদিগকে এই সম্মেলনে তাহাদের বক্তব্য পৃথকভাবে প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু, উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বৃটিশ সরকার ইহার নিজস্ব সমাধান প্যালেষ্টাইনের উপর চাপাইয়া দেয়। এই সমাধান অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের জন্য আগমনেচ্ছুক ইহুদীদের সংখ্যা প্রতিবৎসর ১০হাজারে নির্দিষ্ট করা হয়। ইতিমধ্যে, কঠোর সামরিক নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশে শৃংখলা স্থাপিত হইয়াছিল এবং মোটামুটি ভাবে মুশ্লিম জগৎও কিছু পরিমাণে সন্তুষ্ট হইল। মুসলমানদের নিকট প্যালেষ্টাইন আরব-পিতৃভূমির একটি অচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ ছিল। আবার পাশ্চাত্য দেশের অনেকেই প্যালেষ্টাইন ইহুদিদের দেশ বলিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিত। উপরন্তু, এই জাতির উপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের ফলে তাহাদের জন্য একটি আশ্রয়স্থলের আন্তর্জাতিক প্রয়োজনও ছিল।

ফরাসী ম্যাণ্ডেট অঞ্চলটি সিরিয়া ও লেবানন নামক দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। লেবাননে আরব খৃষ্টানরা ছিল জনসংখ্যার বেশীর ভাগ এবং এখানে প্রজাতান্ত্রিক শাসন চালু ছিল; অবশ্য ম্যাণ্ডেটশক্তি মাঝে মাঝে শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিত। লেবানীজ খৃষ্টানগণ ধর্মনৈতিক দিক হইতে আরবজাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিল বলিয়া নিরাপত্তার ব্যাপারে ফরাসী রক্ষাব্যবস্থায় তাহারা আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছিল।

অপরপক্ষে, ইরাক ও প্যালেষ্টাইনের ন্যায় সিরিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। ইরাকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ইংরেজরা একটি একতাবিশিষ্ট রাষ্ট্র গঠন করে; কিন্তু সিরীয়ায় ফরাসীরা ইহার বিপরীত নীতি অনুসরণ করিয়া অ-আরব অধ্যুষিত তিনটি অঞ্চল আসল সিরীয়া হইতে পৃথক করিয়া রাখে। ইহার দুইটি অঞ্চল—লাটাকিয়া ও জেবেলড্রুস্—প্রত্যক্ষ ফরাসী শাসনাধীন রাখা হয় এবং তৃতীয় অঞ্চলটি—তুরস্ক অধ্যুষিত আলেকজাণ্ড্রেটা—ফরাসী অধিকর্তৃত্বাধীন একটি স্বায়ত্বশাসনশীল প্রদেশরূপে পরিণত হইল। ১৯৩৯ সনের জুন মাসে ফ্রান্স তাহার ভূমধ্য সাগরীয় নীতির অঙ্গ হিসাবে একটি চুক্তির বলে তুরস্ককে আলেকজাণ্ড্রেটার স্যাণ্ডজাক জিলাটি এই শর্তে প্রদান করে যে, তুরস্ক সিরীয়ার উপর আর কোন দাবী উত্থাপন করিবে না ও সিরীয়ায় সর্বপ্রকার প্রচারকার্য বন্ধ করিয়া দিবে। সিরিয়ার এইরূপ অঙ্গচ্ছেদের ফলে সিরীয়ান আরবগণ

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। মাঝে মাঝে, বিশেষত: ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে, ভয়ানক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ফরাসীরা দামাস্কাসে বোমা বর্ষণ করে এবং ১৯৩৩ সন হইতে ফরাসী শাসনতন্ত্রের কার্যকরিতা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত রাখা হয়। ১৯৩৬ সনে ফরাসী সরকার ও সিরীয়ান নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলে এবং ফলে নভেম্বর মাসে ইঙ্গ-ইরাকী সন্ধির আদর্শে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির অনুমোদনে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে এবং ১৯৩৯ সনের প্রথমদিকে দামাস্কাসে জাতীয়তাবাদী দাঙ্গাহাঙ্গামা পুনরায় দেখা দিলে হাই কমিশনার সিরিয়ার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া দেশের প্রশাসনিক-ভার পাঁচজন ডিরেক্টারের একটি সভার হাতে ন্যস্ত করেন; দেশের সামরিক প্রতিরক্ষা ফ্রান্স নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে।

এই সময়ে আরাবিয়ায় নেজ্‌দ্‌-এর প্রাক্তন সুলতান ইবন্‌ সৌদ প্রাধান্য লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করেন এবং মিত্রপক্ষও তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু শান্তিচুক্তির সময় তাঁহাকে কোন স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। যাযাবরদের অনির্দিষ্ট সীমাহীন অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ দখল করিয়া ও শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার দ্বারা সৌদ তাঁহার অধিকার বর্ধিত করেন। ১৯২৬ সনে হেজাজের রাজা হাসেনকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া তিনি নিজেকে হেজাজ ও নেজদ্‌ এর রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার সমস্ত অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলি সৌদী আরবিয়া নামে পরিচিত হয়। এইভাবে সৌদ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্বাধীন আরব রাজা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সৌদী আরবিয়া জাতিসংঘের সভ্যপদের জন্য আবেদন করে নাই; কিন্তু ১৯৩৬ সনে ইরাক, ট্রান্স জর্ডানিয়া ও মিশরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সে তাহার আন্তর্জাতিক অবস্থা শক্ত করে। আরব দেশগুলির এই সহযোগিতার প্রয়াস আবিসিনীয়ায় ইটালীর জয়লাভের পরবর্তী ইটালীর ক্রমবর্ধমান লোভের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ছিল; এইজন্য বৃটেন ও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়।

সুয়েজখাল খননের ফলে মিশর (মধ্যপ্রাচ্য কথাটির দ্বারা ইহাকে সাধারণতঃ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না) বৃটিশ সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে, ৩০ বৎসর যাবৎ মিশর নামেমাত্র তুরস্কের অধিকর্তৃত্বাধীন থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ-অধিকৃত ছিল। ১৯১৪ সনের ডিসেম্বর মাসে তুরস্ক যুদ্ধে যোগ দিলে তুরস্কের

অধিকর্তৃত্ব বাতিল করিয়া দেওয়া হয় এবং মিশরকে একটি বৃটিশ তাঁবেদার রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধের পরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার ফলে এই তাঁবেদারী শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব হয়। ১৯২২ সনে মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সহিত মীমাংসায় উপস্থিত হইবার প্রয়াসে ব্যর্থ হইয়া বৃটিশ সরকার মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা করে; তবে দেশের প্রতিরক্ষা, ও বিদেশী ও সংখ্যালঘুদের রক্ষাভার নিজের হাতে রাখে এবং সুদানে মিশরের সহিত যুক্তভাবে দ্বৈত সার্বভৌমিকত্বের সৃষ্টি করে। ইহার পরে বিদেশী শক্তিগুলিকে জানান হয় যে, মিশরের ব্যাপারে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ বৃটেন তাহার নিজের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে আঘাতরূপে গণ্য করিবে।

একাধিকবার একটি সন্ধির মাধ্যমে বৃটেন ও মিশরের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সনে আবিসিনিয়ায় ইটালীর সাফল্যে চিন্তিত হইয়া বৃটেন ও মিশর উভয়ে যখন তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, তখন আগষ্টমাসে একটি সন্ধির দ্বারা বৃটেন সুয়েজ খাল অঞ্চল ব্যতীত মিশরের অন্যান্য স্থান হইতে কয়েকটি শর্তে সৈন্য অপসারণ করিতে, মিশরে প্রধান বিদেশী রাজ্যগুলির নাগরিকদের বিশেষ অধিকারগুলি রদ করিতে মিশরকে সাহায্য করিতে, জাতিসংঘের সভ্যপদলাভে মিশরকে সমর্থন করিতে, এবং সুদানের শাসনে মিশরীয় কর্মচারীদিগকে অংশগ্রহণ করিতে দিতে রাজী হইল।

১৯৩৭ সনের ৮ই মে মণ্ট্রিক্সের সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিগুলি মিশরে তাহাদের নাগরিকদের বিশেষ অধিকার প্রত্যাহার করে এবং ২৬শে মে মিশর সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জাতিসংঘে প্রবেশলাভ করে। ১৯৩৮ সনে সুয়েজখাল রক্ষার্থে মজুত বৃটিশ সৈন্যদের আবাসিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি সন্ধি বৃটেন ও মিশরের মধ্যে স্থাপিত হয় এবং স্বাধীন মিশর বৃটেনের প্রতি তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠ থাকে।

দূরপ্রাচ্য :

১৯৩৩ সনের মার্চমাসে জাপানের জাতিসংঘ ত্যাগ মধ্যপ্রাচ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সৃষ্টি করে। জাপান শীঘ্রই মাঞ্চুরিয়া বিজয় সমাপ্ত করিয়া পূর্ব এশিয়ার প্রধান শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৩৪ সনের এপ্রিল মাসে তাহার বৈদেশিক নীতির প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘোষণা দ্বারা জাপান পূর্ব

এশিয়ায় তাহার বিশেষ দায়িত্বগুলির কথা উল্লেখ করে ও পরিষ্কাররূপে ঘোষণা করে যে, পূর্ব এশিয়ার শান্তিরক্ষার দায়িত্ব চীন ও জাপান ব্যতীত অন্য কাহারো নয় এবং চীনকে এককভাবে বা যুগ্মভাবে কোন বিদেশী শক্তি কারিগরী, আর্থিক, সামরিক সাহায্য প্রদান করিলে, অথবা যুদ্ধ দ্রব্যাদি বা পরামর্শদাতা প্রেরণ করিয়া চীনের সাহায্য করিলে জাপান তাহাতে আপত্তি করিবে। জাপানের 'মনরো' নীতি বলিয়া পরিচিত এই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি পরবর্তীকালে কয়েকবার হইয়াছিল। ১৯৩৫ সনের গ্রীষ্মকালে চীনের উত্তর অঞ্চলীয় কয়েকটি প্রদেশ চীন হইতে বিভক্ত করিবার একটি জাপানী প্রচেষ্টা চীনাদের নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধে বানচাল হইয়া যায়। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া সংলগ্ন চীনের একটি অঞ্চলে জাপানীরা 'পূর্ব হোপেই স্বায়ত্বশাসনশীল সরকার' নামক একটি তাঁবেদারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। পরে তাহারা চীনা শুল্ক-কর্তৃপক্ষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া এই অঞ্চলে একটি বিস্তৃত চোরা কারবারের সহায়তা করে এবং এইরূপে জাপানী ব্যবসায়ীদের অন্যায়ভাবে অর্থোর্জনের সুবিধা করিয়া দিয়া চীনা শাসকদের শক্তি ও সম্মান ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। ইহার ফলে বিরক্ত হইয়া চীনারা ১৯৩৬ সনে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু সংখ্যক জাপানীকে হত্যা করে।

জাপানী ভীতি চীনকে একতাবদ্ধ হইবার প্রেরণা দেয়। বোরোডিনের প্রত্যাবর্তনের বহুদিন পরেও মধ্যচীনে অসংখ্য স্থানীয় সোভিয়েট নানকিন্-সরকারের পথে বিঘ্নস্বরূপ বর্তমান ছিল, এবং কতগুলি বিস্তৃত অঞ্চল তথাকথিত চীনা সোভিয়েট সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯৩৩ সনের পরে এই সকল স্থানের অধিকাংশ নানকিন্-সরকার দখল করে। উত্তর-পশ্চিম চীনে তখনও চীনা কমিউনিষ্ট বাহিনীগুলি শক্তিশালী ছিল; কিন্তু ১৯৩৫ সনে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কংগ্রেসে গৃহীত নীতি অনুযায়ী ইহারা নান্‌কিন্ সরকারের পতনের জন্য প্রয়াসী না হইয়া উত্তর চীনে জাপানী-দিগকে বাধা দিতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণ চীনে ১৯৩৬ সনের গ্রীষ্মকালে নান্‌কিন সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত একটি সামরিক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় এবং ফলে প্রায়-স্বাধীন ক্যাণ্টন সরকারের পতন হয়। নানকিন ও ক্যাণ্টনের মধ্যে সহযোগিতা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। এইরূপে ১৯৩৬ সনের শেষভাগে চীয়াংকাইশেক-পরিচালিত নানকিন্ সরকার মধ্য ও দক্ষিণ চীনে তাহার অধিকার দৃঢ় করিতে থাকে এবং জাপানের বিরুদ্ধে উত্তর চীনে ইহার

প্রভাব বজায় রাখে। ডিসেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি স্বল্পস্থায়ী বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং চীয়াংকাইশেক স্বয়ং কয়েকদিনের জন্য বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হন। কিছুদিন পরে এই বিদ্রোহ দমিত হইলে চীয়াংকাইশেকের অবস্থা শক্তিশালী হয়, চীন একতার পথে অগ্রসর হয় বলিয়া মনে হয় এবং জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি একতাবদ্ধ চীনা প্রতিরোধ গড়িয়া উঠে।

কিন্তু, ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে পিকিংয়ের অনতিদূরে চীনা ও জাপানী সৈন্যদের মধ্যে একটি সংঘর্ষ ঘটিলে আরও কয়েকটি ঘটনার সৃষ্টি হয়; এবং বিনা ঘোষণায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পিকিং পরিত্যাগ করিয়া চীনারা পীতনদী পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। আবার অন্যদিকে নৌ ও বিমান বাহিনীর দ্বারা সাংহাই অক্রান্ত হয়। বৎসরের শেষে জাপানীরা সাংহাই ও নান্‌কিন অধিকার করে। বিমান হইতে বোমা বর্ষণের ফলে বহু নিরস্ত্র লোকের মৃত্যু হয়। চীনে অবস্থিত রাষ্ট্রদূত আহত হন, এবং ইয়াংসে নদীতে একখানি আমেরিকান ও একখানি বৃটিশ জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ইউরোপের পরিস্থিতির জন্য বৃটেন তাহার ক্রোধ কূটনৈতিক প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ রাখিল, এবং যুক্তরাষ্ট্র জাপানের দুঃখ প্রকাশেই সন্তুষ্ট রহিল। ইতিমধ্যে চীনা প্রতিনিধি কর্তৃক জাতিসংঘে বিষয়টি উপস্থাপিত হইলে জাপানের কার্য সন্ধিভঙ্গকর বলিয়া জাতিসংঘ নিন্দা করে এবং ইহার সভ্যদিগকে পৃথকভাবে চীনকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করে।

যদিও জাপানী সৈন্যরা তাহাদের উন্নততর শিক্ষা ও রণসম্ভারের বলে সর্বত্রই সাফল্য লাভ করে তথাপি চীনেব প্রতিরোধের মনোভাব অটুট থাকে। প্রথমতঃ, ১৯৩৮ সনের জুলাই মাসে হ্যান্‌কাও এবং অক্টোবর মাসে ক্যাণ্টন্ অধিকৃত হইল। ক্রমে ক্রমে জাপান সমস্ত বন্দর অধিকার করে, এবং চীনা সৈন্যরা তাহাদের রসদের জন্য রাশিয়া, ফরাসী, ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশাভিমুখী স্থলপথগুলির উপর নির্ভরশীল হয়। এই সকল স্থলপথ ১৯৩৯ সনের শেষদিকে জাপানীরা বন্ধ করিয়া দিলেও চীনেরা তাহাদের প্রতিরোধ চালু রাখিল।

এদিকে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুকুও অধিকৃত হইলে রাশিয়া কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। সোভিয়েট সরকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া যে রেলপথ বিস্তৃত ছিল তৎসংশ্লিষ্ট রাশিয়ান্ স্বার্থ রাশিয়া সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য জাপানের নিকট

বিক্রয় করে। তৃতীয়তঃ, মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েট সরকার সোভিয়েট প্রভাব বিস্তার করে। চীনের পশ্চিম সীমান্তবর্তী, বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত সিন্‌কিয়াং প্রদেশ বহুদিন যাবৎ নানকিন্ সরকার হইতে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ছিল, এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে গৃহযুদ্ধ দেখা দিত। ১৯৩৩ সনে এইরূপ একটি গৃহযুদ্ধে সোভিয়েট সেনা ও বিমান বাহিনী হস্তক্ষেপ করে এবং আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে স্থানীয় চীনা শাসককে সাহায্য করে। কিছুদিনের জন্য সিন্‌কিয়াং-এ রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রধান হইয়া দেখা দেয়। চীনাসার্বভৌমত্বের নামমাত্র অধীন (এবং ১৯২১ সন হইতে প্রকৃতপক্ষে একটি সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রে পরিণত) বহির্মঙ্গোলীয়া ১৯৩৬ সনের মার্চমাসে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত এই মর্মে একটি সন্ধি করে যে, বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিবে। এই সময় স্ট্যালিন প্রকাশ করেন যে, বহির্মঙ্গোলিয়ায় জাপান হস্তক্ষেপ করিলে রাশিয়ার সহিত জাপানের যুদ্ধ হইবে। মাঞ্চুকুওতে জাপানের ন্যায়, রাশিয়া সিন্‌কিয়াং ও বহির্মঙ্গোলিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করে। অবশ্য এই সকল অঞ্চলের স্থানীয় শাসনে সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণ মাঞ্চুকুওতে জাপানী নিয়ন্ত্রণের মত প্রত্যক্ষ ছিল না।

বিশ্বরাজনীতিতে আমেরিকা :

১৯৩০-'৩৩-এর বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের ফল যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অন্য অনেক দেশে অধিকতর ভয়াবহ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রেই রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার প্রত্যক্ষ ও মৌলিক পরিবর্তন সর্বাধিক হইয়াছিল। এই সংকটের পূর্বে এই দেশে অবাধ বাণিজ্যনীতি ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত উদ্যোগ জনপ্রিয় ছিল। শিল্প-বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ একান্ত অকাম্য ছিল। কিন্তু, এই সংকট এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা প্রমাণ করে। যখন শিল্প ও অর্থ ব্যবস্থার সমগ্র সৌধটি ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল এবং জনসংখ্যার এক-দশমাংশ বেকারে পরিণত হইল তখন মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী উভয়েই রাষ্ট্রের সাহায্য চাহিল। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের শাসনকালের ইতিহাসকে নূতন ভিত্তিতে আমেরিকার অর্থনৈতিক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করিবার একটি দীর্ঘ প্রয়াসরূপে বর্ণনা করা যায়। যখন এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হয় তখন রক্ষণশীল শক্তিগুলি এই নবব্যবস্থা (New Deal)-র বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করে। আমেরিকান

শাসনতন্ত্রানুযায়ী বিদেশী জাতিগুলির সহিত ও ষ্টেটগুলির মধ্যে বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার কংগ্রেসকে দেওয়া হয়। এই ধারাটির ব্যাপক ব্যাখ্যার দ্বারাই মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, শ্রমাবস্থার নির্দিষ্ট-করণ, প্রভৃতি কার্যকরী করা সম্ভব ছিল। শিল্প ও কৃষির নিয়ন্ত্রণ, এবং শ্রমিকদের রক্ষামূলক কতকগুলি প্রগতিশীল সরকারী সংস্কার শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া সুপ্রীমকোর্ট মন্তব্য করে, ফলে এগুলি প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সনের নভেম্বর মাসে রুজভেল্ট্ দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হইলে ইহা বুঝা গেল যে, আমেরিকার জনসাধারণ সর্বান্তঃকরণে এই নূতন রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণনীতি সমর্থন করিয়াছিল।

১৯৩৩ সনের পরবর্তী কয়েক বৎসর এই শান্তিপূর্ণ অন্তর্বিপ্লব লইয়া আমেরিকান সরকার ব্যস্ত ছিল, এবং বৈদেশিক নীতি তখন অপ্রধান ছিল। জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকারের প্রথম ফল হইল জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা। ১৯৩২ সনের গ্রীষ্মকালে প্রজাতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী উভয় দলই প্যারিস-চুক্তির লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও অন্যান্য সরকারের মধ্যে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। ১৯৩৩ সনের মে মাসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি জানাইলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর ভবিষ্যতে কোন বিপদ দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অন্যান্য সরকারের সহিত পরামর্শ করিবে, এবং তাহাদের নির্ধারিত কর্মসূচীতে কোন বাধা সৃষ্টি করিবে না। কিন্তু এই সম্মেলন ব্যর্থ হইলে, এবং ইউরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থার অবনতি ঘটিলে আমেরিকার জনমত স্বাতন্ত্র্যবাদী নীতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল। ১৯৩৫ সনের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে 'লণ্ডন নৌসন্ধি'র মেয়াদোত্তর অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য একটি নৌসম্মেলন বসে। ১৯২১ সনে সম্পাদিত ওয়াশিংটনের পঞ্চশক্তি চুক্তি বাতিল করিবার জন্য দুই বৎসর পূর্বে ১৯৩৪ সনের শেষে জাপান নোটিশ দিয়াছিল; এবং বৃটিশ বা আমেরিকার নৌশক্তি অপেক্ষা কম শক্তি রাখিতে জাপান কিছুতেই রাজী হইল না। এই সম্মেলনে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মধ্যে স্থির হয় যে, তাহারা পরস্পরকে তাহাদের নির্মিত বা সংগৃহীত যুদ্ধ জাহাজ সম্বন্ধে আগাম সংবাদ দিবে, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজের টনেজের ঊর্দ্ধতম সীমা নির্ধারিত করিবে। ১৯৩৬ সনের শেষে, সকলেই অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল।

১৯৩৫ সনের প্রথম হইতেই যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সকল প্রকার সম্ভাবনা এড়াইয়া চলা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রাচীন আন্তর্জাতিক নীতি ছিল। ঐ বৎসর দায়িত্ব-মূলক নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দ্বীপমালা ত্যাগ করিতে এবং দশ বৎসরকাল পরে ইহার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে সিদ্ধান্ত করে। ১৯৩৫ সনে একটি 'নিরপেক্ষতা আইন' পাশ করিয়া যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিকে যুদ্ধ সম্ভার ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উভয় যোদ্ধপক্ষকে রপ্তানী করা নিষিদ্ধ করার অধিকার দেওয়া হয়। ইটালী-আবিসিনীয় যুদ্ধের সময় সভাপতি এই অধিকার প্রয়োগ করেন; এবং ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গৃহীত একটি সংশোধনীর দ্বারা ভবিষ্যতে সকল যুদ্ধে এইরূপ নিষিদ্ধকরণ ঐচ্ছিক না রাখিয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। ইহা দ্বারা যোদ্ধপক্ষগুলিকে ঋণ দানও নিষিদ্ধ করা হয়, এবং আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলিকে এই আইনের বহির্ভূত রাখা হয়।

এইরূপে যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপের রাজনৈতিক গোলযোগ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পায়। বহু বৎসর যাবৎ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিত। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় শান্তি ও বিদেশীদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার ছিল বলিয়া মন্‌রো নীতির ব্যাখ্যা করা হয়। ১৯০৩ সনে যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে স্থাপিত সন্ধির দ্বারা এই সকল প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রকে খোলাখুলি ভাবে হস্তক্ষেপাধিকার দেওয়া হয়। ১৯১২ সন হইতে নিকারাগুয়ায়, এবং ১৯১৫ সন হইতে হাইতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌসৈন্য মোতায়েন করা হয়। ১৮৮৯ সন হইতে নিয়মিত ভাবে 'আন্তঃ আমেরিকান কংগ্রেস' (Pan—American Congress)-এর অধিবেশন মাঝে মাঝে বসিলেও 'বড়লাঠি' (Big Stick) ও 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ নীতি' সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইল না।

আংশিক ভাবে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ১৯৩০ সন হইতে আমেরিকার জনমত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপনীতির প্রতি সমর্থন-বিমুখ হইতে থাকে। ১৯৩৩ সনের প্রারম্ভে নিকারাগুয়া হইতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-সৈন্য-দিগকে সরাইয়া লওয়া হয়; এবং ঐ বৎসর মার্চ মাসে সভাপতি রুজভেল্ট 'ভাল প্রতিবেশীর নীতি'র প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আনুরক্তির কথা ঘোষণা করিলে

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বেকার নীতি পরিবর্তিত হয়। ঐ একই বৎসর আর্জেন্টিনার প্রস্তাব অনুযায়ী আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ত্যাগ এবং শক্তি প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত অবস্থা স্বীকার করিয়া না লওয়ার জন্য একটি নূতন চুক্তি বহু আমেরিকান রাষ্ট্র এবং কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রও ইহার প্রতি স্বাগত জানায়। ১৯৩৩ সনের শেষভাগে মণ্টেভিডিওতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ আমেরিকান কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-মন্ত্রী পুনর্মিলনাত্মক মনোভাব ব্যক্ত করেন। পর বৎসর হাইতি হইতে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য সরাইয়া লওয়া হয়, এবং কিউবার সহিত স্থাপিত ১৯০৩ সনের সন্ধিটি বাতিল করা হয়। ১৯৩৬ সনের ডিসেম্বর মাসে বোয়েনস্ এয়ারসে অনুষ্ঠিত আন্তঃ আমেরিকান কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতি রুজভেল্ট স্বয়ং উপস্থিত হন; এবং এই সভায় এই মর্মে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় যে, আমেরিকার কোন রাষ্ট্রে শান্তিভঙ্গ হইবার আশংকা দেখা দিলে স্বাক্ষরকারীগণ শান্তিপ্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিবে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে দক্ষিণ আমেরিকায় দুইটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য যে কোন সময় অপেক্ষা এই সময়ে আমেরিকান মহাদেশ দুইটিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রকৃতই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল।

ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার জন্য আরও আইন পাশ করা হয়; আমেরিকান প্রজাতন্ত্রগুলির সহিত আরও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য ও বিদেশের যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে ইহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পূর্বের মতই চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৯৩৭ সনে একটি নূতন 'নিরপেক্ষতা আইন' পাশ করিয়া অস্ত্র-প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখা হয়, আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজগুলির অস্ত্র-সজ্জা নিষিদ্ধ করা হয়, এবং কোন যোদ্ধপক্ষের জাহাজে আমেরিকান নাগরিকদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ এই নাগরিকদের কোনরূপ ক্ষতি হইলে যুক্তরাষ্ট্রের কলহে লিপ্ত হওয়া সম্ভাবনা ছিল)। এই আইনদ্বারা যোদ্ধরাষ্ট্রগুলিকে আমেরিকান জাহাজে মাল প্রেরণ বন্ধ করার ক্ষমতা সভাপতিকে দেওয়া হয় এবং ক্যানাডায় মাল সরবরাহ করার জন্য অনুমতি দেওয়ার অধিকারও তিনি পাইলেন।

ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে দূরে সরিয়া থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে নাই। অন্যান্য মহাদেশের ন্যায় ইউরোপের সঙ্গেও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আমেরিকান জনমতের কাম্য

ছিল। ১৯৩৪ সনে গৃহীত ও ১৯৩৭ সনে পুনর্গৃহীত "পারস্পরিক বাণিজ্যিক চুক্তির আইন"-এর স্থযোগ লইয়া সেক্রেটারী কর্ডেল হাল ২২টি দেশের সঙ্গে স্থবিধাজনক ভিত্তিতে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়া শুল্ক-হ্রাস ও বাণিজ্যের উপর হইতে বিভিন্ন বিধিনিষেধ রদ করেন। তাঁহার মতে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য-বাদের ফলে রাজনৈতিক সংকট ও যুদ্ধের সৃষ্টি হয়, এবং অবাধ বাণিজ্য নীতির ভিত্তিতে বহু-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যবস্থা যুদ্ধের কারণ নষ্ট করিতে সাহায্য করে।

দূর প্রাচ্যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৪-'৩৭ সনে দায়িত্ব-হ্রাস-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করে। সভাপতি ইচ্ছা করিয়া চীনে জাপানী আক্রমণকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কারণ এইরূপ স্বীকৃতির দ্বারা নিরপেক্ষতা আইনটি কার্যকরী হইলে আমেরিকা চীনকে সাহায্য দিতে পারিবে না। এই যুদ্ধে চীনের প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব করা হয় এবং আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্কের মারফৎ চীনকে ঋণ দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার চীন দেশে তাহাদের অধিকারগুলি ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হয় এবং চীনের সন্ধি-বন্দরগুলিতে ও স্থলভাগে তাহাদের নৌ ও পদাতিক বাহিনী সম্পূর্ণভাবে মোতায়েন রাখে। ১৯৩৯ সনের জুলাই মাসে জাপ-আমেরিকান বাণিজ্যিক সন্ধিটি বাতিল করিবার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং পর বৎসর জানুয়ারী মাসে এই সন্ধি শেষ হয়। দৈনন্দিন ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে লাগিল এবং এই বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবার ও জাপানী আমদানীর উপর শুল্ক বৃদ্ধি করার ভীতি প্রদর্শনের ফলে আমেরিকান অধিকারের উপর জাপানী হস্তক্ষেপ বন্ধ হইল। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ও যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৬ সনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন আরম্ভ হয়। ফলে ফিলিপাইনকে বাণিজ্যিক স্থবিধা দিবার মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

বৃটিশ কমনওয়েলথ্ :

যেহেতু ডোমিনিয়নগুলি জাতিসংঘের সভ্য এবং যেহেতু তাহাদের স্বাধীন বৈদেশিক নীতি ছিল সেইহেতু পৃথকভাবে তাহাদের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯১৯ সনের ভার্সাই সন্ধিতে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষ পৃথকভাবে নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রদান করিবার ফলে ইহারা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র-সম্প্রদায়ের সভ্যরূপে পরিগণিত হয়। যদিও স্বাক্ষরকারীদিগের নামের তালিকায় ডোমিনিয়ন-

গুলিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখান হয় এবং যদিও ইহারা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গণ্য হয় নাই তথাপি নিয়মপত্রের প্রথম ধারা অনুযায়ী 'যে কোন সম্পূর্ণরূপে শাসিত রাষ্ট্র, ডোমিনিয়ন অথবা উপনিবেশ' জাতিসংঘের সভ্য হইতে পারিত। ১৯৩৩ সনে আইরিশ ফ্রী ষ্টেট্ জাতি সংঘের সভ্যপদ লাভের জন্য আবেদন করিলে এই আবেদন গৃহীত হয়। ১৯২৬ সনে বৃটেন ও স্বয়ং-শাসিত ডোমিনিয়নগুলিকে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন, সমমর্যাদা-সম্পন্ন, বৃটিশ সিংহাসনের প্রতি আনুগত্যশীল ও বৃটিশ কমনওয়েল্থভুক্ত জাতিসমূহের স্বাধীনভাবে একতাবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে, বর্ণনা করা হয় এবং ১৯৩১ সনে ওয়েস্ট মিনস্টারের আইনদ্বারা এই ব্যাখ্যাটিকে আইনগত মর্য্যাদা দেওয়া হয়।

কিন্তু এই ব্যাখ্যার ফলে একটি জটিল আন্তর্জাতিক অবস্থার উদ্ভব হয়। বৃটিশ সরকার সর্বদাই এইরূপ মতপ্রকাশ করে যে, নিয়মপত্র বা জাতিসংঘের সভ্যদিগের মধ্যে স্থাপিত কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বৃটিশ কমলওয়েলথের সভ্যদিগের মধ্যস্থিত সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবেনা। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে আইরিশ রাজনৈতিক নেতাগণ বার বার আক্রমণ করেন; এবং অন্য ডোমিনিয়নগুলি নীতিগত প্রশ্নের মীমাংসায় মৌন ভাব অবলম্বন করে। ১৯২৯ সনে, বৃটিশ কমনওয়েল্থের সকল সভ্য স্থায়ী আদালতের আইনের ঐচ্ছিক ধারাটিতে (Optional clause) পৃথকভাবে স্বাক্ষর দেয়। তবে বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড যখন কমনওয়েলথের সভ্যদের নিজেদের বিবাদ আদালতটি বিচার করিবেনা বলিয়া মত প্রকাশ করে, ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা এই জাতীয় বিবাদ আদালতটির অধিকার-বহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মত হয়। আইরিশ প্রতিনিধি এই জাতীয় বিবাদ সম্বন্ধে কোনরূপ ভিন্ন ব্যবস্থা সমর্থন করেন নাই। বৃটিশ কমনওয়েল্থের কোন সভ্য নিয়মপত্র অমান্য করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে কমনওয়েল্থের অন্য সভ্যরা নিয়মপত্রের ১৬নং ধারা অনুযায়ী তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবে কিনা এই প্রশ্নটিতে মতপার্থক্যের আর একটি উদাহরণ পাওয়া গেল।

তত্ত্বগত এইসব সমস্যা থাকিলেও মূলগত বিষয়ে কমনওয়েল্থের সভ্য-দিগের মধ্যে মতভেদ খুব অল্পই ছিল। যাহারা মনে করিত যে, জাতিসংঘ বৃটিশ সরকারকে ৬টি ভোটের অধিকারী করিয়াছে তাহাদের ধারণা অমূলক ছিল; কারণ, কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বিষয়গুলিই জেনেভায় ভোটাধিক্যের দ্বারা

স্থির করা হইত, এবং এই সকল বিষয়ে কমনওয়েলথের সভ্যগণ সাধারণতঃ ভিন্নমত প্রকাশ করিত। অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইহারা বৃটেনের বিরুদ্ধেও তাহাদের জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিত। রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতবর্ষকে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইত না; এবং কমনওয়েলথের অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে যে মত-পার্থক্য দেখা যাইত তাহা ছিল কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপণ করা লইয়া। ক্যানাডা যুক্তরাষ্ট্রের নিকটবর্তী বলিয়া জাতিসংঘের অন্য সভ্যদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব যতদূর সম্ভব হ্রাস করিতে ইচ্ছুক ছিল। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ইয়োরোপের অনেক দূরবর্তী বলিয়া আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সর্বদা আগ্রহ প্রকাশ করিত না। কিন্তু তাহারা সময় সময় জাপানের ভয়ে আতঙ্কিত হইত, এবং অশ্বেতকায়দিগকে তাহাদের দেশে বসবাস করার অনুমতি না দিবার বিরুদ্ধে সমালোচনা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা নিরাপত্তা সমস্যায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, এবং ১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে ইটালীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রত্যাহার হইলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। আইরিশগণ একটি নিজস্ব আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ করিবার পরিবর্তে তাহাদের স্বাধীনতা দৃঢ়মূল করিতেই ব্যস্ত ছিল। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ড ম্যাণ্ডেট অঞ্চলগুলি শাসন করিত, ও প্রতি বৎসর জাতিসংঘের নিকট বিবরণী পেশ করিত। ১৯২৭ সনের পরে কাউন্সিলের একটি অস্থায়ী পদ ডোমিনিয়নগুলির একটি কর্তৃক সর্বদাই অধিকৃত হয়।

১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ডমিনিয়নগুলি বৃটেনের পথ অনুসরণ না করিয়া তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থ ও সম্মান অনুযায়ী কার্য করিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

আবার যুদ্ধ

১৯১৯ সনের সন্ধি-ব্যবস্থায় যে সকল রাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হইয়াছিল তাহারা ১৯৩৭ সনের শেষদিকে ইহার দায়িত্ব হইতে নিজেদের মুক্তি ঘোষণা করিয়া তাহাদের পক্ষে সন্তোষজনক কতগুলি দাবী উপস্থাপিত করিল। এই বিপদের সম্মুখীন হইয়া বৃটিশ সরকার নিরস্ত্রীকরণ-নীতিকার্যে পরিণত করার চেষ্টা ত্যাগ করে। ১৯৩৭ সনের মার্চ মাসে বৃটিশ সরকার কেবলমাত্র কর আদায়ের সাহায্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের ব্যয়ভার চালাইবার চেষ্টা না করিয়া ইহার জন্য ৪০ কোটি পাউণ্ডের একটি জাতীয় ঋণের ব্যবস্থা করে। এইরূপে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দেশকে প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী বলডুইন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেন বৃটেন কর্তৃক জাতিসংঘ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ঠিক তখনও যুদ্ধের সম্ভাবনা কোন নির্দিষ্টরূপ পরিগ্রহ করে নাই; ফরাসী ম্যাজিনট রেখার (Maginot Line) অপরদিকে জার্মানী তাহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করিতে ব্যস্ত ছিল। এই সেগ্‌ফ্রেড্‌ রেখা ("Siegfried Line") জার্মানীর পশ্চিম ভাগ একটি একতাবদ্ধ বাহিনীর সাহায্যে রক্ষা করিয়া পূর্বদিকে তাহার প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করিতে সুযোগ দিবে। কিন্তু ইয়োরোপ, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও বৃটেন, নিশ্চিন্ত-ভাবে অনুমান করিতে পারিল না নূতন রণভূমিতে কিরূপ ফল ফলিবে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ:

১৯২৩ সনে স্পেনে যে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩০ সনে তাহার পতন ঘটে। পর বৎসর রাজা ত্রয়োদশ আলফন্সো সিংহাসন ত্যাগ করিলে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু স্পেনে গণতান্ত্রিক ভাব-ধারা কখনও শক্তিশালী হয় নাই; ১৯২১ সন হইতে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত এক দিকে দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি, অপরদিকে বামপন্থী সন্ত্রাসবাদীগণ ও সাম্যবাদীগণের বিরোধিতার ফলে স্পেনীয় গণতন্ত্র খুব সঙ্গীন অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছিল। রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা বিশৃঙ্খল

ছিল এবং দেশের আইন ও শান্তির বিরুদ্ধে প্রায়ই আঘাত হানা হইত। ১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে স্পেনিশ মরক্কোতে অবস্থিত সৈন্যদলের সেনাপতি ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্পেনে অভিযান করেন। বিশেষ বাধার সম্মুখীন না হইয়া তিনি স্পেনের দক্ষিণতম অংশ ও সমগ্র পশ্চিম অঞ্চল জয় করেন। নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে বিদ্রোহীরা মাদ্রিদ শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে স্পেনের সরকার ভেলেন্সিয়া নামক স্থানে পশ্চাদপসরণ করে এবং রাজধানীর পতন আসন্ন হয়। এই সময় হইতে সরকারী সৈন্যদের প্রতিরোধ প্রবল হয়; এবং বৎসরের শেষে যুদ্ধের অবস্থা অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইল।

দুইটি কারণে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ আন্তর্জাতিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, আবিসিনিয়ায় বিজয় লাভের পর ইটালী পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে নিজেকে শক্তিশালী করিবার সুযোগ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম মহাযুদ্ধ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার রাজনৈতিক নীতিকে অন্যান্য রাষ্ট্রে জয়যুক্ত করিবার প্রয়াসী হইয়াছিল। ১৯২৭ সনের পূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিল, এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশেও ইহা অনুসৃত হয়। ১৯৩৩-'৩৪ সনে অষ্ট্রিয়ান নাজীদিগকে জার্মানী অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করে; এবং ইটালীও অষ্ট্রিয়ায় ফ্যাসীবাদী সরকার গঠনের চেষ্টা করিয়াছিল। ১৯৩৬ সনে জার্মানী ও ইটালী স্পেনের গৃহযুদ্ধটিকে সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সংগ্রাম বলিয়া ধরিয়া লয়, এবং বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করে। অবশ্য, এই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারীদের জাতীয় স্বার্থ যে কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ সম্পর্কে ইটালী প্রথম হইতেই ওয়াকিবহাল ছিল, কারণ তাঁহার সৈন্যদিগকে মরোক্কো হইতে স্পেনে স্থানান্তরিত করিতে ইটালীয়ান ব্যোমযান ব্যবহৃত হয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র ইয়োরোপ দুইটি দলে বিভক্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। ইটালী, জার্মানী ও পর্তুগাল খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, এবং অপরপক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারকে সমর্থন করে। ১৫ই আগষ্ট, নিরপেক্ষ বৃটিশ সরকার বৃটেন হইতে স্পেনে যুদ্ধ-দ্রব্যাদি প্রেরণ নিষিদ্ধ করে, এবং ফ্রান্সও এই নীতি অনুসরণ করে। এই দুইটি দেশ ইয়োরোপের সমস্ত দেশগুলিকে স্পেনের যুদ্ধে কোন পক্ষের

জন্য যুদ্ধদ্রব্য প্রেরণ না করিবার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে, এবং এই চুক্তি তদারক করিবার জন্য লণ্ডনে একটি অ-হস্তক্ষেপ কমিটি গঠন করিতে আমন্ত্রণ করে। পর্ত্তুগালের অনিচ্ছাপ্রসূত কিছু বিলম্বের পর এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। কয়েক সপ্তাহের জন্য স্পেনে অস্ত্র-সরবরাহ বন্ধ থাকে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার পরেই স্পেন সরকার ও সোভিয়েট সরকার ইটালী, জার্মানী ও পর্ত্তুগাল কর্তৃক চুক্তি অমান্য করার অভিযোগ করে; এবং এই অভিযোগের ফলে সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনা হয়। অক্টোবর মাস হইতে জার্মানী ও ইটালী বিদ্রোহীদিগকে এবং রাশিয়া স্পেন সরকারকে মুক্তভাবে সাহায্য করে। নভেম্বর মাসে মাদ্রিদের পতন আসন্ন হইলে জার্মানী ও ইটালী সেনাপতি ফ্রাঙ্কো কর্ত্তৃক স্থাপিত সরকারকে সরকারীভাবে স্বীকার করে। বহুসংখ্যক ইটালীয়ান ও জার্মান সৈন্য বিদ্রোহীদের পক্ষে যুদ্ধ করে, এবং রাশিয়ান, ফ্যাসিষ্ট বিরোধী ইটালীয়ান, অ-নাজী জার্মান ও অন্যান্য দেশের বহু স্বেচ্ছাসেবক স্পেন সরকারের পক্ষে যোগদান করে। এইরূপে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ স্পেনে সংঘটিত একটি ইয়োরোপীয় গৃহযুদ্ধরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠী গঠন :

১৯৩৬ সনের শেষভাগে ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তির ফলস্বরূপ সাম্যবাদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য জাপ-জার্মান চুক্তি সম্পাদিত হয়। বিশ্বের একটি বৃহৎ অংশ দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়—একটির নেতৃত্ব করে জার্মানী, ইটালী ও জাপান, এবং অন্যটির নেতা ছিল রাশিয়া ও ফ্রান্স। প্রথম দলটিকে ফ্যাসিষ্ট দল বলিয়া সাধারণতঃ অভিহিত করা হয়, যদিও জাপানকে প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিষ্ট বলা যায় না। অপর দলটিকে কোন রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা চিহ্নিত করা সহজ-সাধ্য ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী দুইটি রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা একতাবদ্ধ হয় নাই; প্রথম দলটি ১৯১৯ সনের সন্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এবং দ্বিতীয় দলটি এই সন্ধি বজায় রাখিতে ইচ্ছুক ছিল। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হইবে কি না এই প্রশ্ন লইয়া।

বৃটিশ সরকার তখনকার মত কোন গোষ্ঠীতে যোগ না দিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল। ১৯৩৭ সনের প্রথমদিকে স্পেনীয় মরোক্কোতে

জার্মান বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে বলিয়া একটি গুজব উঠে, এবং অনেকে ভয় করে যে, ফ্রাঙ্কো জার্মান সাহায্য লাভের বিনিময়ে মরোক্কো হিটলারকে অর্পণ করিবে। ফ্রান্স এই সময়ে স্পেনকে ১৯২২ সনের চুক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিল; এই চুক্তির দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে, স্পেন মরক্কো হস্তান্তর করিতে পারিবে না। অবশ্য জার্মানী মরক্কো সম্বন্ধে তাহার কোন লোভ নাই বলিয়া ঘোষণা করে, এবং ফ্রাঙ্কো সমগ্র স্পেন রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাহার সংকল্প ব্যক্ত করেন। কিছুদিন পরে স্পেনের ব্যাপারে জার্মানী ইটালীকে প্রধান ভূমিকাটি ছাড়িয়া দেয়; জার্মানী কেবলমাত্র দ্রব্য-সম্ভার ও কারিগরি সাহায্য পাঠাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, এবং ইটালীয়ান সৈন্যরা স্পেনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। স্পেনীয় সরকারের সপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী যুদ্ধ চালায়; দ্রব্যসম্ভার সম্ভবতঃ রাশিয়া হইতে ফ্রান্সের মধ্য দিয়া পাঠান হইত।

ইয়োরোপের সাধারণ অবস্থা তখনও ফ্রান্সের রাজনৈতিক সংকটের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। ১৯৩৬ সনের জুন মাসে, প্রগতি-পন্থী, সমাজ-বাদী ও সাম্যবাদীদের মিলিত 'জনপ্রিয় দলটি' (Front Populaire) একটি সরকার গঠন করিয়া শ্রমিক ও মালিকদের সম্পর্ক পরিবর্তন করিয়া প্রগতিশীল আইন পাশ করার ফলে ধনিক শ্রেণীগুলি এই আইনকে বিপ্লববাদী বলিয়া প্রচার করে, এবং প্রধানমন্ত্রী ব্লামকে রাশিয়ার চর বলিয়া নিন্দা করে। জার্মানী ও ইটালীর বিপুল সাহায্যের ফলে স্পেনে ফ্রাঙ্কো জয়ী হন। ফ্রান্স হয়তো এই পরিণতি রোধ করিতে পারিত। কিন্তু সকল ফরাসীদের ন্যায় ব্লামও বৃটেনের সহিত একযোগে কাজ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। গ্রেট বৃটেন স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে ইউরোপীয় জাতিগুলির হস্তক্ষেপে বাধা দিয়া ইউরোপকে একটি সামগ্রিক যুদ্ধের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করে। ১৯৩৯ সনের বসন্তকাল পর্যন্ত উত্তেজনা চলিতে থাকে, এবং সরকারী ঘাঁটি ক্যাটালোনিয়ার পতন ঘটিলে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যগণ মাদ্রীদ অধিকার করে। ইহার পরে ফ্রান্স ও বৃটেন ফ্রাঙ্কো সরকারকে স্বীকৃতি দান করে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পৃথিবীর অবস্থা বিপদ-মুক্ত হইল না। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ চলিবার সময় জাপান চীনের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চালায় তাহাতে যুদ্ধের ঘোষণা না থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধই ছিল।

১৯৩৭ সনের নভেম্বর মাসে ইটালী জার্মান ও জাপানের মধ্যে স্বাক্ষরিত কোমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তিতে যোগদান করে, এবং ১১ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করে। মুসোলিনী মিউনিকে হিট্‌লারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জার্মান-ইটালীয়ান বন্ধুত্ব দৃঢ় করেন, এবং ১৯৩৮ সনে হিট্‌লারও রোম পরিদর্শন করেন। এইরূপে বার্লিন-রোম Axis সৃষ্টি হয়, এবং জাপানকে ইহার সহিত যুক্ত করা হয়। চেকোশ্লভাকিয়ার জার্মানগণ জার্মানীর সঙ্গে মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, সুদেতান (Sudeten) জার্মানদের নেতা হেন্‌লেন্‌ প্রচার কার্যের জন্য বৃটেন পরিদর্শন করেন।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় বিরোধিদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯৩৬ সনে সোভিয়েট সরকার লেনিনের দলের অনেক বিপ্লবীর বিচার করে, এবং ১৯৩৭ সনে একদল প্রসিদ্ধ সেনানায়ককে নিশ্চিহ্ন করা হয়। ফরাসী-সোভিয়েট মিত্রতার সামরিক মূল্য যথেষ্টভাবে হ্রাস পাইয়াছিল কিনা এবং অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতার ব্যাপারে ইটালীর আগ্রহ অক্ষুণ্ণ ছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তবে মোটামুটিভাবে ১৯৩৭ সনটি প্রস্তুতির বৎসর মাত্র ছিল, এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। ইটালী দাবী করিল যে, আবিসিনিয়া অধিকারের ফলে সুয়েজখালের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে তাহাকে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া উচিত, এবং টুনিসের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ইটালীয়ান ছিল বলিয়া এই উপনিবেশটি ইটালীরই প্রাপ্য। বৃটেনের অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে ইটালীতে প্রচারকার্য আরম্ভ হয়। ১৯৩৮ সনের ১৬ই জানুয়ারী, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন জেনেভায় জাতিসংঘের কাউন্সিলে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা-বৃদ্ধিমূলক সহযোগিতানীতির সমর্থন হিসাবে বৃটেনের পুনরস্ত্রীকরণের ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু, বৃটিশ মন্ত্রীসভায় মতভেদ ঘটে, এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী ইডেনের পদত্যাগ ঘোষিত হয়। ইডেন তাঁহার পদত্যাগের প্রাক্কালে পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, ইটালী বৃটেনের বিরুদ্ধে শত্রুসুলভ প্রচারকার্য বন্ধ ও স্পেন হইতে সৈন্য অপসারণ না করিলে তিনি তাহার সহিত কোনরূপ আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিতে রাজী হইবেন না। বল্‌ডুইনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নেভাইল চেম্বারলেইন ও নূতন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইটালীর সহিত আলোচনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। চেম্বারলেইন দুই বৎসর পূর্বে ঘোষিত বল্‌ডুইনের নীতির বিরোধিতা করিয়া ২২শে ফেব্রুয়ারী বলেন

যে, জাতিসংঘ আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করিবে এইরূপ আশ্বাস বা উৎসাহ দেওয়া ভুল। বিদেশী সৈন্যদিগকে স্পেন হইতে অপসারণ-সংক্রান্ত বৃটিশ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইলে বৃটেন ইটালীর আবিসীনীয়া-অধিকারকে স্বীকৃতি দিবার জন্য জাতিসংঘকে চাপ দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

জার্মানীর আক্রমণ :

√১৯৩৮ সনের প্রথম দিকে হিট্‌লার জার্মানীর সকল সশস্ত্র বাহিনীর কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এবং রিবেনট্রপকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। অষ্ট্রিয়ান নাজীরা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে, এবং অষ্ট্রিয়ান চ্যান্সেলর সুছনীগ্ বার্কটেস্ গ্যাডেন্ নামক স্থানে হিট্‌লারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে হিটলারের দাবী অনুযায়ী তিনি তাঁহার সরকারে নাজী প্রতিনিধিগণকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। তথাপি, তিনি রক্ষা পাইলেন না। ১২ই মার্চ জার্মান সৈন্যরা ভিয়েনা অধিকার করিলে তাহাদের একটি দল ব্রেণার গিরিবর্ত্মে প্রেরিত হইয়া ইটালীয়ান সৈন্যদের সহিত অভিবাদন বিনিময় করে। অষ্ট্রিয়ায় কোন প্রতিরোধ দেখা যায় নাই; সম্ভবতঃ জনসাধারণের বেশীর ভাগ জার্মানীর সহিত পুনর্মিলন কামনা করিয়াছিল। চেকোশ্লভাকিয়াকে এখন তাহার বিস্তীর্ণ সীমান্ত বরাবর জার্মানীর সম্মুখীন হইতে হইল, এবং অষ্ট্রিয়া-সংলগ্ন চেকোশ্লভাক সীমান্ত ছিল মুক্ত। তাহার প্রায় ১২ কোটী অধিবাসীর মধ্যে ৩০২ লক্ষ ছিল সীমান্তে অবস্থিত সাদেতেন জার্মান। জার্মানী এবার চেক্ সীমান্ত বরাবর বড রকমের কুচ্‌কাওয়াজ করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। চেক্ সরকার রিজার্ভ বাহিনীর কিয়দংশকে প্রস্তুত রাখিল এবং সাদেতেন জার্মানদিগের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করে। তাহারা আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষায় ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত ছিল, এবং ফ্রান্স ও রাশিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। যদিও এ-বিষয়ে বৃটেনের কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল না, তথাপি ২৪শে মার্চ চেম্বারলেইন পার্লামেণ্টে বলেন যে, তাহাদের মিত্র-রাষ্ট্র ফ্রান্স এই ব্যাপারে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িলে ঘটনার চাপ সরকারী ঘোষণা অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী হইয়া দেখা দিতে পারে। ফলে, ফ্রান্স যুদ্ধে লিপ্ত হইলে বৃটেনও তাহার পক্ষে যোগ দিবে বলিয়া অনেকে মনে করে।

এসব সত্ত্বেও স্পেনেই ইউরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আশঙ্কা ছিল সর্বাধিক। সরকার কর্তৃক অধিকৃত বন্দরগুলিতে মাল সরবরাহ করিবার সময় বৃটিশ জাহাজগুলির উপর জার্মান বা ইটালীয়ানদের দ্বারা চালিত বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করা হয়। কিন্তু, আবার উভয়পক্ষে যুদ্ধকারী বিদেশী সৈন্যদের অপসারণের জন্য একটি বৃটিশ পরিকল্পনা তখন আলোচিত হইতেছিল। মধ্য ইউরোপে, বিপদের সম্ভাবনা হ্রাস করিবার জন্য লর্ড রান্‌কিম্যানকে পরামর্শদাতা ও আপোষকারীরূপে প্রাগে পাঠান হইল। কিন্তু জার্মানীর সমর্থনের ফলে সাদেতেন দাবীগুলি ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিল; এবং যদিও নূতন নূতন সুবিধার প্রস্তাব করা হইল, ১২ই সেপ্টেম্বর সাদেতেনদিগকে জার্মানীর সহিত পুনর্মিলনের জন্য জোর করিতে হিট্‌লার পরামর্শ দিলেন এবং তিনি তাহাদিগকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। যেহেতু রাশিয়া ও ফ্রান্স চেক্‌দিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিল সেইহেতু যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। ১৫ই সেপ্টেম্বর চেম্বারলেইন শান্তিরক্ষাকল্পে মিউনিকে উপস্থিত হন এবং বার্চটেস্‌গ্যাডেনে হিট্‌লারের সহিত আলোচনা করেন। পরদিন লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ারের সহিত মিলিত হন। এই সময়ে জাতিসংঘের পরিষদের বৈঠক চলিতেছিল। লিট্‌ভিন্‌ভ্‌ চেক্ সরকার ও ফ্রান্সকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সরকারীভাবে পুনরুল্লেখ করিলেন। কিন্তু, সামরিক সহযোগিতা সম্পর্কে কোনরূপ পরামর্শ হইল না। সমস্তবৎসরটি ধরিয়া ষ্ট্যালিনের বিরোধী পীড়ন-নীতি চালু ছিল; এবং সোভিয়েট সামরিকযন্ত্রের দক্ষতা সম্বন্ধে অনেকের মনে ভয়ের সৃষ্টি হইল।

সাদেতেন জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলের একটি বড় অংশ জার্মানীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য চেম্বারলেইন ও দালাদিয়ার যুগ্মভাবে চেক্‌সরকারের নিকট প্রস্তাব করিলে চেক্‌সরকার ভয়ানক চাপে পড়িয়া ইহাতে রাজী হয়। ইহার পর চেম্বারলেইন জার্মানীতে উপস্থিত হইয়া হিট্‌লারের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিলে হিট্‌লার এমন সব অদ্ভুত দাবী উপস্থিত করেন যে, চেম্বারলেইন ইহার একটি বিবরণী প্রাগে প্রেরণ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে রাজী হইলেন না। স্থির হইল যে, হিট্‌লার চেকোশ্লভাকিয়া আক্রমণ করিলে ফ্রান্স ও বৃটেন চেক্‌দিগকে সাহায্য করিবে; ব্রিটিশ নৌবাহিনী যুদ্ধার্থে প্রস্তুত রাখা হইল। চেম্বারলেইন এই ব্যাপারে একটি সম্মেলন

আহ্বানের জন্য মুসোলিনীর নিকট আবেদন করেন। ফলে ২৯শে সেপ্টেম্বর হিট্‌লার, মুসোলিনী, চেম্বারলেইন ও দালাদিয়ার একটি বৈঠকে মিলিত হইয়া একটি মীমাংসায় উপনীত হইলেন। চেক্ বা সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন প্রতিনিধি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিল না; এবং চেকোশ্লভাক সরকারের নিকট মীমাংসাটি পেশ করা হইলে, অসন্তুষ্ট জনসাধারণের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া সরকার পদত্যাগ করে, এবং সেনাপতি সিরোভি শাসনভার গ্রহণ করেন। কয়েকদিন পরে রাষ্ট্রের সভাপতি বেনেস্ পদত্যাগ করিয়া দেশত্যাগ করেন। চেম্বারলেইন দেশে ফিরিয়া তাঁহার ও হিট্‌লারের স্বাক্ষরিত একটি দলিল গর্বের সহিত সকলের নিকট প্রচার করেন। এই দলিলে বৃটেন ও জার্মানী সর্বপ্রকার বিরোধের কারণ দূর করিয়া ইউরোপের শান্তি রক্ষায় সাহায্য করিবে বলিয়া বলা হয়। চেম্বারলেইন ও দালাদিয়ার উভয়ে স্ব স্ব দেশে তাঁহাদের কল্পিত সাফল্যের জন্য বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করিলেন।

পরে প্রকাশ হয় যে, হিট্‌লার চেম্বারলেইনকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, সাদেতেন অঞ্চল লাভ করিবার পর হিট্‌লার আর কোনরূপ দাবী করিবেন না। চেকোশ্লভাকিয়ার অনেক অঞ্চল হস্তচ্যুত হইয়াছিল। পূর্বদিকে, পোল্যাণ্ড টেচেন দাবী করিলে তাহাকে এই অঞ্চল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দক্ষিণে, হাঙ্গেরী দশলক্ষ ম্যাগীয়ার-অধ্যুষিত একটি বৃহৎ অঞ্চল দাবী করিলে ইহাও বাধ্য হইয়া ত্যাগ করা হয়। অসন্তুষ্ট শ্লোভাকিয়া চেকোশ্লভাকিয়া হইতে পৃথক্‌ভাবে স্বায়ত্তশাসন দাবী করে, এবং জার্মান দালালগণ ইহাতে উস্কানী দেয়। ফলে, ক্রমশঃ শ্লোভাকিয়া চেক্ অঞ্চলগুলি হইতে পৃথক হইয়া যাইতে থাকে। মিউনিক চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, চেকোশ্লভাকিয়া ও জার্মানীর প্রতিনিধিসহ একটি আন্তর্জাতিক কমিশন চেক্ অঞ্চল ও সাদেতেন অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারণ করিবে। কিন্তু, কার্যতঃ, জার্মান বাহিনী কয়েকটি চেক্-অধ্যুষিত স্থানও অধিকার করে। ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া পোল ও হাঙ্গেরীয়ানরাও চেক্ অঞ্চলগুলি দখল করিবার চেষ্টা করিলে চেক্‌সৈন্যরা বাধা দেয়। হাঙ্গেরী রুথেনিয়া নামক অনুন্নত প্রদেশটি দাবী করিলে জার্মানী ইহাকে জার্মান-নিয়ন্ত্রিত শ্লোভাকিয়ার অধীনে রাখিতে ইচ্ছা করে। ফলে, মিউনিক চুক্তি সমস্যার সমাধান করিতে অকৃতকার্য হয়, এবং স্কোডার বিখ্যাত অস্ত্র নির্মাণ কারখানা

জার্মানীর নিয়ন্ত্রণাধীন হইল। বৃটেন ও ফ্রান্স তাহাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া পুনরস্ত্রীকরণে জোর দিল ; এদিকে চেক্ সরকারের কর্ণধারগণ জার্মান নীতির সহিত আপোষ করিয়া চলিতে চাহিল।

কিন্তু হিট্‌লারের লোভ আরও বৃদ্ধি পাইল। চেক্ শাসনাধীন ২½ লক্ষ জার্মানের সম্বন্ধে হিটলার উদ্বেগ প্রকাশ করেন, এবং ১৯৩৯ সনের ১৫ই মার্চ চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন রাষ্ট্রপতি হাচাকে যুদ্ধের হুমকি দেখাইয়া বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া নামক প্রদেশ দুইটি জার্মানীর রক্ষণাধীনে ছাড়িয়া দিতে সম্মত করেন। জার্মান সৈন্যরা ইতিমধ্যে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া অভিমুখে যাত্রা করে ও কয়েকটি চেক্ শহর অধিকার করে। শ্লোভাকিয়া নামে মাত্র স্বাধীন ছিল ; এবং ৬৫ লক্ষ চেক্ আবার জার্মান শাসনের অধীন হইল।

যুদ্ধারম্ভ :

হিট্‌লার বিজয়ীর বেশে প্রাগে প্রবেশ করিয়া লিথুনিয়া সরকারের নিকট একটি চরমপত্র প্রেরণ করিয়া মেমেল ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দাবী করেন ; ইহা ২১শে মার্চ অধিকার করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বাল্টিক বন্দরটির পুনরস্ত্রীকরণ আরম্ভ হয়। এই সময়ে রিবেণট্রপ ডানজিগ্ ও পূব প্রাশিয়ার সহিত জার্মানীর অবশিষ্ট ভাগের সংযোগ স্থাপনের জন্য করিডরের মধ্য দিয়া একটি স্থান দাবী করিয়া পোলাণ্ডের নিকট একটি প্রস্তাব পাঠাইলেন। কিন্তু পোলাণ্ড এই দাবী মানিতে অস্বীকার করে।

বৃটিশ সরকার এবার দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিল যে, পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানা হইলে বৃটেন পোল্যাণ্ডকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবে। ফ্রান্স পূর্বেই পোল্যাণ্ডের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। অল্প কয়েকদিন পরে ইটালী দ্রুতগতিতে আলবেনিয়ার বন্দরগুলি অধিকার করিয়া আলবেনিয়ায় কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এইরূপে একটি নূতন অঞ্চলে আক্রমণ আরম্ভ হইলে বৃটেন গ্রীস ও রুমানীয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ফ্রান্সের সহিত যুক্তভাবে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। আবার, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পোল্যাণ্ড ফ্রান্স ও বৃটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ হইলে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। যুগোশ্লোভিয়ার আক্রমণের আশঙ্কা থাকিলেও সে সাহায্যের প্রয়োজন নাই বলিয়া ঘোষণা করিল। 'জার্মানী ও ইটালীর সহিত

তাহার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইতেছিল ; চেকোশ্লোভাকিয়ার উদাহরণ দেখিয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর সে ভরসা রাখিতে পারিল না। পোতাশ্রয়যুক্ত গ্রীসে বৃটিশ-সাহায্য প্রেরণ করা সম্ভবপর ছিল ; এবং রাশিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীর নিকট হইতে কয়েকটি স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়া এই সকল রাষ্ট্রের ভয়ে রুমানিয়া যেকোন প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে উৎসুক ছিল। উপরন্তু, এই সময়ে বৃটিশ সরকার তুরস্কের সহিত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পরস্পরের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করে। আলেকজাণ্ড্রাট্টার স্যাণ্ডজাকের উপর তুরস্কের দাবী ফ্রান্স স্বীকার করিয়া লইলে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে অনুরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এপ্রিল মাসে যুদ্ধের উপযুক্ত সকল পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে একটি আইন পাশ হয়, এবং ১৯ বৎসর ও ২০ বৎসরের মধ্যবর্তী পুরুষদিগকে সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। এইরূপে আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য বৃটেন দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করে। ২৭শে এপ্রিল, জার্মান সরকার ১৯৩৫ সনে স্বাক্ষরিত এ্যাংলো-জার্মান নৌচুক্তিটি বাতিল করে। হিট্‌লার অভিযোগ করেন যে, মিউনিক সম্মেলনের পর বৃটেন চেম্বারলেইন ও তাঁহার দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তিটি লঙ্ঘন করিয়া পরিবেষ্টন নীতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

মার্চ মাস হইতে মস্কোতে যৌথ যুদ্ধব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়, এবং বৃটেন ও ফ্রান্স এই আলোচনায় যোগ দিবার জন্য তাহাদের সামরিক প্রতিনিধিদিগকে প্রেরণ করে। অনেক বিলম্বের পর জানা গেল যে, বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি—লিথুনিয়া, লাটভিয়া, এষ্টোনিয়া ও ফিনল্যাণ্ড্ সম্বন্ধে সোভিয়েট-গ্যারান্টী স্বীকৃত না হইলে রাশিয়া কোনপ্রকার সামরিক চুক্তিতে রাজী হইবে না। কিন্তু এই দেশগুলি এই জাতীয় গ্যারান্টীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই ; এবং তাহারা জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্থাপন করে। পোল্যাণ্ডও রাশিয়ার সহিত কোন চুক্তি করিতে ইচ্ছুক হইল না। এদিকে রিবেনট্রপ হঠাৎ মস্কোতে আগমন করিয়া জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে ২৩শে আগষ্ট একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

Gdynia নামক পোলিশ গ্রামে পোল্যাণ্ড্ একটি পোতাশ্রয় নির্মাণ করিলে ড্যানজিগের একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্ষতি হয় এবং এই নূতন পোতাশ্রয় দক্ষতায় ড্যানজিগ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইলে রাজনৈতিক আদর্শ-

বাদের সংঘর্ষে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও যুক্ত হইল। ড্যানজিগ্ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমুদ্রের সহিত পোল্যাণ্ডের যোগাযোগ বন্ধ করিবার জন্য হিট্লার দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। উপরন্তু, করিডোরের মধ্য দিয়া আর একটি ক্ষুদ্রস্থান জার্মানী দাবী করিলে পোল্যাণ্ড জার্মান দাবী মানিতে অস্বীকার করিল। জার্মানী ১লা সেপ্টেম্বর তিনদিক হইতে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

তৃতীয় ভাগ

যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগ

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ—কেবলমাত্র হিট্‌লারের ড্যান্‌জিগ ও পূর্ব-প্রাশিয়ার সহিত সংযোগকারী একটি করিডোরের দাবী পোল্যাণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখানের ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ আরও সূক্ষ্ম। প্রথমতঃ, জার্মান জাতীয়তাবাদই জার্মানীকে যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দেয়। জার্মান জাতীয়তাবাদীগণ ইয়োরোপের জার্মান-ভাষাভাষী সকল লোককে একটি জার্মানরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিল। ফলে, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লভাকিয়ার সাদাতেনল্যাণ্ড, উত্তর সাইলেশিয়া, ড্যানজিগ্, পোলিশ করিডোর ও মেমেল, প্রভৃতি অঞ্চলের জার্মানদিকে জার্মানীর সহিত সংযুক্তিকরণের চেষ্টা আরম্ভ হইল। ইহা ছাড়া, ইটালীর ফ্যাসিষ্টগণ ইটালীয়ান-ভাষা-ভাষী অঞ্চল—কর্সিকা, স্যাভয় ও নাইস,—রাশিয়ার সাম্যবাদীরা পোল্যাণ্ড্-শাসিত রাশিয়ান ভাষা-ভাষী অঞ্চল—শ্বেতরাশিয়া ও লিট্‌ল রাশিয়া,—এবং হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া তাহাদের পূর্ব-অধিকৃত কতকগুলি স্থান পুনরধিকার করিবার আশা পোষণ করিত।

দ্বিতীয়তঃ, নাজীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকালীন জার্মান উপনিবেশগুলির প্রত্যর্পণের জন্য দাবী করিল; সোভিয়েট নেতারা বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলিকে লুব্ধনয়নে লক্ষ্য করিতেছিল; ইটালী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের ক্ষতি সাধন করিয়া ইটালীয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি কামনা করিল; এবং জাপান প্রশান্তমহাসাগরে স্বীয় প্রাধান্যস্থাপনে ইচ্ছুক হইল। এইরূপে, সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্খা যুদ্ধের সৃষ্টি করিল। ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলি ক্রমে নিজেদের মধ্যে জোটের সৃষ্টি করিল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।

তৃতীয়তঃ, ১৯৩৬-৩৯ সনে ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সামরিক প্রস্তুতি ও সামরিক ব্যয় বিপুল আকার ধারণ করিল, এবং সমরোপকরণের বৃদ্ধি ও জাতীয় ভীতির বৃদ্ধির ফলে ইয়োরোপের শান্তি ব্যাহত হইবার উপক্রম হইল।

চতুর্থতঃ, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ন্যায় ১৯৩৯ সনেও ইয়োরোপে ও অন্যত্র 'আন্তর্জাতিক অরাজকতা' দেখা দিল। জাপান, ইটালী ও জার্মানী আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বিভিন্ন সন্ধি লঙ্ঘন করিয়া এবং জাতিসংঘকে অমান্য করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে মন দিল। এইরূপে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিশ্বের যৌথ-নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখিতে সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত হইল।

জার্মানীর বিদ্যুৎ-গতি যুদ্ধ :

জঙ্গীবিমান, সাঁজোয়া গাড়ী, ও ট্যাঙ্ক, প্রভৃতির সাহায্যে একমাসের মধ্যেই জার্মানী ওয়ারশ অধিকার করিল। এদিকে রাশিয়া যুগপৎ আক্রমণ চালাইয়া পূর্ব-পোল্যাণ্ড দখল করিল। সাহসী পোল দেশপ্রেমিকদের মাতৃভূমি রক্ষার মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। দূর হইতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স শীঘ্রই পোল্যাণ্ডকে কোন সাহায্য পাঠাইতে পারিল না। পশ্চিম পোল্যাণ্ড জার্মানীর অধিকারে আসিল। পোলিশ সরকার বৃটেনে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এইসময়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক প্রস্তুতি জার্মানীর তুলনায় নগণ্য ছিল। ফরাসীরা ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে জার্মানীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না; তাহারা তাহাদের প্রতিরক্ষা রেখার (মেজিনো লাইনের) পশ্চাতে নিজদিগকে সুসংবদ্ধ করিল। অর্থনৈতিক অবরোধের সাহায্যে জার্মানীকে সন্ধি করিতে বাধ্য করা যাইবে বলিয়া মিত্র-পক্ষ মনে করিল। এদিকে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুনিয়ায় স্থল, নৌ, ও বিমান ঘাঁটি স্থাপনের জন্য রাশিয়া কতগুলি অধিকার আদায় করিল, এবং ফিন্‌ল্যাণ্ড এইরূপে দাবী মানিতে অস্বীকার করিলে রাশিয়া যুদ্ধে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে পরাজিত করিল। ফ্রান্স ও বৃটেনের চেষ্টায় জাতিসংঘ রাশিয়ার এই আক্রমণকে নিন্দা করিল। উত্তরস্বরূপ রাশিয়া জাতিসংঘ ত্যাগ করিল, এবং ফিন্‌ল্যাণ্ড কতগুলি প্রধান প্রধান অঞ্চল রাশিয়াকে অর্পণ করিয়া রাশিয়ার সহিত একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই রাশিয়া লিথুনিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও রুমানিয়ার কিয়দংশ অধিকার করিল।

এইরূপে পূর্ব ইয়োরোপ রাশিয়া ও জার্মানীর পদানত হইবার পর ১৯৪০

সনের বসন্তকালে. হিট্‌লার পশ্চিম ইয়োরোপ আক্রমণ করিবার অবসর পাইলেন। ১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে জার্মানী ডেন্‌মার্ক ও নরওয়ে অধিকার করে; নরওয়ে সরকার ইংলণ্ডে পলায়ন করে, এবং হিট্‌লার কুইস্‌লিং নামক এক বিশ্বাসঘাতককে নরওয়ের শাসনকর্তা মনোনীত করেন। পরবর্তী মাসে হিট্‌লার মেজিনো রেখার উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে হল্যাণ্ড, লাক্সেমবার্গ ও বেলজিয়ামের উপর আক্রমণ করিয়া ইহাদের পরাস্ত করেন, এবং বিদ্যুৎগতিতে ফ্রান্স আক্রমণ করেন। সহস্র সহস্র মিত্রসৈন্য জার্মানদের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে; অতি কষ্টে ডানকার্ক বন্দর হইতে অবরুদ্ধ সৈন্যদের একটি অংশকে বৃটিশ নৌবাহিনী ইংলণ্ডে অপসারিত করে।

১৯৪০ সনের ১৪ই জুন প্যারিসের পতন হয়। প্রজাতান্ত্রিক সরকার পদত্যাগ করে, এবং মার্শাল পেঁতা শাসনভার গ্রহণ করিয়া জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। জার্মানগণ সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ফ্রান্স অধিকার করে, এবং ফ্রান্সের অবশিষ্ট অংশে পেঁতার অধীনে একটি জার্মান তাঁবেদার সরকার শাসন করিতে থাকে। সুযোগ পাইয়া মুসোলিনী নাইস্ ও ইটালী-সংলগ্ন ফ্রান্সের অন্যান্য কয়েকটি অংশ দখল করেন।

১৯৪০ সনের আগষ্ট মাসে রুমানিয়া প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর অধিকারে আসে; ডোব্রুজা বুলগেরিয়াকে, এবং ট্রান্সিল্‌ভেনিয়ারঅর্ধেক অংশ হাঙ্গেরীকে অর্পণ করা হয়। ফলে হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া Axis শক্তি গোষ্ঠীর দলভুক্ত হইল। ঐ একই মাসে ইটালী বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড অধিকার করে এবং মিশর আক্রমণ করে। অতঃপর অক্টোবর মাসে ইটালীয় সৈন্যগণ আল্‌বেনিয়ার মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া গ্রীস আক্রমণ করে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত-ভাবে আক্রমণকারীগণকে গ্রীকগণ প্রবলভাবে বাধা দেয়। ইটালীয় বাহিনী পরাজিত হইয়া আল্‌বেনিয়ায় পশ্চাদপসরণ করে। ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাসে হিটলার ইটালীর সাহায্যের জন্য বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লভিয়ার মধ্য দিয়া প্রচুর সৈন্য প্রেরণ করেন; যুগোশ্লভিয়া ইহাতে বাধা দিলে তাহাকে পরাজিত করা হয়। বৃটেন মিশর হইতে একদল সৈন্য গ্রীকদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করে, কিন্তু তাহারা এক্সিস্ বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিতে অসমর্থ হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রীস এক্সিসদের অধিকারে আসে।

১৯৪১ সনের এপ্রিলমাসে স্বাক্ষরিত একটি সন্ধির বলে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের অধিকার এবং চীনা মঙ্গোলিয়ায় রাশিয়ার অধিকার পরস্পরের

মধ্যে স্বীকৃত হইল। ইউরোপের এক্সিস্ বিজয়ের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া জাপান ফরাসী ইন্দোচীন এবং থাইল্যাণ্ডের কিয়দংশ অধিকার করে।

বৃটেনের সহিত সংঘর্ষ :

ফ্রান্সের পতনের পর হইতে জার্মানী বৃটেনের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। বৃটেনের শহরগুলিতে বিমান হইতে অসংখ্য বোমা বর্ষণ করিয়া ও বহু জাহাজ টরপেডোর সাহায্যে ধ্বংস করিয়াও জার্মানী ইংরেজদের মনোবল নষ্ট করিতে পারিল না। ১৯৪০ সনের ১০ই মে চেম্বারলেইনের স্থলে চার্চিল বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করিলে ইংরেজদের মনে এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার হয়। বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি অংশ এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের সহায়তা করে। ইহা ছাড়া, পশ্চিম গোলার্ধের প্রজাতন্ত্রগুলি, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্র, নানারূপে ইংলণ্ডকে সাহায্য করে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্ট্ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কয়েকটি স্থানে প্রতিরক্ষামূলক কয়েকটি ঘাঁটি স্থাপন করার অধিকারের বিনিময়ে বৃটেনকে ৫০টি যুদ্ধজাহাজ প্রদান করেন। যুক্তরাষ্ট্রেও দ্রুতগতিতে সমর প্রস্তুতি চলিতে থাকে। ১৯৪০ সনের জুন মাস হইতে ১৯৪১ সনের জুন মাস পর্যন্ত বৃটেন একক ও নিঃসঙ্গভাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালায়। বৃটিশ সৈন্যরা মিশর হইতে ইটালীয় বাহিনীকে বিতাড়িত করে, লিবিয়ার প্রায় অর্ধেকাংশ সাময়িকভাবে অধিকার করে, এবং পূর্ব আফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ড ও এরিত্রিয়া জয় করে, ও আবিসিনিয়া হইতে ইটালীয় বাহিনীকে বহিষ্কৃত করে।

হিট্‌লার ও ষ্ট্যালিনের কলহ :

হিটলার কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস অধিকৃত হইবার পর বলকান্ অঞ্চলের অধিকার লইয়া ষ্ট্যালিনের সহিত হিটলারের মতবিরোধ ঘটিলে ১৯৪১ সনের জুন মাসে হিটলার আকস্মিকভাবে রাশিয়া আক্রমণ করেন। প্রথমদিকে জার্মানরা দ্রুতগতিতে প্রায় মস্কো পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু ইহার পরে তাহাদের অগ্রগতি মন্থর হইল। এদিকে সুবিধা পাইয়া ইংরেজরা জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত দেশগুলির উপর বিপুলভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিল। তাহারা ইরাকের জার্মান-সমর্থনকারী সরকারকে পরাজিত করে, শত্রুদের হাত হইতে সিরিয়া উদ্ধার করে, মিশরের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করে,

এবং পারস্যে শত্রুপ্রভাব নষ্ট করে। জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড যুগ্মভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান :

১৯৪১ সনের ৭ই ডিসেম্বর জাপানী অতর্কিতভাবে পার্লহারবারস্থিত আমেরিকান নৌবাহিনীর উপর বোমা বর্ষণ করিলে পরদিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী ও ইটালী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সুপ্রস্তুত জাপান অল্পদিনের মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ডাচ্ ইষ্ট্ইণ্ডিজ ও আরো অন্যান্য দ্বীপ অধিকার করে। ক্রমে ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুর জয় করিয়া তাহারা ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে আঘাত হানে। অপ্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ জাপানের অগ্রগতিরোধ করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার বিপুল অর্থনৈতিক সম্বল ও বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুতগতিতে অপরিমেয় সমরোপকরণ ও দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক বলে বলীয়ান করিয়া তুলিল এবং মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলিকে এই সকল দ্রব্যদ্বারা সাহায্য করিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিল।

যুদ্ধগতির পরিবর্তন :

১৯৪২ সনের নভেম্বর মাসে আমেরিকান সৈন্যরা উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করিয়া শত্রুদের বিরুদ্ধে বৃটিশাদগকে সাহায্য করে। ১৯৪৩ সনের প্রথমে জার্মানরা ষ্ট্যালিনগ্রাদে পরাজিত হয়, এবং মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে আফ্রিকা হইতেও তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হয়। ইহার পরে ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনী ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ইটালী হইতে শত্রুদিগকে উত্তরদিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। মুসোলিনীকে পদচ্যুত করা হয়; এবং ১৯৪৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে একটি নবগঠিত ইটালীয় সরকার মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মিত্রপক্ষ তাহাদের সামরিক কর্তৃত্ব একত্রীভূত করে; ১৯৪৩ সনের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকান সেনাপতি আইসেনহাওয়ারকে পশ্চিম ইউরোপের প্রধানতম সেনাপতিরূপে এবং হ্যারোল্ড আলেকজাণ্ডারকে ইটালীতে অবস্থিত মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতিরূপে নিয়োগ করা হয়। ১৯৪৪ সনের প্রথমে রাশিয়ানরা জার্মানদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পশ্চিমদিকে অনেক দূর অগ্রসর হইল, এবং জুন মাসে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ ফ্রান্সে অবতরণ করিয়া

উত্তর-পূর্বদিকে অভিযান করিল। আগষ্টমাসে রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া জার্মানপক্ষ ত্যাগ করে, এবং প্যারিস শত্রু কবল হইতে মুক্ত করা হয়। এই সময় জার্মানরা মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করে এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্বয়ং-চালিত বোমা ব্যবহার করে। ১৯৪৫ সনের মার্চ মাসে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা রাইন অতিক্রম করে, এবং মে মাসের প্রথমভাগে রাশিয়ানরা বার্লিনের উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। হিটলার আত্মহত্যা করেন এবং ৭ই মে জার্মানী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। কয়েকদিন পূর্বেই মুসোলিনীকে হত্যা করা হইয়াছিল। এদিকে প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ ভয়ংকর আকার ধারণ করে; কিন্তু ৬ই ও ৯ই আগষ্ট যথাক্রমে হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর আমেরিকা আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া একলক্ষ ছয় হাজার জাপানীর প্রাণনাশ করিলে জাপান ২রা সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতি ম্যাক্‌আর্থারের সহিত সন্ধি করে।

১৯৪৫ সনের ১২ই এপ্রিল রুজভেল্টের মৃত্যু হইলে সহসভাপতি ট্রুম্যান যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হইলেন; এবং জুলাই মাসে বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদল জয়ী হইলে চার্চিলের স্থলে এট্‌লী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

যুদ্ধ শেষ হইল, কিন্তু, বিজিত দেশগুলির উপর সামরিক অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, যুদ্ধবিধ্বস্ত অসংখ্য দেশের পুনর্গঠন ও রুটির সংস্থান, বিশাল যুদ্ধ-ঋণ বহন করা, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নর-নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা—মিত্রপক্ষের সম্মুখে এই সকল সমস্যা প্রধান হইয়া দেখা দিল।

ষোড়শ অধ্যায়

যুদ্ধের ফলাফল

অন্যান্য দেশের তুলনায় ইয়োরোপই এই যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইয়োরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রেই অনেক শহর বোমা-বিধ্বস্ত হয়, শস্যক্ষেত্র ও কারখানা ধ্বংস হয়, এবং সহস্র সহস্র নর নারী প্রাণ হারায়, বা দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। টাকার মূল্য ভয়ানকভাবে হ্রাস পায়, এবং দ্রব্যাদির মূল্য যেমন বৃদ্ধি পায়, জীবনের মানও সেই অনুপাতে অবনত হয়।

বিজিত দেশগুলির অবস্থা: যুদ্ধের পরে শত্রুরাষ্ট্রগুলি মিত্রপক্ষীয় বাহিনীগুলির নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। পূর্বজার্মানী রাশিয়ার সামরিক শাসনের অধীনে, এবং পশ্চিম জার্মানী ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকানদের অধীনে আসিল। বার্লিন শহরটি ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া ইহার এক একটি ভাগ রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের হস্তে দেওয়া হইল। মিত্রপক্ষ অষ্ট্রিয়াও দখল করে। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান ও জাপান-অধিকৃত সমস্ত অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক-শাসনাধীন হইল, এবং সমগ্র পূর্ব ইয়োরোপ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন হইল। ন্যুরেমবার্গ নামক স্থানে মিত্রপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত একটি আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে এবং তাহাদের কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। অনুরূপভাবে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্যও টোকিওতে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সৃষ্টি করা হয়, এবং এই বিচারালয়ও কিছু সংখ্যক জাপানী নেতা ও সেনাপতিকে মৃত্যুদণ্ড বা অন্যপ্রকারের শাস্তি দিয়াছিল। যুগোশ্লভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে; চেকোশ্লভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানীয়া ও আল্‌বেনীয়া স্বাধীন হয়; তবে ঐ সকল দেশে রাশিয়ার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। ইটালী একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে পুনর্গঠিত হয়। ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স তাহাদের স্বাধীনতা ইতিপূর্বেই ফিরিয়া পাইয়াছিল। 'সার' অঞ্চলে রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসনের সৃষ্টি করা হয়, তবে অর্থনৈতিক ব্যাপারে এখানে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইটালী ও যুগোশ্লভিয়ার মধ্যে কলহের ফলে ত্রিয়েস্তেকে আন্তর্জাতিক

শাসনাধীনে রাখা হইল। গ্রীস ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ ও রোড্স, রুমানীয়া ট্রান্সিল্ভানিয়া অঞ্চল; এবং রাশিয়া বেসারাবিয়া ও বুকোভিনা লাভ করে। ইহা ছাড়া, ইটালী, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, ফিন্ল্যাণ্ড, ও রুমানীয়া মিত্রপক্ষকে মোট ১৬৩০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। চীন জাপানের কবল মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইল বটে, কিন্তু সেখানে জাতীয়তাবাদী সরকার ও কম্যুনিষ্ট দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। লিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৫ সন পর্যন্ত অষ্ট্রিয়া মিত্রশক্তিদের অধিকারে ছিল। ঐ বৎসর ১৫ই মে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিগণ ভিয়েনায় মিলিত হইয়া অষ্ট্রিয়াকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করেন, এবং অষ্ট্রিয়া কোন শক্তিগোষ্ঠীতে যোগদান করিতে পারিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। অষ্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কেও গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সনে ত্রিয়েস্তেকে উত্তর ত্রিয়েস্তে (ত্রিয়েস্তে নগরী সমেত) ও দক্ষিণ ত্রিয়েস্তে নামক দুইটি অংশে ভাগ করা হয়, এবং এই অংশ দুইটি যথাক্রমে ইটালী ও যুগোশ্লভিয়ার শাসনাধীন রাখা হয়।

মার্শাল পরিকল্পনা:

ইয়োরোপকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল ইয়োরোপের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্গঠনের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। ১৯৪৭ সালের ১২ই জুলাই প্যারিসের সম্মেলনে স্থির হয় যে, মার্শাল পরিকল্পনাধীন পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে বিরাট আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়া ১৯৫০ সনের মধ্যে তাহাদের পণ্যোৎপাদন-শক্তি যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি করিবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী "ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা" সৃষ্ট হইয়া "ইয়োরোপীয় পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা"-কে সফল করে। ২২,৪৪০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সাহায্য যুক্তরাষ্ট্র 'মার্শাল সাহায্য' অনুযায়ী প্রদান করে।

কলম্বো পরিকল্পনা:

মার্শাল পরিকল্পনার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ কলম্বো পরিকল্পনা। ১৯৫০ সনের জানুয়ারী মাসে কলম্বো শহরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য এই পরিকল্পনাটি গৃহীত হয় এবং ১৯৫১ সনের ১লা

জুলাই ৬ বৎসরের জন্য এই পরিকল্পনাটি চালু করা হয়; ইহার মোট ব্যয় ১৮৬৪ মিলিয়ন পাউণ্ডে নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু পরে ১৯৫৭ সনের জুন মাসে পরিকল্পনাটির মেয়াদ ১৯৬১ সনের জুন পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ইহার ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

শান্তি-প্রচেষ্টা :

আট্‌লাণ্টিক্ চার্টার : ১৯৪১ সনের আগষ্ট মাসে আমেরিকার সভাপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলাণ্টিকের বক্ষে একটি রণতরীতে মিলিত হইয়া আটলাণ্টিক চার্টার নামে একটি সনদ প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যতে শান্তিস্থাপন সংক্রান্ত কতকগুলি নীতি ঘোষণা করেন। এই সনদে বলা হয় যে, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের নিজেদের জন্য কোন নূতন অঞ্চল দাবী করিবে না এবং সমস্ত জাতির স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তাহারা সমর্থন করিবে। পর বৎসর যোশেফ ষ্ট্যালিন ও মিত্রপক্ষীয় সকল দেশের সরকার এই সনদ মানিয়া লন।

ইয়াল্টা চুক্তি : ১৯৪৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে যুদ্ধ শেষ হইবার প্রাক্কালে ষ্ট্যালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিল ক্রিমিয়া উপদ্বীপের ইয়াল্টা নামক স্থানে মিলিত হইয়া জার্মান-কবলমুক্ত সকল দেশে স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে ও বিনা-হস্তক্ষেপে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইলেন। (আট্‌লাণ্টিক চার্টার অমান্য করিয়া) স্থির করা হইল যে, রাশিয়া বাল্টিকদেশগুলি, পূর্ব পোল্যাণ্ড, কুরাইলদ্বীপপুঞ্জ ও শাখালিনের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিবে এবং মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবে; পোল্যাণ্ডকে পূর্ব-জার্মানীর অধিকার দেওয়া হইবে এবং চীনের জাতীয়তাবাদী সরকার রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থন লাভ করিবে।

পোট্‌স্‌ডাম চুক্তি: সভাপতি রুজভেল্টের মৃত্যু ও জার্মানীর আত্ম-সমর্পণের পর ১৯৪৫ সনের জুলাই মাসে পোট্‌স্‌ডাম নামক স্থানে ষ্ট্যালিন, আমেরিকার নূতন সভাপতি ট্রুম্যান ও চার্চিল মিলিত হইয়া এই মর্মে চুক্তি করিলেন যে, যুদ্ধ-পূর্ব অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লভাকিয়াকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং জার্মানীর কিছু অঞ্চল পোল্যাণ্ড ও রাশিয়াকে দেওয়া হইবে। জার্মানীর বাকী অঞ্চলগুলি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে। আরও স্থির হয় যে, শত্রু-

শক্তিগুলির সহিত শান্তিচুক্তি স্থাপন করিতে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে।

শান্তিচুক্তি: সাম্যবাদী রাশিয়া ও গণতন্ত্রী শক্তিগুলির মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বিরোধের ফলে পোট্স্‌ডাম চুক্তি আংশিকভাবে কার্যকরী হইয়াছিল মাত্র। অনেক দর কষাকষির পর ১৯৪৭ সনে প্যারিসে ইটালী, ফিন্‌ল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার সহিত সন্ধি সাক্ষরিত হয়। কিন্তু, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও জাপানের সহিত প্রস্তাবিত চুক্তিতে রাশিয়া রাজী হইল না।

রাষ্ট্রসংঘের জন্ম (The birth of the United Nations Organisation):

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের পররাষ্ট্রসচিবগণ ১৯৪৩ সনের নভেম্বর মাসে মস্কোতে মিলিত হইয়া যুদ্ধোত্তর জগতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার সপক্ষে মতপ্রকাশ করেন। ডিসেম্বর মাসে তেহরাণ বৈঠকে রুজভেল্ট, চার্চিল ও ষ্ট্যালিন গণতান্ত্রিক জাতিগুলিকে লইয়া একটি বিশ্ব-পরিবার গঠন করিবার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করেন।

১৯৪৪ সনের অক্টোবর মাসে ডাম্বারটন ওক্‌স্ সম্মেলনে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও চীনের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া জাতিসংঘের একটি খসড়া প্রস্তুত করে। ১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে যুদ্ধ শেষ হইবার কিছুদিন পূর্বে, সানফ্রান্সিস্কো নামক স্থানে ৫০টি জাতির প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া একটি শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা রাষ্ট্রসংঘের (বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের) সনদ নামে গৃহীত হয়। রাষ্ট্রসংঘ এইরূপে ১৯৪৫ সনের ২৪শে অক্টোবর সরকারীভাবে ইহার কার্য আরম্ভ করে।

রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ চারিটি :—(১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, (২) জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করা, (৩) বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাসমূহের সমাধানে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাগুলির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা করা, এবং (৪) এই সকল সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন জাতির কার্যাবলীর সামঞ্জস্য বিধানের কেন্দ্ররূপে রাষ্ট্রসংঘকে পরিণত করা।

রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী ইহার ৬টি প্রধান অঙ্গ আছে: (১) সাধারণ

পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, (৪) অছি পরিষদ, (৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং (৬) দপ্তরখানা। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের কতকগুলি বিশেষজ্ঞ সভা আছে, যথা: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা; খাদ্য ও কৃষিসংস্থা; শিক্ষানৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা; আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান সংস্থা; পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক; আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডার; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন; আন্তর্জাতিক তার ইউনিয়ন; বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা; আন্তর্সরকার সামুদ্রিক পরামর্শ সভা; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা এবং শুল্ক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রভৃতি।

সাধারণ পরিষদ (The General Assembly): প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র হইতে পাঁচজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়। তবে কোন রাষ্ট্রের একটির অধিক ভোটদানের অধিকার নাই। প্রতিবৎসর সেপ্টেম্বর মাসে এই পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন বসে। রাষ্ট্রসংঘের সনদের অন্তর্ভুক্ত, তবে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অনুপস্থাপিত, যে কোন বিষয় লইয়া এই পরিষদ আলোচনা করিতে পারে এবং সদস্যদের নিকট বা নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অথবা উভয়ের নিকটই সুপারিশ করিতে পারে। বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের আলোচনায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যাপারে সরল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council): পাঁচজন স্থায়ী (ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদী চীন, ফ্রান্স ও রাশিয়া) ও ৬ জন অস্থায়ী (সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত) সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত। প্রত্যেক সদস্য একটি করিয়া ভোটের অধিকারী। নিরাপত্তা পরিষদ রাষ্ট্র-সংঘের সদর কার্য্যালয়ে (নিউইয়র্কে অবস্থিত) যাহাতে সর্বদাই আহুত হইতে পারে সেইরূপ ভাবেই ইহা সংগঠিত। এই পরিষদের কর্মপ্রণালীসংক্রান্ত ব্যাপারে যে কোন ৭ জন সদস্যের সম্মতিক্রমেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কিন্তু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঁচজন স্থায়ী সদস্য সমেত ৭ জন সদস্যের ভোটেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে স্থায়ী সভ্য-গুলিকে 'ভোটো' অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তবে কোন বিবাদে কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট থাকিলে সেই বিষয়ের আলোচনায় তাহার ভোটাধিকার থাকে না।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করাই এই পরিষদের প্রধান দায়িত্ব। প্রতি মাসে এই পরিষদের সভাপতি পরিবর্তিত হন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council): সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৮ জন সদস্য লইয়া ইহা গঠিত (ইহার মধ্যে ৬ জন সদস্য প্রতি বৎসর ৩ বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হন)। জীবনমানের উন্নতিবিধান ও সকলের জন্য কর্মসংস্থান; আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার সমাধান; আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা; এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ বজায় রাখা ও ইহাদের প্রতি সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ—এইগুলিই এই পরিষদের লক্ষ্য। কতগুলি কমিশনের সাহায্যে পরিষদ ইহার কার্য সম্পন্ন করে।

অছি পরিষদ (The Trusteeship Council): অছিশাসকরাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি, রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য স্থায়ী সদস্য এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিন বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত কয়েকজন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত। ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থাধীন অঞ্চল ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে শত্রুদের নিকট হইতে প্রাপ্ত স্থান এবং রাষ্ট্রসংঘের অধীনে স্বেচ্ছাগত দেশগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধানই অছিপরিষদের কর্তব্য। অছিব্যবস্থাধীন অঞ্চলগুলির মধ্যে নিউগিনি ও নৌরু অষ্ট্রেলিয়া কর্তৃক; বৃটিশ ক্যামেরুন, বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড, ও টাঙ্গানিকা বৃটেন কর্তৃক: রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি বেলজিয়াম কর্তৃক; ফরাসী ক্যামেরুন ও ফরাসী টোগোল্যাণ্ড ফ্রান্স কর্তৃক; পশ্চিম স্যামোয়া নিউজিল্যাণ্ড কর্তৃক; মারিয়ানা, মার্শাল ও কেরোলিন দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক; এবং সোমালিল্যাণ্ড ইটালী কর্তৃক শাসিত হয়।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (The International Court of Justice): সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৫ জন সদস্য লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করাই ইহার প্রধান কাজ। এই বিচারালয়ের Statute-এ স্বাক্ষরকারী যে কোন রাষ্ট্র যে কোন বিবাদ ইহার নিকট পেশ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, নিরাপত্তা পরিষদ আইনসংক্রান্ত যে কোন বিবাদ ইহার নিকট প্রেরণ করিতে পারে, এবং রাষ্ট্রসংঘের যে কোন সংস্থা আইনসংক্রান্ত উপদেশের জন্য ইহার নিকট আবেদন করিতে পারে। কোন একটি দেশ হইতে একাধিক বিচারপতি নির্বাচিত করা হয় না। এই বিচারালয় হেগে অবস্থিত।

দপ্তরখানা (The Secretariat) : ইহার কার্যালয় নিউইয়র্কে অবস্থিত। একজন প্রধান সচিব ও তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারীদের লইয়া দপ্তরখানা গঠিত। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও সংবাদ বিনিময়ের কেন্দ্র হিসাবে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। ট্রিগভ লাই ছিলেন ইহার প্রথম প্রধান সচিব (সেক্রেটারী-জেনারেল) বর্তমানে ; হ্যামার শোল্ড এই পদের অধিকারী।

যুদ্ধের গৌণ ফল :

এই যুদ্ধের ফলে একদিকে রাশিয়ার ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রভাব যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সেই অনুপাতে দুর্বল হইয়া পড়ে। পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। এই দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্র –রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র—, এবং তাহাদের গোষ্ঠী লইয়া বিশ্বরাজনীতিতে এক নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হইলে রাশিয়াও চীন, কোরিয়া, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদ প্রচারের জন্য তৎপর হইল। মধ্য-প্রাচ্যেও এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়।

যদিও রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বশান্তি স্থাপনে ঔৎসুক্য দেখাইল, প্রকৃতপক্ষে তাহারা তাহাদের সমরসজ্জা হ্রাস করিল না। উপরন্তু, আনবিক অস্ত্র ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদনের ফলে বিশ্বশান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইল। যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কিত গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হয়। আণবিক শক্তি শান্তিপূর্ণ কার্যে ব্যবহৃত হইতে থাকেএবং রাশিয়া ১৯৫৭ সনের ৪ঠা অক্টোবর স্পুটনিক আবিষ্কার করিয়া মহাশূন্য জয় করিবার পথ প্রশস্ত করে। অবশ্য, অল্পদিন পরে যুক্তরাষ্ট্রও মহাশূন্যে উপগ্রহ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়, এবং গ্রহ-উপগ্রহে গমন করিবার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। রকেট যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে পরিণত হইবার ফলে বর্তমান যুগে প্রধানশক্তিগুলির ধ্বংসকারী ক্ষমতা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাটি মানবজাতির সম্মুখে প্রধানরূপে দেখা দিয়াছে। বিশ্বের বৃহৎশক্তিগুলিকে নিরস্ত্রীকৃত করা না হইলে সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধে সমগ্র বিশ্ব নিঃসন্দেহে ধ্বংস পাইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগরণ, এবং কমনওয়েলথ

এশিয়া—

যুদ্ধকালীন জাপানী ধ্বনি—"এশিয়াবাসীর জন্যই এশিয়া"—এশিয়ার জনগণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ১৯৪৬ সনের ৪ঠা জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল, এবং এই দেশে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। বৃটিশ সরকারও ঘটনার চাপে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল। আয়ার্ল্যাণ্ড (উত্তরাংশ ব্যতিরেকে) বৃটেনের সহিত শেষ যোগসূত্র ছিন্ন করিল এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত সাম্রাজ্যকে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হইল। ১৯৪৮ সনে ব্রহ্মদেশ ও সিংহল বৃটিশ শক্তির কবল হইতে মুক্তি লাভ করে। ঐ বৎসর মালয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়, এবং ১৯৫৭ সনের ৩১শে আগষ্ট মালয়ও স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৯ সনের ৩রা জুন সিঙ্গাপুরেও একটি স্বায়ত্ত-শাসনশীল সরকার গঠন করা হয়। এইরূপে বিস্তৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যের আকার ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তবে আয়ার্ল্যাণ্ড ও ব্রহ্মদেশ ব্যতীত এই সকল রাষ্ট্র বৃটিশ কমনওয়েল্থের সভ্যরূপে বৃটেনের সহিত যোগসূত্র বজায় রাখে।

১৯৪৫ সনে জাপানীরা ইন্দোনেশিয়া হইতে বিতাড়িত হইলে ইন্দো-নেশিয়ানগণ ওলন্দাজদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া ১৯৪৯ সনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। যুদ্ধের শেষে ফরাসী ইন্দোচীন হইতে জাপানীরা বিতাড়িত হইবার পর ফরাসী আধিপত্যের বিরুদ্ধে এখানে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। ভয়ানক সংগ্রামের পর কম্যুনিষ্ট নেতা হো চি মিন্ ১৯৫৪ সনে ইন্দোচীনের উত্তরাংশ স্বাধীন করেন; এবং নবগঠিত রাষ্ট্রের নাম হয় ভিয়েৎমিন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে (দক্ষিণ) ভিয়েৎনাম, ক্যাম্বোডিয়া ও লাওশকে ফরাসীরা অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। থাইল্যাণ্ড ১৯৪৫ সনে জাপানের অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া যুক্তরাজ্যের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চীনে

যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৪৯ সনে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী মাসে পিকিং কমিউনিষ্ট বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে, এবং ১৯৪৯ সনের ১লা অক্টোবর মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনে জনগণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। চিয়াং কাইশেক ও তাঁহার জাতীয়তাবাদী সরকার চীন হইতে পলায়ন করিয়া ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেইস্থানে একটি চীনা সরকার গঠন গঠন করেন।

পশ্চিম এশিয়ায়ও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৯৪৮ সনের ১৪ই মে প্যালেষ্টাইনে ইস্রাইল নামে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অবশেষে ১৯৪৯ সনে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় এই অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি হয়; ইহার ফলে জর্ডন জেরুজালেম সহ পূর্ব-প্যালেষ্টাইনের কিয়দংশ, ও মিশর দক্ষিণ পূর্বদিকে কিছু স্থান লাভ করে এবং প্যালেষ্টাইনের বাকী অঞ্চলগুলি তৈল আভিভের ইস্রাইল সরকার অধিকার করে। কিন্তু আরব-ইহুদি দ্বন্দ্ব শেষ হইল না। ১৯৪৫ সনের ২২শে মার্চ মিশর, ইরাক, জর্ডান, সৌদী আরাবিয়া, সিরিয়া, লেবানন, ও ইয়েমেন লইয়া আরব লীগ গঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল আরবদের রাজনৈতিক শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধি করা। কালক্রমে মিশর ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ১৯৪৬ সন হইতে মিশরে বৃটিশ-বিরোধী কাযকলাপ আরম্ভ হয়। ১৯৫১ সনের অক্টোবর মাসে মিশর ১৯৩৬ সনে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিশরীয় মৈত্রীচুক্তি বাতিল করে। ১৯৫২ সনের ২৩শে জুলাই সেনাপতি নাগিব মিশরের ক্ষমতা অধিকার করেন এবং রাজা ফারুক সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৯৫৩ সনের ১৮ই জুলাই নাগিবের নেতৃত্বে মিশরকে একটি প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫৪ সনের এপ্রিল মাসে নাসের নাগিবের স্থলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, এবং সুয়েজখাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণের জন্য বৃটেনের সহিত ২৭শে জুলাই একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সুদানে শাসনভার লইয়া ইঙ্গ-মিশরীয় বিরোধের পুনরায় সৃষ্টি হয়। অবশেষে ১৯৫৫ সনে গণভোটের ফলে সুদান স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৯৫৬ সনে নাসের যখন সুয়েজের উপর জাতীয় কর্তৃত্ব স্থাপনে ব্যস্ত তখন ফ্রান্স ও বৃটেন ইস্রাইলের সহায়তায় একযোগে মিশর আক্রমণ করে। কিন্তু মিশরবাসীরা সাহসের সহিত বাধা দেয়। রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের ফলে

আক্রমণকারীরা মিশর ত্যাগ করে, এবং মিশরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। মিশর ক্ষতিপূরণ লাভ করে।

১৯৫১ সনে মোসাদেকের নেতৃত্বে ইরাণের তৈল শিল্পের জাতীয়করণ হয়, এবং বিপ্লবীদের ভয়ে ইরাণের শাহ্ একসময়ে কিছুদিনের জন্য দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু শাহ্ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোসাদেককে কারারুদ্ধ করিয়া রাজতন্ত্র শক্তিশালী করেন, এবং ১৯৫৫ সনে ইংরেজরা আবার এই দেশের তৈল উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।

যুদ্ধোত্তর যুগে—১৯৪৫-১৯৫০ সনে—তুরস্ক যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় শক্তিশালী হইয়া এই অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে বাধা দিতে সক্ষম হয়।

আফ্রিকাঃ

পূর্ব আফ্রিকার বৃটিশ অধিকারভুক্ত স্থানগুলিতে এই সময়ে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। বিশেষতঃ কেনিয়ায় মৌ মৌ নামক বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিলে বহুকষ্টে ইংরেজরা ইহা দমন করে।

১৯৫১ সনের ২৪শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের চেষ্টায় লিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলি সংগ্রাম করিয়া একটির পর একটি স্বাধীনতা লাভ করিতে থাকে। এইরূপে ১৯৫৫ সনের ৬ই নভেম্বর মরোক্কো, ও ১৯৫৫ সনের ২৯শে মে টিউনিশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু, আলজেরিয়ায় ফরাসীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম এখনও চলিতেছে।

পশ্চিম আফ্রিকায় ইংরেজ-শাসিত গোল্ডকোষ্ট ১৯৫৭ সনের ৬ই মার্চ স্বাধীনতা লাভ করিয়া ঘনা নামে পরিচিত হয়; ১৯৫৮ সনের অক্টোবরে ফরাসী গিণী স্বাধীন হয়; ১৯৫৯ সনে সেনেগল, দাহেমী, উত্তর ভোল্টা ও ফরাসী সুদান লইয়া মালী নামে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়; এবং ১৯৬০ সনের ১২ই জুলাই ফরাসী সরকার আইভরী কোষ্ট, দাহেমী উত্তর ভোল্টা ও নাইজারের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মধ্য আফ্রিকায়, কঙ্গো (বেলজীয়ান) ১৯৬০ সনের ৩০শে জুন স্বাধীনতা লাভ করে; ইহাছাড়া চা, গাবন, ক্যামেরুন্স্, টোগোল্যাণ্ড, সোমালিল্যাণ্ড ও এই বৎসর স্বাধীন হয়। নাইজেরিয়া ও সাইপ্রাস ২৯শে জুলাই, এবং মাদাগাস্কার ৩১শে জুলাই যথাক্রমে বৃটিশ ও ফরাসী শাসন হ[illegible]তে মুক্ত হয়।

সম্প্রতি [illegible] একনায়কতন্ত্র ও সামরিক শাসনের প্রাদুর্ভাব দেখা

দিয়াছে। ভিয়েৎনাম, ভিয়েৎমিন, লাওস, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, তুরস্ক, সিরিয়া, পাকিস্থান প্রভৃতি রাষ্ট্রে সামরিক কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। মিশরেও সামরিক কর্তৃপক্ষ বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে স্থানচ্যুত করিয়াছে, এবং ব্রহ্মদেশেও কিছুদিনের জন্য একজন সেনাপতি কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সোয়াকর্ণ প্রকৃতপক্ষে একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। চীন ও কোরিয়ার সম্বন্ধে এই একই কথা প্রযোজ্য। ফলে, এশিয়ায় পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। পাকিস্তানে আয়ুবখানের "মূলগত গণতন্ত্র" (Basic democracy) ও ইন্দোনেশিয়ায় সোয়াকর্ণের "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র" (Guided democracy) প্রকৃতপক্ষে এইসব দেশে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। রাশিয়া ও আমেরিকা পরিচালিত বিরোধী শক্তিগোষ্ঠীর চাপে পড়িয়া এশিয়ার গণতান্ত্রিক দেশগুলি তাহাদের পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রে কতদিন আস্থা রাখিতে পারিবে তাহা বলা কঠিন। এশিয়ার দেশগুলিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সততার অভাব ও স্বজন-পোষণ প্রভৃতি দোষ বিশেষ ভাবে দেখা দিলে, এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি না ঘটিলে সাধারণ লোক সামরিক শাসনকে স্বাগত জানাইবে। ভারত সম্বন্ধেও ইহা সত্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কমনওয়েলথ:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে বিশ্বের শক্তিদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। বর্তমান জগতের প্রধান শক্তিগুলি বৃটেনের ন্যায় নৌশক্তি, বাণিজ্য ও অর্থবল দ্বারা বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে নাই; ইহারা প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশাল কৃষি ও শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা, বিরাট জনবল ও ভৌগলিক আয়তনের অধিকারী। এত অতুলনীয় শিল্পবৈভব, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিভব (potential) তাহাদিগকে আণবিক অস্ত্র, মিসিল, রকেট প্রভৃতি আধুনিকতম অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে। বর্তমানে একমাত্র রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের আর্থিক ও সামরিক বিভবের প্রয়োজনীয় সমবায় আছে বলিয়া ইহারাই এখন বিশ্বের প্রধান শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। বৃটেনের এই জাতীয় আর্থিক ও সামরিক বিভব বা প্রয়োজনীয় জনবল নাই বলিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বৃটেনের শক্তি-প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে।

পূর্বে বৃটেন তাহার নৌবলের সাহায্যে বিশ্বব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত; এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে আমদানি করিয়া নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদের বা খাদ্য-দ্রব্যের ঘাটতি পূরণ করিত। ইহা ছাড়া বৃটেনের ভৌগোলিক অবস্থান বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ইহার নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সাহায্য করিত। কিন্তু বর্তমানে বৃটেনের বিশ্বব্যাপী নৌপ্রাধান্য নাই; বিমান যুদ্ধের কলা-কৌশলের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বৃটেনের ভৌগলিক অবস্থান-প্রসূত নিরাপত্তা আজকাল নিরর্থক হইয়া উঠিয়াছে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ফলে বৃটেনের আর্থিক বলও যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩০ সনের সাম্রাজ্যিক সম্মেলন (Imperial Conference)-এর পরে বৃটিশ কমনওয়েল্থ-এর বিভিন্ন অংশগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। বৃটেন এই বহির্মুখী গতিকে সমর্থন করিয়াছে। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকারী সকল বৃটিশ ডমিনিয়ন ইংরেজ-প্রধান ছিল বলিয়া এই সকল অঞ্চলের সহিত বৃটেনের জাতিতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। অবশ্য, দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ড, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নহে। আয়ার্ল্যাণ্ড ১৯৩৭ সনে বৃটিশ কমনওয়েল্থ ত্যাগ করে; ক্যানাডায় একটি শক্তিশালী ফরাসী ক্যাথলিক ও বৃটিশ বিরোধী সংখ্যালঘুদল ছিল ও আছে; এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু বৃটিশ শাসক-সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বৃটিশ-বিরোধী বুয়োরদিগের উপর শাসন করিতেছিল।

ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, মালয়, ঘনা, দঃ রোডেসিয়া, প্রভৃতি দেশ ডমিনিয়ন মর্যাদা লাভ করিবার ফলে কমন্‌ওয়েল্থ দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের জাতিতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিক একতার ভিত্তি পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৯৪৯ সনের কমন্‌ওয়েল্থ সম্মেলনে প্রজাতান্ত্রিক ভারতকে কমনওয়েলথের সভ্যপদ বজায় রাখিবার অধিকার দেওয়া হইলে বৃটিশ সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করিয়াও কমনওয়েল্থের সভ্যপদ লাভ করার নীতি মানিয়া লওয়া হয়, এবং পরবর্তী কালে পাকিস্তান ও ঘনা প্রজাতন্ত্ররূপে পরিগণিত হয়। বর্তমানকালে কোন ডমিনিয়নেরই বৃটেনের প্রতি কোন সামরিক দায়িত্ব নাই। ক্যানাডা সামরিক, আর্থিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে আমেরিকান মহাদেশেরই একটি অংশে পরিণত হইয়াছে; ১৯৫১

সনের ১লা সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে সাম্যবাদের অগ্রগতিতে বাধা দিবার জন্য "উত্তর আটলাণ্টিক সন্ধিসংস্থা"-র আদর্শে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়া 'Anzus' নামে একটি নিরাপত্তা সন্ধি সংস্থা সৃষ্টি করে, এবং ফিলিপাইনদ্বীপপুঞ্জের সহিতও অনুরূপ একটি সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। ইন্দো-চীনের যুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির পরাজয়ের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে SEATO নামক যে সন্ধিসংস্থার সৃষ্টি হয় অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ইহার সক্রিয় সমর্থক হয়। ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, বৃটেন এবং পাকিস্থানও ইহার সদস্য হয়, এবং যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এইরূপে কমনওয়েল্থ দেশগুলির মধ্যে সামরিক দায়িত্বের একতা না থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্ট সামরিক জোটগুলির মাধ্যমে কয়েকটি ডোমিনিয়নের সামরিক নীতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে।

অবশ্য বৃটিশ কমনওয়েল্থের মধ্যে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক একতা বর্তমানে না থাকিলেও আদর্শবাদের একটি দৃঢ়ভিত্তিতে ইহার সভ্য রাষ্ট্রগুলি একত্রিতভাবে স্থিত রহিয়াছে। সহনশীলতা, স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, ও উন্নতিশীল গণতন্ত্র এই ভিত্তির মূলস্বরূপ। বিশ্ববিস্তৃত কমনওয়েল্থ পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্মের লোক লইয়া গঠিত। ইহাদের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানও বিভিন্ন। বৃটিশ সরকার বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সাম্রাজ্যাংশগুলির উপর শারীরিক শক্তির সাহায্যে কর্তৃত্ব বজায় রাখা অসম্ভব; সুতরাং স্বাধীন ও বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্কের সাহায্যে এই দেশগুলির উপর প্রভাব বজায় রাখাই সমীচীন। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ সমস্যা লইয়া বৃটিশ সরকার, ভারত, পাকিস্থান, ঘনা, মালয়, ও সিংহল দক্ষিণ আফ্রিকার শাসক সম্প্রদায়ের সহিত মতৈক্য স্থাপন করিতে পারে নাই এবং কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়, তথাপি প্রতিবৎসর কমন্‌ওয়েলথ সম্মেলনে মিলিত হইয়া বিভিন্ন ডোমিনিয়নের মন্ত্রিগণ পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা তাহাদের সমস্যাগুলি আয়ত্তাধীন রাখে এবং উত্তেজনা প্রশমিত করে।

সাইপ্রাস, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভের পরে বারবাদোস্, বৃটিশ গায়েনা, বৃটিশ হণ্ডুরাস, জ্যামেইকা, ত্রিনিদাদ ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ লইয়া কমনওয়েল্থের

মধ্যে একটি 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন'-এর সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় ; ইহা ছাড়া, পূর্ব আফ্রিকা-স্থিত বৃটিশ উপনিবেশগুলিও অদূর ভবিষ্যতে ডমিনিয়ন মর্য্যাদা লাভ করিয়া কমনওয়েল্‌থের সভ্য পদ পাইতে পারে। উপরন্তু, মালয়, উত্তর বোর্ণিও ও সারওয়াক লইয়া কমনওয়েল্‌থের মধ্যে আর একটি যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টির পরিকল্পনাও রহিয়াছে। মধ্য আফ্রিকায় দক্ষিণ রোডিসিয়ার সহিত উত্তর রোডেসিয়া ও ন্যাসাল্যাণ্ডের গঠিত যুক্তরাষ্ট্র কল্যাণ কর হয় নাই। নিগ্রো ও শ্বেতকায়দের মধ্যে দায়িত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক সহ-যোগিতার এই পরিকল্পনা নিগ্রোদের ক্রমবর্দ্ধমান সমতা ও স্বাধীনতার দাবীর ফলে এবং শ্বেতকায় শাসকদের রক্ষণশীল মনোবৃত্তির ফলে ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

শেষতঃ, বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ উন্নতিশীল গণতন্ত্রের একটি শেষ ঘাঁটিরূপে বর্তমান জগতে দাঁড়াইয়া আছে। ক্রিকেট খেলার ন্যায় পার্লামেণ্টিয় গণতন্ত্রও ইংরেজরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দৃঢ়ভাবে কায়েমী করিয়াছে ; এবং ইহার ফলে কমন্‌ওয়েলথের বিভিন্ন সভ্যরাষ্ট্র গণতন্ত্রের প্রধান সমর্থকরূপে এখনও কাজ করিয়া চলিয়াছে। কমনওয়েল্‌থের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বন্ধনের অভাব ইহার অর্থনৈতিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার দ্বারা পূরণ হইয়াছে। অর্থ নৈতিক দিক হইতে বৃটেনের সহিত ডোমিনিয়নগুলির সম্পর্ক উনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় আজও বহুলাংশে বিদ্যমান। যদিও সকল ডোমিনিয়ন শিল্প-নৈতিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ও উন্নতির দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তথাপি কমনওয়েল্‌থের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে অক্ষুন্ন রহিয়াছে। ডমিনিয়নগুলির পক্ষে বৃটেন এখনও সর্বাপেক্ষা বড় ক্রেতা। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫০ সনে বৃটেন ইহার আমদানী দ্রব্যের শতকরা ৪৩ ভাগ কমনওয়েল্‌থ দেশগুলির নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিল, এবং ইহার মোট রপ্তানীর শতকরা ৪৯ ভাগ এই দেশগুলির নিকট বিক্রয় করে। সমগ্র কমনওয়েল্‌থের মোট বাণিজ্যের একতৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেকাংশ পরিমাণ আমদানী-রপ্তানী ডোমিনিয়নগুলির ভাগে পড়ে।

কমনওয়েল্‌থভুক্ত ষ্টার্লিং অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া যাইবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ডোমিনিয়নগুলি ষ্টার্লিং অঞ্চল ত্যাগ করিলে ইহা-দের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিতে বাধ্য। ডলারের মূল্যের অনুপাতে ষ্টার্লিং-এর মূল্যহ্রাসের ফলে কমনওয়েল্‌থ রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক অর্থনৈতিক

নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানাবিধ আন্তঃডোমিনিয়ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে কমনওয়েল্‌থ দেশগুলির বিরাট অর্থনৈতিক উন্নতি দেখা দিতে পারে, এবং আরও কয়েক বৎসর যাবৎ পৃথিবীতে শান্তি বিরাজিত থাকিলেই ইহা সম্ভব হইবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ হইতে পারিলে কমনওয়েল্‌থ দুইটি বিরাট শক্তির দ্বন্দ্বে হয়ত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। যুদ্ধোত্তর বাস্তত্যাগের ক্ষেত্রে কমনওয়েল্‌থ দেশগুলি কর্তৃক ইয়োরোপের লক্ষ লক্ষ বাস্তত্যাগীকে বাসস্থান-দান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি বিরাট অবদান।

কমনওয়েল্‌থ সম্পর্কের নাবলীলতা ইহার সভ্যদিগের পক্ষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে, সামরিক বা অর্থনৈতিক জোটে যোগ দেওয়া সম্ভবপর করিয়াছে। তবে ইহাতে বিপদও আছে। কোন আঞ্চলিক যুদ্ধে কমন্‌ওয়েলথের বিভিন্ন রাষ্ট্র দুইটি বিরোধীপক্ষে যোগদান করিলে কমনওয়েল্‌থ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যনীতিও (Apartheid Policy) কমনওয়েল্‌থের মধ্যে অবিলম্বে ফাটলের সৃষ্টি করিতে পারে। এই বৎসর কমন্‌ওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে মালয় ও ঘনা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যেরূপভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে তাহার ফলে এই ভীতি বাস্তবে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

———

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঠাণ্ডা যুদ্ধ

(The Cold War)

ঠাণ্ডা যুদ্ধ(The Cold War) :

১৯৪৬ সন হইতে কমিউনিষ্ট রাশিয়া ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে ও প্রায় সমগ্র বিশ্ব দুইটি বিরোধী দলে বিভক্ত হয় ;—একদলের নেতা হইল রাশিয়া ও অন্য দলের নেতা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। পারস্পরিক সন্দিগ্ধতার ফলে কোন দেশই তাহাদের সৈন্যদল বা রণসম্ভার হ্রাস করিতে রাজী হইল না। ক্রমে এই দুই শক্তি-গোষ্ঠির মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সৃষ্টি হইল। উভয় দলই সমগ্র বিশ্বে স্ব স্ব রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রভাব বিস্তার করিতে ভয়ানকভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক গুলিতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় সংঘর্ষের মধ্যে এই ঠাণ্ডা যুদ্ধের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব ইয়োরোপে, বাল্টিক অঞ্চলে, চীন ও এশিয়ার অন্যান্য স্থানে রাশিয়ার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবার ফলে গণতান্ত্রিক পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি ভীত হইয়া কতকগুলি আঞ্চলিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। রাশিয়ার দলভুক্ত কয়েকটি রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে আমেরিকান দল ভোটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ইহাতে বাধা দেয়, আবার আমেরিকার দলভুক্ত কতকগুলি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশের পথে রাশিয়াও অনুরূপভাবে বাধা দেয়। ফলে জাপান, নেপাল, সিংহল, জর্ডান, অষ্ট্রিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, রুমানীয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, প্রভৃতি রাষ্ট্র বহুদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র-সংঘে প্রবেশাধিকার পায় নাই এবং কোরিয়া কমিউনিষ্ট চীন, বহির্মঙ্গোলিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি রাষ্ট্র আজ পর্যন্তও রাষ্ট্রসংঘের সভ্যপদ লাভ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের সকল প্রশ্নেই এই দুই বিরোধী দল তাহাদের স্বস্ব পক্ষ সমর্থন করিয়া সর্বদাই বিবাদগুলিতে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে।

বিভিন্ন দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য করিয়া সেই সকল দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের গতিরোধের জন্য এবং ঐ সকল দেশকে নিজেদের দলে আনিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র একটি নূতন প্রচেষ্টা আরম্ভ করিল। ১৯৪৭ সনের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ট্রুম্যান একটি ঘোষণা (Truman Doctrine) দ্বারা কমিউনিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশকে, বিশেষতঃ গ্রীস ও তুরস্ককে, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে, পূর্বকালীন একটি সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া রাশিয়া বস্‌ফোরাস ও দার্দা-নালেসের উপর আধিপত্য বিস্তারের এবং গ্রীসে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদের জয়যুক্ত করিবার যে চেষ্টা করে তাহা ব্যর্থ হয়। মার্শাল পরিকল্পনার দ্বারা আমেরিকা পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির অর্থনৈতিক-উন্নতি সাধন করিয়া সাম্যবাদের অগ্রগতিতে বাধা দিল।

জার্মানী—ইতিমধ্যে জার্মানী লইয়া রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠির মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ভয়ানক আকার ধারণ করিল। জার্মানীকে একত্রিত করিবার জন্য উভয়পক্ষের গ্রহণীয় কোন একটি সাধারণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা গেল না। ১৯৪৮ সনের ৩১শে মে জার্মানীর পশ্চিমী অঞ্চল ৩টি লইয়া একটি সার্বভৌম জার্মান রাষ্ট্র গঠন করিতে আমেরিকান শক্তিগোষ্ঠি সিদ্ধান্ত করিল। ফলে ১৯৪৯ সনের ২১শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম জার্মানীতে "জার্মানীর যুক্তরাষ্ট্রিয় প্রজাতন্ত্র" নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। আবার রাশিয়া-অধিকৃত অঞ্চলে ১৯৪৯ সনের ৭ই অক্টোবর 'জার্মান গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র' নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বার্লিনের উপর হইতে ফরাসী, আমেরিকান ও ইংরেজদের কর্তৃত্ব নষ্ট করিবার জন্য ১৯৪৮-৪৯ সনে রাশিয়া প্রতিপক্ষের অধিকৃত বার্লিনের অংশগুলির সহিত পশ্চিম জার্মানীর স্থলপথের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেয়; কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি বিমানের সাহায্যে পশ্চিম বার্লিনে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও রসদ প্রেরণ করিয়া রাশিয়ার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে। ১৯৫০ সনের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সনে পশ্চিম জার্মানী ও পূর্ব জার্মানীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম বলিয়া ঘোষণা করা হয়। উপরন্তু, পশ্চিম জার্মানীকে উত্তর আটলান্টিক সন্ধি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং উভয় জার্মানীতেই শক্তি-শালী সামরিক বাহিনীর সৃষ্টি করা হয়। ইতিপূর্বে ১৯৫২ সনের ২৭শে

মে প্যারিসে স্বাক্ষরিত একটি সন্ধির বলে ইয়োরোপীয় প্রতিরক্ষা গোষ্ঠী (European Defence Community) নামে একটি সংস্থা সৃষ্টি করা হয় এবং ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্ ও লাক্সেমবার্গ ইহাতে যোগ দেয়। ইহ ছাড়া, ১৯৫০ সনের ৯ই মে তারিখে ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শুম্যান কর্তৃক প্রস্তাবিত পশ্চিম ইয়োরোপের কয়লা ও ইস্পাত একত্রীভূত করার পরিকল্পনা (ইংল্যাণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়) ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্ ও লাক্সেমবার্গ কর্তৃক ১৯৫২ সনের ১৬ই জুন গৃহীত হয়। ১৯৫৭ সনে সার অঞ্চল পশ্চিম জার্মানীর সহিত যুক্ত করা হয়।

অধিকতর নিরাপত্তা সৃষ্টির জন্য ১৯৪৯ সনের ৪ঠা এপ্রিল ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যাণ্ড, ইটালী, লাক্সেমবার্গ, নরওয়ে এবং পর্তুগাল লইয়া "উত্তর আটলান্টিক সন্ধি সংস্থা" গঠিত হয়। ১৯৫২ সনে গ্রীস ও তুরস্ক এবং ১৯৫৫ সনে পশ্চিম জার্মানী ইহাতে যোগদান করে। এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সামরিক বল বৃদ্ধি করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সকলরকমে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে ১৯৪৮ সনে সাম্যবাদী যুগোশ্লভিয়ার সভাপতি মার্শাল টিটো ষ্ট্যালিনের নির্দেশমত চলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রাশিয়ার দল ত্যাগ করেন। সুযোগ বুঝিয়া যুক্তরাষ্ট্র যুগোশ্লভিয়াকে দলে টানিবার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করে এবং গ্রীস ও তুরস্কের সহিত টিটো মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন। তবে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব ও পশ্চিমের ঠাণ্ডাযুদ্ধে যুগোশ্লভিয়া নিরপেক্ষ পথ অনুসরণ করিতেছে।

প্রধানতঃ, রাশিয়ার আপত্তির জন্য ফ্রাঙ্কো শাসিত স্পেনকে ১৯৪৫ সনে রাষ্ট্রসংঘে স্থান দেওয়া হয় নাই এবং পরে উত্তর আটলান্টীক সন্ধি সংস্থাতেও ইহাকে গ্রহণ করা হয় নাই। তবে ১৯৫৩ সনে সাম্যবাদের শত্রু ফ্রাঙ্কোকে দলে আনিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র স্পেনকে আর্থিক সাহায্য দিতে স্বীকৃত হয় এবং বিনিময়ে স্পেনের কতকগুলি নৌ ও বিমান ঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্র লাভ করে।

কোরিয়ার যুদ্ধ: যুদ্ধোত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা

আরম্ভ হইল। জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিয়া ১৯৪৫ সনে রাশিয়ান সৈন্য-গণ উত্তর কোরিয়া ও আমেরিকান সৈন্যগণ দক্ষিণ কোরিয়া অধিকার করে। ৩৮° অক্ষরেখার সাহায্যে এই দুই অংশ বিভক্ত করা হয়। এইরূপ মনে করা হইয়াছিল যে, পরবর্তীকালে গণভোটের সাহায্যে সমগ্র কোরিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত করা হইবে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্বাচনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হইলে রাশিয়া উত্তর কোরিয়ায় ভোটগ্রহণ করিতে রাজী হইল না। দক্ষিণ কোরিয়ার নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর সেখানে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হইল। উত্তর কোরিয়ায়ও একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৮-৪৯ সনে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়া হইতে তাহাদের সৈন্য সরাইয়া লইলে ১৯৫০ সনের ২৫ জুন উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী ৩৮° অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে। মাত্র ৩৪ দিনের মধ্যে আক্রমণ-কারীরা দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ট্রুম্যান দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যের জন্য জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমেরিকান সৈন্য, জাহাজ ও রসদ প্রেরণ করে। উপরন্তু রাশিয়া ও ইহার দলের প্রতিবাদ স্বত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘ দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। আমেরিকার সাহায্য পাইয়া দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণকারী-দিগকে ১৯৫০ সনের নভেম্বর মাসে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত হটাইয়া দেয়। এই সময়ে চীনা সৈন্যরা উত্তর কোরিয়ার সাহায্যার্থে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণ কোরিয়ার অধিকাংশ জয় করে। কিন্তু নবাগত আমেরিকান সৈন্য ও রাষ্ট্র-সংঘ বাহিনী আক্রমণকারীদিগকে ৩৮° অক্ষরেখা পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যায়। এই সময়ে রাশিয়ার সুপারিশক্রমে ১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধবিরতি করিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসংঘ কম্যুনিষ্ট চীন ও উত্তর কোরিয়ার সহিত সন্ধির আলোচনা আরম্ভ করে। কিন্তু সকল যুদ্ধবন্দীদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে ফিরাইয়া দিবার কম্যুনিষ্টদাবি অপর পক্ষ মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে ১৯৫২ সনের অক্টোবর মাসে এই আলোচনা ভাঙ্গিয়া যায় এবং দুইপক্ষের মধ্যে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অবশেষে উভয় পক্ষ ক্লান্ত হইয়া পানমুনজনে ১৯৫৩ সনের আগষ্টমাসে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে। ৩৮° অক্ষরেখাই পূর্বের মত উভয় রাষ্ট্রের সীমারেখারূপে স্বীকৃত হইল এবং যে সকল যুদ্ধবন্দী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে রাজী হইল না রাষ্ট্রসংঘ তাহাদের ভার গ্রহণ করিল। আরও স্থির হইল যে অদূর ভবিষ্যতে কোরিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। ১৯৫৪ সনের (এপ্রিল ২৬-জুন ১৯) জেনেভা সম্মেলন কোরিয়া সম্পর্কে মীমাংসা করিতে ব্যর্থ হয়।

এইরূপে কোরিয়ায় ঠাণ্ডা যুদ্ধ গুলিনিক্ষেপের যুদ্ধে (shooting war) পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে কোরিয়ার যুদ্ধ দুই বিরোধী শক্তিগোষ্ঠির মধ্যে শক্তি পরীক্ষার ও মতবাদ-সংঘর্ষের ক্ষেত্ররূপে দেখা দেয়।

১৯৫৪ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর ৪৮টি জাতির প্রতিনিধিগণ জাপানের সহিত একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং ঐদিন জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত আর একটি সন্ধির বলে যুক্তরাষ্ট্র জাপানে সামরিক বাহিনী মোতায়ন রাখিবার অধিকার লাভ করে। জাপান একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়।

জেনেভা সম্মেলন (১৯৫৪ সন): ১৯৫৪ সনের মে মাসের জেনেভা সম্মেলনে বৃটেন, ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, লালচীন, ভিয়েৎমিন ও ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া দূর প্রাচ্যের বিশেষতঃ কোরিয়া ও ভিয়েৎনামের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোরিয়ার সংযুক্তিকরণে আপত্তি করিলে ও ইন্দোচীনে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কোনরূপ সুবিধা দিতে অস্বীকার করিলে এই সম্মেলন ব্যর্থ হয়।

কোরিয়া ও ইন্দোচীনে যুদ্ধের উদাহরণ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরে স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য ১৯৫৫ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড, ও ফিলিপাইনকে লইয়া "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সন্ধিসংস্থা" নামে একটি মিত্রগোষ্ঠীর সৃষ্টি করে।

এদিকে ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে সেনাপতি আইসেনহাওয়ার যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ৫ই মার্চ ষ্ট্যালিনের মৃত্যু হইলে ম্যালেন্‌কভ্‌ রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত হন। এই দুই নবনির্বাচিত রাষ্ট্র-নায়কের শান্তিপূর্ণ ঘোষণার ফলে অনেকেরই মনে হইয়াছিল যে ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান ঘটিবে। কিন্তু এই আশা সফল হয় নাই। N. A. T. O. (North Atlantic Treaty Organisation) ও S. E. A. T. O. (South East Asiatic Treaty Organisation)-এর প্রত্যুত্তর স্বরূপ

১৯৫৫ সনের ১৪ই মে ৮টি পূর্ব ইয়োরোপীয় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে "পূর্ব ইউরোপীয় সন্ধি সংস্থা" নামে একটি মিত্র গোষ্ঠির সৃষ্টি হয়। আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লভাকিয়া, পূর্বজার্মানী, পোল্যাণ্ড, রুমানীয়া ও রাশিয়া পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশতে মিলিত হইয়া পারস্পরিক সহযোগিতা-মূলক একটি মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীকে কমিউনিষ্ট প্রভাব ও আরব জাতীয়তা-বাদের সম্মুখীন হইতে হয়। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণ দরিদ্রও অনুন্নত হইলেও তাহাদের চিরাচরিত ধর্মপরায়ণতার জন্য এই অঞ্চলে কমিউনিষ্ট প্রভাব বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। ১৯৫৫ সনের নভেম্বর মাসে ইরাক ও ইরাণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় বৃটেন, পাকিস্তান ও তুরস্কের সহিত মৈত্রী সম্পাদন করিয়া "মধ্যপ্রাচ্য সন্ধি সংস্থা" নামক একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। এই চুক্তি বাগদাদ চুক্তি নামেও পরিচিত। মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃত্বকামী মিশর বাগদাদ চুক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আরবলীগকে শক্তিশালী করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। কেবলমাত্র সৌদি আরাবিয়া ও ইয়েমেন মিশরকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতে থাকে। ১৯৫৮ সনের জুলাইমাসে একটি সামরিক বিদ্রোহের ফলে ইরাকে রাজতন্ত্র লোপ পায় এবং সেনাপতি কাসেম শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৯৫৯ সনের মার্চমাসে ইরাক বাগদাদ চুক্তি ত্যাগ করিলে ইহাকে কেন্দ্রপ্রাচ্য জাতি গুলির সন্ধি সংস্থা, (Cento) নামে অভিহিত করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার সরকার ডাচ্ নিউগিনি হইতে ওলন্দাজদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘে হল্যাণ্ডকে সমর্থন করিয়া আসিতেছে। এদিকে কমিউনিষ্টচীন ইহার ভূখণ্ডের নিকটবর্তী মাৎসু ও কুয়েময় দ্বীপগুলি চিয়াং কাইশেকের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ১৯৫৫ সন হইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে এই চেষ্টা সফল হয় নাই।

———

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিশ্বশান্তি ও রাষ্ট্রসংঘ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই, এমনকি প্রথম মহাযুদ্ধের শেষেও, বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলি স্থায়ী বিশ্বশান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে। জাতি-সংঘ ও রাষ্ট্রসংঘ এই চেষ্টার ফলস্বরূপ।

পঞ্চশীল ও বান্দুং (Bandung) সম্মেলন :

১৯৫৪ সনের ২৯শে এপ্রিল চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর মধ্যে যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার ভূমিকাস্বরূপ নেহেরুর পঞ্চশীল বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঁচটি নীতির উল্লেখ করা হয়। এই পাঁচটি নীতি যথাক্রমে: (১) পরস্পরের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, (২) পারস্পরিক অনাক্রমণ (৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সমতা ও পারস্পরিক সাহায্য, এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান। যুগোশ্লভিয়া, মিশর চীন, পোল্যাণ্ড, ও ব্রহ্মদেশ এই নীতি গ্রহণ করে। ১৯৫৫ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী ম্যালেন্‌কভ্ রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন, এবং বুলগানিন এই পদ লাভ করেন। ১৯৫৫ সনের জুন মাসে বুলগানিনও পঞ্চশীল গ্রহণ করেন।

১৯৫৫ সনের এপ্রিলমাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং নামক স্থানে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য, বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার জন্য, এবং পরাধীন জাতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য মিলিত হন। এই প্রতিনিধিগণ পঞ্চশীলের প্রতি সমর্থন জানান।

শীর্ষ সম্মেলন (The Summit Conference)—১৯৫৫ সনের ১৮-২৩ জুলাই জার্মানীর পুনর্মিলন, ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ, ও পূর্ব্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করিবার জন্য বৃহৎ চতুঃশক্তির প্রধানগণ জেনেভায় একটি সম্মেলনে মিলিত হন। 'যুক্তরাষ্ট্র হইতে সভাপতি

আইসেনহাওয়ার ও রাষ্ট্রীয় সচিব ডালেস্, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ইডেন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাকমিলান, রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বুলগেনিন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জুকভ ও কম্যুনিষ্ট দলের নেতা ক্রুশ্চেভ, এবং ফ্রান্সের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রপ্রধানগণ জার্মানীর একত্রীকরণ সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দিবার জন্য দাবী করিলে বুলগেনিন ইয়োরোপের সামগ্রিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাই সর্ব্বাগে করিবার জন্য জেদ করিলেন। ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, এবং অক্টোবর মাসে চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি সম্মেলনের সুপারিশ করিয়া রাষ্ট্রপ্রধানগণ জেনেভা ত্যাগ করেন। ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসে চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনও ব্যর্থতায় পর্য্যাবসিত হয়। কারণ, উভয় পক্ষে তাহাদের পরস্পরের নীতি গ্রহণ করিতে পারে নাই।

১৯৬০ সনের মে মাসের মধ্যভাগে যুক্তরাষ্ট্রের আইসেনহাওয়ার, ফ্রান্সের ডিগল্, বৃটেনের ম্যাকমিলান ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের মধ্যে প্যারিসে পুনরায় শীর্ষ সম্মেলন বসে। এদিকে ১লা মে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ফলে এই সম্মেলন কোন বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯৬০ সনের ১লা মে ইউ-২ (u-2) জাতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গুপ্তচর বিমান রাশিয়ার উরাল অঞ্চলে রাশিয়া রকেটের সাহায্যে ভূপাতিত করে, এবং যুক্তরাষ্ট্রসরকারের নিকট অভিযোগ করা হয়। প্রথমে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার গুপ্তচর কার্য্যের অভিযোগ অস্বীকার করে, কিন্তু পরে অভিযোগ স্বীকার করিয়া লয়। শীর্ষ সম্মেলনের প্রারম্ভে ক্রুশ্চেভ আমেরিকার এই গুপ্তচরবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেন, এবং আইসেনহাওয়ারকে এই অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রকাশ করিতে বলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় ক্রুশ্চেভ সম্মেলন ভাঙ্গিয়া দেন।

পুনরায় ১লা জুলাই বেরেণ্টসাগরের উপর আমেরিকার R. B.-47 নামক আর একটি গোয়েন্দা বিমান রাশিয়া কর্ত্তৃক ভূপাতিত করা হয়। রাশিয়া আমেরিকার নিকট পুনরায় অভিযোগ করে, এবং দুইটি অভিযোগই রাষ্ট্রসংঘের নিকট প্রেরণ করা হয়; কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ অভিযোগগুলি অগ্রাহ্য করে।

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সী : ১৯৫০ সনের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের দশম অধিবেশনে বিশ্বব্যাপী আণবিক শক্তি

নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং বিশ্বশান্তি বজায় রাখিবার জন্য এই এজেন্সী গঠন করা হয়। ১৬ই ডিসেম্বর পারস্পরিক বিমান পরিদর্শন ও সংবাদ-বিনিময় সংক্রান্ত আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা ও জেনাভায় নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র (Control posts) প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বুলগেনিন-পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ফলে সমগ্রবিশ্বে আশার সঞ্চার হয়। ইহা ছাড়া, সাধারণ পরিষদ আণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করে।

নিরস্ত্রীকরণ কমিশন : ১৯৫৫ সনে সাধারণ পরিষদ পাঁচটি আণবিক শক্তি (রাষ্ট্র)-র একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া নিরস্ত্রীকরণের আলোচনার পথ প্রশস্ত করে। ১৯৫৭ সনের ১৮ই মার্চ্চ লণ্ডনে এই কমিশনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈঠক বসে ; কিন্তু এই বৈঠকে কোন প্রস্তাব সম্পর্কেই ঐক্যমত দেখা যায় নাই। ফলে বৈঠক ব্যর্থ হয়।

১৯৫৮ সনের মার্চ্চমাসে ক্রুশ্চেভ রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীপদ লাভ করেন, এবং ঐ বৎসর আল্‌জেরিয়ার সমস্যা লইয়া ফ্রান্সে রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হইলে ডিগল ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সভাপতি-পদ লাভ করেন। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর হইতেই রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে শান্তিপ্রিয়তার ভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ক্রুশ্চেভ প্রধানমন্ত্রী হইলে অনেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া আশাপ্রকাশ করেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে ক্রুশ্চেভের আমেরিকা সফরের ফলে এই আশা আরও বৃদ্ধি পাইল, এবং আইসেনহাওয়ারকেও ১৯৬০ সনে রাশিয়া সফর করিতে আমন্ত্রণ জানান হয়। কিন্তু মে মাসের গোয়েন্দা-বিমান সম্পর্কিত দুর্ঘটনার ফলে ক্রুশ্চেভ এই আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন।

১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে একটি বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হেনরী ক্যাবট্ লজ্ সর্ব্বপ্রকার আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করিবার প্রস্তাব করেন, এবং রাশিয়ার প্রতিনিধি জোরিন ইহাতে সম্মত হন। কিন্তু জোরিন শর্তহীনভাবে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিলে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি তিনটি শর্ত ইহাতে আরোপ করিতে চাহিলেন ; ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইল।

১৯৬০ সনের ৬ই জুন জেনেভায় দশটি জাতির প্রতিনিধি জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের কাজ পুনরায় আরম্ভ করেন। এই সম্মেলনও সমস্যা সমাধানে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই।

১৯৬০ সনের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশন রাষ্ট্রসংঘের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই সম্মেলনে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নাসের. ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও অন্যান্য বহু রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ যোগদান করেন। আফ্রিকার নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ও সাইপ্রাস রাষ্ট্রসংঘের সভ্যপদ লাভ করিবার ফলে রাষ্ট্রসংঘের সভাসংখ্যা ৯৯ হইল। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি এই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। ক্রুশ্চেভ পরিষদের অধিবেশনে দাবী করেন যে, রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেলের পদ লোপ করিয়া ইহার স্থলে ৩ জন সমক্ষমতা-বিশিষ্ট সেক্রেটারী নিয়োগ করা হউক, রাষ্ট্রসংঘের সনদের পরিবর্তন করা হউক, পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হউক, সকল দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্রীকৃত করা হউক, এবং ইহার জন্য একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হউক। ক্রুশ্চেভ এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত রাশিয়ান প্রস্তাব গ্রহণে পশ্চিমী শক্তিগুলি অনাবশ্যক বিলম্ব করিলে রাশিয়া রাজনৈতিক কমিটি ও ১৫টি সভ্যবিশিষ্ট নিরস্ত্রীকরণ কমিটির কার্য্যে অংশগ্রহণ করিবে না।

এফ্রো-এশিয়ান নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি পুনরায় শিখর সম্মেলনে চতুঃশক্তির রাষ্ট্রপ্রধানগণকে সম্মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব পরিষদে উত্থাপন করিলে ইহা অগ্রাহ্য হয়। পরে ভারত ও অন্যান্য ১৮টি রাষ্ট্রকর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে সকল শক্তিকে রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাস করিতে বলা হইলে সর্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া দশটি জাতি লইয়া গঠিত নিরস্ত্রীকরণ কমিটিতে ভারত ও লালচীনকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই কমিটির সংখ্যা ১২তে বৃদ্ধি করিবার জন্য বৃটেন প্রস্তাব করিলে যুক্তরাষ্ট্র এই শর্তে ইহাতে সম্মতি দিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করে যে, ১২টি দেশ লইয়া গঠিত এই কমিটি রাষ্ট্রসংঘের বাহিরে থাকিয়া ইহার কার্য্য চালাইবে।

রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা: রাষ্ট্রসংঘ ইহার গত ১৫ বৎসরের ইতিহাসে অনেক সমস্যার সমাধান করিতে অক্ষমতা দেখাইয়াছে। ১৯৪৭ সনের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করিলে ভারত নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি

হয়, এবং কাশ্মীরের দুইটি অংশ দুই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন আসে। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যাটি ঠাণ্ডাযুদ্ধের কবলে পড়িবার ফলে পাকিস্তান আক্রমণকারী কিনা রাষ্ট্রসংঘ এ-বিষয়ে মৌন রহিয়াছে এবং বিবাদটিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। যেহেতু পাকিস্তান আমেরিকান দলে যোগ দিয়াছে সেইহেতু আমেরিকার সমর্থন লাভ করিয়া পাকিস্তান আক্রমণকারী হইয়াও রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক তিরস্কৃত হয় নাই।

আলজেরিয়ায় গত কয়েক বৎসর যাবৎ ফরাসীসৈন্য ও আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু, রাষ্ট্র-সংঘ এখনও এ-সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারে নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণসমস্যা সম্পর্কেও রাষ্ট্রসংঘ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় সরকার অশ্বেত-কায়দের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক বহু অমানুষিক আইন পাশ করায় ১৯৫৫ সনের ৯ই নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘ পরিষদ এই বর্ণসমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি বিশেষ রাজনৈতিক কমিটি নিযুক্ত করে। ইহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রতিনিধিদিগকে রাষ্ট্রসংঘ হইতে উঠাইয়া লয়। দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযোগ করে যে,রাষ্ট্রসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দাখিল করিলেও দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ মানিতে অস্বীকার করে, এবং রাষ্ট্রসংঘও কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। ফলে, দক্ষিণ-আফ্রিকার মূল অধিবাসীরা মুষ্টিমেয় শ্বেতকায় শাসকদের হস্তে অমানুষিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে।

বার্লিন সমস্যায় বা পূর্বজার্মানীর সহিত পশ্চিম জার্মানীর একত্রীকরণে রাষ্ট্রসংঘ সফল হয় নাই। ত্রিয়েস্তে সমস্যারও কোন সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই।

উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার একত্রীকরণ-সমস্যাও এখন কল্পনা বিলাস মাত্র। আবার ইন্দোচীনে অশান্তি লাগিয়াই রহিয়াছে। ১৯৫৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে লাওস-এ যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং এই যুদ্ধ কিছুদিন পরে বন্ধ হয়। ১৯৬০ সনের অক্টোবর মাসে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের সহিত লাওস সরকারের পুনরায় যুদ্ধ হয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও অশান্তি লাগিয়াই আছে।

১৯৫৬ সনের অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরীতে গণবিপ্লব হইলে রাশিয়া সৈন্য

পাঠাইয়া সেই বিপ্লব ধ্বংস করে। রাষ্ট্রসংঘ একটি "পঞ্চজাতি বিশিষ্ট বিশেষ কমিটি" অনুসন্ধানের জন্য নিয়োগ করিলে কমিটি হাঙ্গেরী সরকারকে নিন্দা করিয়া একটি বিবরণী পেশ করে ; তবে হাঙ্গেরী রাষ্ট্রসংঘকে ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে অস্বীকার করিয়া ব্যাপারটি ধামাচাপা দেয়। রাষ্ট্রসংঘ হাঙ্গেরী সরকার বা রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই।

পশ্চিম ইরিয়ান লইয়া ইন্দোনেশিয়া ও ওলন্দাজদিগের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছে রাষ্ট্রসংঘ তাহারও কোন মীমাংসা করিতে পারে নাই। তবে রাষ্ট্রসংঘের সর্বাপেক্ষা বড় ব্যর্থতা হইল লালচীনকে রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশাধিকার না দেওয়া ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান করিতে না পারা।

শান্তিকামী রাষ্ট্রসংঘ শক্তিপ্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারে নাই ; সনদের ৫১ ধারা অনুযায়ী শক্তিপ্রয়োগ বৈধ, এবং নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। আবার রাষ্ট্রসংঘের সনদে প্রতিষেধাত্মক যুদ্ধের (preventive war) কোন স্থান নাই ; অথবা কোন দেশ বেসামরিক ভাবে অন্যদেশ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে (যেমন মিশর কর্তৃক সুয়েজখাল কোম্পানীর জাতীয় করণের ফলে বৃটেনের ক্ষতি হইয়াছিল) ইহার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই। উপরন্তু, এই সনদে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের উপযুক্ত সুযোগ নাই ; ৫১ নং ধারার দ্বারা এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায় যে, স্থিতাবস্থা (Status quo) বজায় রাখাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কখনও কখনও কোন কোন দেশের এই স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের জন্য শক্তিপ্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রসংঘের কৃতকার্য্যতা: রাষ্ট্রসংঘ অনেক বিষয়েই ব্যর্থ হইয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু এই ব্যর্থতা ঠাণ্ডাযুদ্ধেরই ফল। যে সকল বিবাদে কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত ভেটো প্রয়োগের দ্বারা বৃহৎরাষ্ট্রগুলি সেই সকল ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রসংঘকে ব্যর্থতার পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। তথাপি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক ক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রসংঘ বিরাট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, এবং এই ক্ষেত্রগুলি ঠাণ্ডাযুদ্ধ ও শক্তি-রাজনীতির আক্রমণ হইতে এখনও দূরে রহিয়াছে।

আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি লইয়া আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে রাষ্ট্রসংঘ

কাজ করিতেছে, এবং ইহার মাধ্যমে প্রচারকার্য্য চালাইয়া বিশ্বের জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ রহিয়াছে। জাতিসংঘে আলাপ-আলোচনা, প্রচারকার্য্য ও চাপের ফলে অনেক সময়ে অন্যায়কারী রাষ্ট্র নরম সুর গাহিতে বাধ্য হয় এবং বিশ্বজনমতের নিকট নতি স্বীকার করে।

রাষ্ট্রসংঘ কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও মীমাংসার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহা উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণার মারাত্মক প্রকাশে বাধাপ্রদান করে। যথা, আরব-ইস্রাইলী বিবাদ তীব্র হইয়া দেখা দিলে জাতিসংঘ এই সম্বন্ধে বিতর্কের অবতারণা করিয়া, বা "মিশ্র যুদ্ধবিরতি কমিশন" গঠন করিয়া উত্তেজনা প্রশমিত করে; ক্ষুব্ধদলের মনে কিয়ৎ-পরিমাণ সান্ত্বনা সৃষ্টি করে, এবং বড়রকমের যুদ্ধ বন্ধ রাখে। উপরন্তু, আফ্রিকা ও এশিয়ার নবজাগ্রত দেশগুলির সহিত অপেক্ষাকৃত পুরাতন রাষ্ট্রগুলির ভাববিনিময়ে ও সামঞ্জস্য বিধানে রাষ্ট্রসংঘ মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্রসংঘ ক্রমশঃ আকারে বৃদ্ধি পাইতেছে। একটি রাষ্ট্রসংঘ-বাহিনীর কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতেছে; এবং শান্তিস্থাপন, যুদ্ধ বন্ধ করা, ও শান্তির বাধা দূর করা প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। সর্বশেষে রাষ্ট্রসংঘের সনদ পরিবর্তিত অবস্থার সহিত তাল রাখিবার জন্য নিজেকে নানাভাবে খাপ-খাওয়াইয়া লইতেছে। সনদের নূতন ব্যাখ্যা, নূতন নূতন অঙ্গের সৃষ্টি, বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কর্ত্তব্যের পুনর্বণ্টন, সভ্যরাষ্ট্রগুলি কর্তৃক স্থাপিত বিভিন্ন সন্ধি, প্রভৃতির সাহায্যে ইহা সম্ভব হইতেছে। পূর্ব- পশ্চিমের দ্বন্দ্ব সত্বেও রাষ্ট্রসংঘ অনেকগুলি সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধ, ইন্দোচীনের যুদ্ধ, কাশ্মীরের যুদ্ধ, মিশরের উপর এ্যাংলো-ফরাসী আক্রমণ, প্রভৃতি বন্ধ করিতে রাষ্ট্রসংঘ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে।

১৯৫৮ সনের মে মাসে লেবাননে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হইল এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র কর্তৃক লেবাননের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠিলে যুক্তরাষ্ট্র লেবাননে একদল নৌসৈন্য প্রেরণ করে। রাষ্ট্রসংঘ তৎপরতার সহিত একটি পর্যবেক্ষক দল সেখানে প্রেরণ করিলে অবস্থা ধীরে ধীরে শান্ত হয়।

ইহাছাড়া, রাষ্ট্রসংঘের চেষ্টায় আবিসিনিয়া ও লিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, 'সা-র' পশ্চিম জার্মানীর সহিত যুক্ত করা হয়, ইস্রায়েল

ও মিশরের কলহ নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং কঙ্গো বেলজিয়ামের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

রাষ্ট্রসংঘের সর্বাপেক্ষা বড় সাফল্য এই যে, ইহার কার্যকলাপের ফলে আমেরিকা ও রাশিয়ার শক্তিগোষ্ঠী দুইটির মধ্যে খোলাখুলিভাবে আজ পর্যন্ত কোন মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয় নাই। রাষ্ট্রসংঘের অস্তিত্বের ফলে বিভিন্ন জাতি ইহার সাধারণ পরিষদে ও নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন বিবাদের আলোচনার সুযোগ পাইয়া তাহাদের বিদ্বেষ ও তিক্ততা কিছুপরিমাণে হজম করিয়া লইতে পারে।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রসংঘ সকল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে না পারিলেও পৃথিবীকে একটি সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক মিসিল, ও রকেটের কল্পনাতীত ধ্বংসলীলার হাত হইতে রক্ষা করিয়া বিশ্ব-শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এইরূপ আশা পোষণ করাই সমীচীন হইবে যে যে, ভবিষ্যতেও রাষ্ট্রসংঘ সমস্ত শক্তিগুলির নিরস্ত্রীকরণ দ্বারা বিশ্বশান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া মানবজাতির ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করিবে।

জাতিসংঘ (The League of Nations) ও রাষ্ট্রসংঘের (U. N. O.) তুলনা :

জাতিসংঘ ও রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে যেমন অনেক বিষয়ে মিল আছে, তেমন অনেক পার্থক্যও আছে। কোন কোন বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘ জাতিসংঘ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার কোন কোন বিষয়ে ইহার বিপরীতটি সত্য। জাতিসংঘের ন্যায় রাষ্ট্রসংঘ যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া বিশ্বশান্তি বজায় রাখিতে আগ্রহশীল। উভয় সংস্থাই সভ্যরাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম সমতায় বিশ্বাসী, উভয়ে কূটনৈতিক পন্থা বা আলাপ আলোচনার সাহায্যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে ইচ্ছুক, এবং ইহাদের বিভিন্ন কর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি সমজাতীয়। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারের আদালত, অছি ব্যবস্থা আমাদিগকে জাতিসংঘের পরিষদ, কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী আদালত ও ম্যাণ্ডেট্‌ ব্যবস্থার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া, জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি (technical organisations) রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কমিশন ও বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলির (specialised agencies) সহিত তুল্য।

অনেক বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘ জাতিসংঘ অপেক্ষা দুর্বল। জাতিসংঘের নিয়ম পত্রে (covenant) সভ্য রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের সনদে ইহার সবিশেষ উল্লেখ নাই। সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন আক্রমণ, সন্ধি-লঙ্ঘন বা শান্তির বিরুদ্ধে আক্রমণের ব্যাপারে সভ্য রাষ্ট্রগুলির কোন কর্তব্য নাই। অপরপক্ষে, নিয়মপত্রের ১৬ নং ধারানুযায়ী নিয়মপত্র লঙ্ঘন করিয়া কোন রাষ্ট্র যুদ্ধ আরম্ভ করিলে সকল সভ্য রাষ্ট্রকে ইহার বিরুদ্ধে আবশ্যিকভাবে অবিলম্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আবার সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অধিকারের গণ্ডী জাতিসংঘের ঐ গণ্ডী অপেক্ষা বড়। সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না; এবং কোন্‌টি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার তাহা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রই ঠিক করিবে। কিন্তু, নিয়মপত্রানুযায়ী জাতিসংঘের কাউন্সিলই বিচার করিবে কোন্ বিষয়টি কোন্ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে, রাষ্ট্রসংঘ অবিরত প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিয়াছে।

অন্যান্য কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রসংঘ জাতিসংঘের একটি উন্নত সংস্করণ। পৃথিবীর প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রই—বিশেষতঃ রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র—রাষ্ট্রসংঘের সভ্য। তত্ত্বের দৃষ্টিতে, রাষ্ট্রসংঘ কেবলমাত্র বিভিন্ন "সরকার" নহে, বিভিন্ন "জাতিগুলির" সেবায় নিয়োজিত। যদিও বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলির রাষ্ট্রসংঘের সহিত কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই (বিভিন্ন সরকারই রাষ্ট্রসংঘের সহিত যোগাযোগ বজায় রাখে), তথাপি সনদের প্রস্তাবনায় উল্লেখ আছে যে, রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বের জাতিপুঞ্জের হস্তেই রাষ্ট্রসংঘের দায়িত্ব অর্পণ করিতেছে। জাতিসংঘ কেবলমাত্র বিভিন্ন সরকারের উপর এই দায়িত্ব স্থাপন করিয়াছিল। আবার, যদিও রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সুপারিশ করিতে পারে, কিন্তু কয়েকটিক্ষেত্রে ইহারা সিদ্ধান্তেও (Decision) উপনীত হইতে পারে, যাহার তুলনা জাতিসংঘে দেখিতে পাওয়া যায় না। জাতিসংঘ অপেক্ষা রাষ্ট্রসংঘেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সাহায্যে অধিকসংখ্যক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে। জাতিসংঘের সর্বসম্মতি গ্রহণের নীতি রাষ্ট্রসংঘে কেবল নিরাপত্তার ক্ষেত্রেই গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে, কেবলমাত্র নিরাপত্তা পরিষদে 'ভেটো'-

প্রয়োগ ব্যতীত রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সর্বসম্মতি-গ্রহণ নীতি প্রযোজ্য হয় না; ফলে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কার্য্যে অচলাবস্থা সৃষ্টির ভয় কম।

ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রসংঘে শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা (sanction) অধিকতর ব্যাপক। নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশে প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রেরই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে বা শান্তি অক্ষুন্ন রাখিতে সামরিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব লইতে হইতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের একটি সামরিক কমিটি (Military Staff Committee) রহিয়াছে। ১৯৫০ সনে স্থির হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে 'Veto' বাধা সৃষ্টি করিলে সাধারণ পরিষদ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। উপরন্তু, কেবলমাত্র আক্রমণকারীর বিরুদ্ধেই নহে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষেধাত্মক ব্যবস্থা (preventive action)ও অবলম্বন করিতে পারে। এই সকল ব্যাপারে জাতিসংঘ রাষ্ট্রসংঘ অপেক্ষা দুর্বল ছিল। নিয়মপত্রানুযায়ী মাত্র জাতিসংঘের নির্দেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইত। উপরন্তু, জাতিসংঘের কাউন্সিল ও পরিষদের পারস্পরিক কর্তব্য পরিষ্কাররূপে নির্ধারিত ছিল না; কিন্তু, নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের কর্তব্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং নিরাপত্তা শান্তিরক্ষা, আক্রমণ প্রভৃতি ব্যাপারে সধারন পরিষদ অপেক্ষা নিরাপত্তা পরিষদকেই অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

নিয়মপত্রে সমষ্টিগত আত্মরক্ষার অধিকার স্বীকার করা হয় নাই, কিন্তু সনদের ৫-নং ধারানুযায়ী আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ও ব্যবস্থা নির্দিষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা অপেক্ষা উপনিবেশগুলির পক্ষে অছি ব্যবস্থাই শ্রেয়ঃ ও উন্নত। সর্বশেষে, রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের ন্যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য জাতিসংঘের কোন স্থায়ী ও প্রতিনিধিমূলক সংস্থা ছিল না। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির তুলনা জাতিসংঘের মধ্যে পাওয়া যায় না, এবং এই সকল সংস্থার সাহায্যে রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বের অগণিত জনসাধারণের উত্তরোত্তর কল্যাণ সাধন করিতেছে।

বিংশ অধ্যায়

সাম্প্রতিক সমস্যা

ঔপনিবেশিকতা:

যদিও পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয় নাই তথাপি বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এইরূপ যুদ্ধের সম্ভাবনা বিদ্যমান। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে—যথা ভারতে অবস্থিত গোয়ায়—যে সকল উপনিবেশ রহিয়াছে সেই সকল উপনিবেশের অধিবাসীদের স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় বাধা দান করা হইলে ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। পর্ত্তুগীজ-শাসিত গোয়াকে ভারত সরকার ভারতের অচ্ছেদ্য অংশরূপে ঘোষণা করিয়া ইহাকে ভারতের প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী করিয়াছে। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলেও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল উপনিবেশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি শীঘ্র ত্যাগ না করিলে যে 'কোন সময়ে বিশ্বশান্তি নষ্ট হইতে পারে।

তিব্বত: ১৯৫৯ সনের মার্চমাসে তিব্বতে চীনা শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব আরম্ভ হইলে তিব্বতের শাসনকর্ত্তা দালাইলামা কয়েক শত অনুচর লইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে চীন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, এবং চীনারা ভারতের সুদীর্ঘ সীমান্তব্যাপী সৈন্য মোতায়েন করে ও ভারতের উত্তর সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। অক্টোবর মাসে লাডাকের কোংকা গিরিবর্ত্মের নিকট চীনা সৈন্যরা ১৭জন টহলদারী ভারতীয় সৈন্যকে নিহত করিলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠে। তবে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত-নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, এবং সীমান্তরক্ষী দুই রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীই সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিতেছে। ১৯৬০ সনে নেপাল ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে চীন সীমান্ত-চুক্তি সম্পন্ন করিয়া ঐ দুইটি রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের উন্নতি ঘটাইয়াছে। চীন ও ভারতের মধ্য যুদ্ধ দেখা দিলে ইহা যে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তুরস্ক: ১৯৬০ সনের প্রথম দিকে একটি সামরিক বিপ্লবের ফলে তুরস্কের শাসকমণ্ডলীর পতন ঘটিয়াছে। তবে নবগঠিত সামরিক সরকার আমেরিকান

শক্তিগোষ্ঠীর প্রতি অনুগত রহিয়াছে। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার গণবিপ্লবের ফলে আমেরিকার প্রিয় পাত্র সিংম্যান রী গদিচ্যুত হইয়া দেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জাপানে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিরাপত্তা-চুক্তির বিরুদ্ধে ১৫ই জুন বিরাট গণমিছিল বাহির হয় এবং কর্তৃপক্ষের সহিত সংঘর্ষ হয়। অক্টোবর মাসে জাপানের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করিয়া জাপানী-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী নির্বাচনে আমেরিকার সহিত নিরাপত্তা-চুক্তিই হইবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রধান বাজী।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে খালের জল সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে। কিন্তু, অক্টোবরে সম্পাদিত রুশ-পাক তৈল অনুসন্ধান চুক্তিটি পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠিকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছে।

কিউবা: কিউবা সরকার যুক্তরাষ্ট্রের হুমকী, ষড়যন্ত্র, হস্তক্ষেপ ও আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে ১৯৬০ সনের ১১ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। কিন্তু, যেহেতু বিবাদটি লইয়া বর্তমানে "আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা" অনুসন্ধান করিতেছে সেইহেতু রাষ্ট্রসংঘ বিষয়টির আলোচনা ঐ সংস্থার বিবরণী না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছে। রাশিয়া আবার কিউবাকে সকল প্রকারে সাহায্য করিতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যে মিশর ও ইরাকের মধ্যে কলহ চলিতেছে। জর্ডনের সহিত মিশরের সদ্ভাব নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত-চীন সীমান্ত, কাশ্মীর, কোরিয়া, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপে জার্মানী, আফ্রিকায় আলজেরিয়া ও কঙ্গো এবং আমেরিকা মহাদেশের কিউবা কতগুলি আগ্নেয়গিরির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। যে কোন সময়ে এই সব অঞ্চলে বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হইতে পারে।

কঙ্গো: এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কঙ্গোর অশান্তি। ১৩ই জুলাই কঙ্গোর প্রধান মন্ত্রী লুমুম্বা বেলজিয়ামের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অভিযোগ করে এবং রাষ্ট্রসংঘের সামরিক সাহায্য ভিক্ষা করে। রাষ্ট্রসংঘ একটি রাষ্ট্রসংঘবাহিনী কঙ্গোতে প্রেরণ করে এবং ১৪ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ কঙ্গো হইতে সকল বেলজিয়ান সৈন্যের অপসারণ দাবী করে। ইতিমধ্যে কঙ্গোর কাটাঙ্গা ও কাসাই প্রদেশ কঙ্গো

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। উপরন্তু, কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের সভাপতি কাসাবুভু ও প্রধান মন্ত্রী লুমুম্বার বিরোধের ফলে কঙ্গো-শাসন-ব্যবস্থায় এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কঙ্গে-সমস্যার সমাধান ভবিষ্যতের অন্ধকারেই লুকায়িত।

একদিকে, পৃথিবী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠীতে বিভক্ত। সুখের বিষয়, এই বিবদমান বিশ্বে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে। আফ্রো-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির অনেকেই এই দলে রহিয়াছে। যুগোশ্লভিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ভারত এই দলের নেতৃত্ব করিতেছে। ১৯৫৫ সনের প্রথম হইতে এই দলের নৈতিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা লাভ করিয়া রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশাধিকার পাইলে রাশিয়ার দলবৃদ্ধি হওয়ারও যেমন সম্ভবনা আছে, এই তৃতীয় দলের শক্তিবৃদ্ধিরও সেইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির সমর্থনের জোরে যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বদাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু ভবিষ্যতে, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিপদের সম্মুখীন হইবে।

সমাধান: বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ভেটো ক্ষমতা নষ্ট করিয়া এফ্রো-এশিয়ান রাষ্ট্রগুলিকে—অর্থাৎ পৃথিবীর ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে—রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যে সমানাধিকার দিতে হইবে এবং সরল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে।

সকল রাষ্ট্র সম্মিলিত হইয়া নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা অবিলম্বে উদ্ভাবন করিতে হইবে, এবং আক্রমণকারীকে শাস্তি দিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের অধীনে একটি পুলিশ বাহিনীর সৃষ্টি করিতে হইবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি মানিয়া চলিতে হইবে,এবং এক রাষ্ট্র অন্যরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। পৃথিবী হইতে ঔপনিবেশিক শাসন ও বর্ণবৈষম্য উঠাইয়া দিতে হইবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শোষণহীন অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। সকল বিবাদে আন্তর্জাতিক আদালতের ও রাষ্ট্রসংঘের সমাধান বাধ্যতামূলকভাবে মানিয়া লইতে হইবে।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া—এই দুইটি বৃহৎশক্তি যদি

স্থায়ী বিশ্বশান্তি স্থাপনে সত্যই আগ্রহশীল হয় তবে পৃথিবীতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ কল্পনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইবে।

এই বৎসর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনে রিপাব্লিকান দলের প্রার্থী নিক্সনকে পরাজিত করিয়া ডেমোক্রেটিক দল আট বৎসর কাল পরে পুনরায় ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে। সমগ্র বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্ব্বাচিত গণতান্ত্রিকদলভুক্ত সভাপতি কেনেডির নূতন নেতৃত্বের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও আশা লইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে।

বিশ্বরাজনীতির মর্মকথা—ক্ষমতালিপ্সা ও আদর্শবাদ :

অনেকে মনে করেন যে, বিশ্বে ক্ষমতার প্রাধান্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও এই প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টাই বিশ্বরাজনীতির প্রধান বিষয়বস্তু। আবার অন্য একটি দলের মতে আদর্শবাদের সংঘাতই বিশ্বরাজনীতির প্রধান উপাদান। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায় ইতিহাসে ব্যষ্টির এক ভূমিকার উপরই জোর দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু, আদর্শবাদী ব্যাখ্যানুযায়ী ব্যক্তি বা ব্যষ্টি আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার যন্ত্র মাত্র। অবশ্য, প্রকৃত বিচারে দেখা যায় যে, বিশ্বরাজনীতিতে শক্তি বা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত। হিটলারের আক্রমণাত্মক অভিযানগুলির মূলে কেবলমাত্র তাঁহার বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাই ছিল না, নাজী আদর্শের প্রচার ও রূপায়ণের চেষ্টাও সেখানে স্পষ্ট। আবার ষ্ট্যালিনের কার্য্যাবলীর মধ্যে কেবলমাত্র সমাজবাদের প্রসারের চেষ্টাই দেখা যায় না, নিজেরও রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের অভিলাষও সেখানে বর্ত্তমান। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের চেষ্টাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংঘাতের সৃষ্টি করে। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা-লালসা যদিও যুদ্ধ ও রক্তপাতের একটি প্রধান কারণরূপে দেখা যায়, তথাপি বর্তমান জগতে কেবলমাত্র একটি ব্যক্তির পরিবর্তে ক্ষমতালোভী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিই আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের জন্য দায়ী।

মার্কস্‌বাদের প্রচারের ফলে অনেকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভের চেষ্টাই আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের প্রধান কারণ। কিন্তু, এরূপও দেখা গিয়াছে যে, অর্থনৈতিক স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের অবহেলা করিয়া শত্রুর সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ১৯৩৯-১৯৪০ সনে বেলজিয়াম ও ল্যাক্সেমবার্গের মধ্য দিয়া ফরাসী লৌহব্যবসায়ীরা জার্মানীতে

প্রচুর আকরিক লৌহ রপ্তানী করিয়াছে, এবং ১৯৪২ সন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত শিল্পগুলি জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা ছাড়া, স্বদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বা দেশের কৃষি ও শিল্পের প্রধানদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বিদেশে রপ্তানী বাজার অধিকারের চেষ্টা আন্তর্জাতিক সংঘাতের একটি অনুল্লেখযোগ্য কারণ। মার্শাল সাহায্য (Marshall Aid) পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে রচিত হয় নাই; ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক,—অর্থাৎ সাম্যবাদ ও রাশিয়ার বিস্তারের বিরুদ্ধে পশ্চিম ইয়োরোপকে শক্তিশালী করা। এই উদ্দেশ্যেই ইয়োরোপের অর্থনৈতিক সম্পদের একত্রীকরণের জন্য অনেক চেষ্টা (যথা, Schuman Plan) হইয়াছে। খনিজতৈলে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির উপর অধিকার বিস্তার করার চেষ্টার মূলেও রহিয়াছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য ব্যতীত বর্তমান জগতে রাজনৈতিক বা সামরিক প্রাধান্য লাভ করা বা ইহা বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আদর্শবাদের ক্ষেত্রে খৃষ্টধর্মীয় আদর্শ, মানবতাদর্শ ও মার্ক্সীয় আদর্শের কথা বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আজকাল অনেকে একটি বিশ্বরাষ্ট্রের আদর্শেও বিশ্বাসী। কিন্তু, আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সময় দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীর জাতীয়তাবাদী আচরণ ঐ সকল আন্তর্জাতিক আদর্শবাদকে ক্রুশবিদ্ধ করে। বিগত মহাযুদ্ধে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, বর্তমান জগতে সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও প্রাধান্যের দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে গণবিদ্রোহ, এবং যুগোশ্লভিয়ার সহিত রাশিয়ার বিরোধ আদর্শগত একতা সত্ত্বেও সৃষ্টি হইয়াছে। অল্প কিছুদিন যাবৎ কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, ক্ষমতা লইয়া রাশিয়া ও চীনের মধ্যেও অদূর ভবিষ্যতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইবে। সুতরাং, সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের বিরোধিতাই বিশ্বরাজনীতির সংঘাতের একমাত্র প্রধান উপাদান নহে; ক্ষমতার দ্বন্দ্বও ইহার একটি প্রধান বিষয়বস্তু।

ক্ষমতা ও আদর্শবাদের সংঘাত ক্রমাগত চলিতে থাকিলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ মনুষ্যজাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য এই সংঘাত সীমাবদ্ধ করিতে বা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিতে কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। নিছক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বৃহত্তর জনসমাজ বিভিন্ন দেশের ব্যষ্টির বা ক্ষুদ্রদলের ক্ষমতালিপ্সা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিবে। শারীরিক শক্তির সাহায্যে চিরদিনের জন্য মনুষ্যসমাজের উপর কোন আদর্শবাদই চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে; বিরোধী মতবাদগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মতবাদটি উত্তরোত্তর শিক্ষিত জনসাধারণ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিবে, এবং প্রয়োজন হইলে সময়ের ও মানুষের নূতন প্রয়োজনে মতবাদেরও পরিবর্তন ঘটিতে থাকিবে।

পরিশিষ্ট

ঘটনাপঞ্জী

১৯১৮ :

১৮ই জানুয়ারী	সভাপতি উইলসনের চতুর্দশ দফা।
১১ই নভেম্বর	জার্মানীর সহিত যুদ্ধ বিরতি।

১৯১৯ :

২৮শে জুন	জার্মানীর সহিত ভার্সাই সন্ধি।
১০ই সেপ্টেম্বর	অষ্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট্ জার্মেইন সন্ধি।

১৯২০ :

১০ই জানুয়ারী	জাতিসংঘের জন্ম।

১৯২১ :

১৩ই ডিসেম্বর	ওয়াশিংটনের চতুঃশক্তি চুক্তি।

১৯২২ :

৬ই ফেব্রুয়ারী	ওয়াশিংটনের নৌচুক্তি ও নবশক্তিচুক্তি।
১৬ই এপ্রিল	রাশিয়া ও জার্মানীর রাপালো সন্ধি।

১৯২৩ :

১১ই জানুয়ারী	ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্যদের রুঢ় অধিকার।
২৪শে জুলাই	তুরস্কের সহিত লুশান সন্ধি।

১৯২৪ :

১লা ফেব্রুয়ারী	বৃটেন কর্তৃক সোভিয়েট সরকারকে স্বীকৃতি দান
৩০শে আগষ্ট	ডস্ চুক্তি সম্পাদন।
২রা অক্টোবর	জাতিসংঘ কর্তৃক জেনেভা খসড়া গ্রহণ।

১৯২৫ :

১লা ডিসেম্বর	লণ্ডনে লোকার্ণো সন্ধির স্বাক্ষরকরণ।

১৯২৬ :

১০ই সেপ্টেম্বর	জাতিসংঘে জার্মানীর প্রবেশ।

১৯২৭ :

১লা জানুয়ারী	হ্যানকাও শহরে জাতীয়তাবাদী চীন সরকার গঠন

১৯২৮ :

২৭শে আগষ্ট — প্যারিসের চুক্তি (ব্রিয়াণ্ড্-কেলগ্ চুক্তি)।

১৯২৯ :

৩১শে আগষ্ট — হেগসম্মেলনে ইয়ং পরিকল্পনা অনুমোদন।

১৯৩০ :

২২শে এপ্রিল — লণ্ডনের নৌসন্ধি।

১৯৩১ :

১৯শে সেপ্টেম্বর — জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ।

১৯৩২ :

২রা ফেব্রুয়ারী — নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের উদ্বোধন।

১৯৩৩ :

৩০শে জানুয়ারী — জার্মান চ্যান্সেলররূপে হিটলারের কার্য্যভার গ্রহণ।

২৪শে ফেব্রুয়ারী — জাপান কর্তৃক জাতিসংঘ পরিত্যাগ।

১২ই জুন — বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধন।

১৪ই অক্টোবর — জার্মানী কর্তৃক জাতিসংঘ ত্যাগ।

১৯৩৪ :

১৮ই সেপ্টেম্বর — সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতিসংঘে প্রবেশ।

১৯৩৫ :

১৬ই মার্চ — জার্মানী কর্তৃক ভার্সাইসন্ধির সামরিক ধারাগুলি বর্জন।

২রা অক্টোবর — ইটালীর আবিসিনীয়া আক্রমণ।

১৯৩৬ :

৭ই মার্চ — জার্মানী কর্তৃক নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চল পুনরধিকার।

৯ইমে — ইটালীর আবিসিনিয়া বিজয়।

১৮ই জুলাই — স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের আরম্ভ।

১৯৩৭ :

৮ই জুলাই — চীনের সহিত জাপানের অ-ঘোষিত যুদ্ধের আরম্ভ।

১৯৩৮ :

১২ই মার্চ — জার্মানী কর্তৃক অষ্ট্রিয়া অধিকার।

২৯শে সেপ্টেম্বর — মিউনিক চুক্তি।

১৯৩৯ :

১৫ই মার্চ	জার্মানীকর্তৃক বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া অধিকার।
১লা এপ্রিল	স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি।
৭ই এপ্রিল	ইটালীকর্তৃক আলবেনিয়া অধিকার।
২৩শে আগষ্ট	সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি।
১লা সেপ্টেম্বর	জার্মানী কর্তৃক পোলাণ্ড আক্রমণ।
৩রা ,,	বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

১৯৪০ :

১০ই মে	চার্চিলের প্রধানমন্ত্রীপদ গ্রহণ।
১৪ই জুন	প্যারিসের পতন।

১৯৪১ :

৮ই ডিসেম্বর	যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান।

১৯৪৫ :

২২শে মার্চ	আরব লীগ গঠন।
৭ই মে	জার্মানীর আত্মসমর্পণ।
৬ই আগষ্ট	হিরোসিমার উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ।
২রা সেপ্টেম্বর	জাপানের আত্মসমর্পণ।
২৪শে অক্টোবর	রাষ্ট্রসংঘের জন্ম

১৯৪৭ :

১২ই জুলাই	মার্শাল পরিকল্পনার ঘোষণা।
১৫ই আগষ্ট	ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ।

১৯৪৮ :

৩১মে	পশ্চিম জার্মানী একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯৪৯ :

৪ঠা এপ্রিল	NATO গঠিত হয়।
১লা অক্টোবর	কম্যুনিষ্ট চীন প্রজাতন্ত্র গঠন।
৭ই ,,	পূর্ব জর্মানীর প্রজাতন্ত্র গঠন।

১৯৫০ :

২৫শে জুন	উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ।

১৯৫১ :

১লা জুলাই — কলম্বো পরিকল্পনা চালু হয়।
৮ই সেপ্টেম্বর — জাপানের সহিত সন্ধি।
২৪শে ডিসেম্বর — লিবিয়ার স্বাধীনতা লাভ।

১৯৫২ :

২৩শে জুলাই — মিশরে নাগিবের ক্ষমতালাভ।

১৯৫৩ :

৫ই মার্চ — স্ট্যালিনের মৃত্যু।
১৮ই জুলাই — মিশরে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৫ :

২৩শে ফেব্রুয়ারী SEATO গঠন করা হয়।
এপ্রিল — বান্দুং সম্মেলন।
১৪ই মে — Warshaw চুক্তি।
১৮—২৩ জুলাই — শিখর সম্মেলন।
নভেম্বর — বাগদাদ্ চুক্তি।
১৬ই ডিসেম্বর — আণবিকশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা।

১৯৫৭ :

৪ঠা অক্টোবর — রাশিয়া কর্তৃক স্পুটনিক উড্ডীয়ন।

১৯৫৮ :

মার্চ — ক্রুশ্চেভ রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৬০ :

১লা মে — ইউ-বিমান রাশিয়া কর্তৃক ভূপাতিত করা হয়।
১৭ই মে — শীর্ষ সম্মেলন।
৩০শে জুন — কঙ্গোর স্বাধীনতা লাভ।
জুলাই — কঙ্গোতে অশান্তি ও রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ।